অন্তর্ভারতীয় পুস্তকমালা

ওড়িয়া ছোটগল্প সংকলন

ওড়িয়া ছোটগল্প সংকলন

সম্পাদক
পঠাণি পট্টনায়ক

অনুবাদ
জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি

1980 (*Saka* 1902)
Reprinted 1986 (*Saka* 1907)

মূল্য : **Rs.10·00**

Original title : ORIYA GALPOMALA *(Oriya)*
Bengali translation : ORIYA CHHOTOGALPO SANKOLAN

This book has been printed on the paper made available by the Government of India at concessional rates.

PUBLISHED BY THE DIRECTOR, NATIONAL BOOK TRUST, INDIA, A-5 GREEN PARK, NEW DELHI-110 016 AND PRINTED AT KAY KAY PRINTERS, DELHI-110 007

ভূমিকা

কাহিনী থেকে ছোটগল্প

গল্প সাহিত্য আধুনিক সাহিত্যের এক বিশিষ্ট অঙ্গ ; কিন্তু কেবল আজ নয় আদিকাল থেকেই কাহিনী বা উপকথা সাহিত্যের এক প্রধান অংশ হিসাবে গণ্য। গল্প বলা ও গল্প শোনা মানুষের এক চিরন্তন প্রবৃত্তি। তাই সাহিত্যের রাজ্যে কাহিনীই সব চাইতে প্রাচীন। পূর্বতন উপকথা থেকে অধুনাতম গল্প অবধি কালের গতি ও মানুষের রুচিভেদে বহু পরিবর্তন হয়েছে ; প্রাচীন উপাখ্যান কৌতূহলোদ্দীপক এবং অধ্যাত্মভাববহুল ; কিন্তু আধুনিক গল্প সম্পূর্ণভাবে জীবনমর্মী। একদা কাহিনীতে নানারূপ বৈচিত্র্য, কৌতূহলভাব ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি প্রভৃতি স্থান পেত। কিন্তু আধুনিক ছোটগল্পে জীবনের সমস্যা, মনোজগতের রহস্য, বহুবিধ অভিজ্ঞতা প্রচুর পরিমাণে স্থান পাচ্ছে যার ফলে জীবন আমাদের কাছে এক গভীর সত্য ব'লে প্রতীত হচ্ছে। গল্পবর্ণিত চরিত্রগুলির সুখদুঃখে আমরা যত প্রভাবিত হই বাস্তব জীবনে তত হইনা যে পর্যন্ত না তা বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে এসে পৌঁছায়। অতি মর্মস্পর্শী ঘটনাতেও অশ্রুসংবরণ ক'রে থাকে এমন লোকও কিন্তু ছোটগল্পে বর্ণিত প্রসঙ্গে চোখের জল না ফেলে থাকতে পারেনা। এই ছোটগল্প কলার বিশিষ্ট দান। সাহিত্যে কাহিনী বহুকালাবধি রাজত্ব ক'রে থাকলেও ব্যক্তি-চেতনার অভ্যুদয় হয়নি বলে ছোটগল্পের জন্মগ্রহণের জন্য এতকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে।

ছোটগল্পের অভ্যুদয়-কাল

ওড়িয়া সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ছোটগল্পের সৃষ্টি হয়েছে মনে হয়। এই যুগে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং কতকগুলি সাময়িক পত্রিকার প্রকাশহেতু ছোট-গল্পের সৃষ্টির সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে স্থানীয় সমাজে এক নূতন ব্যক্তিত্ববোধের উন্মেষ হ'ল এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুশীলন ও আলোচনার ফলে এ দেশের সাহিত্যে এক নূতন রুচিবোধও জেগে উঠল। যাঁরা বলেন যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবের ফলেই এ দেশে ছোটগল্প জন্মগ্রহণ করেছে তাঁদের এ কথা পুরোপুরি মেনে নিতে ইচ্ছা হয় না। কারণ এ দেশের প্রাচীন সাহিত্যে কাহিনীর বিশাল ঐতিহ্য রয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ'-এর গল্প, গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা', ক্ষেমেন্দ্রের বিরাট 'কথামঞ্জরী', সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর', শিবদাসের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'বত্রিশ সিংহাসন', 'শুকসপ্ততি' প্রভৃতি প্রাদেশিক সাহিত্যে সুপরিচিত ছিল। তাই ইংরাজী সাহিত্যেও পাশ্চাত্ত্য সামাজিক আদর্শ প্রচারিত হওয়ার বহু পূর্বেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রজনাথ

বড়জেনা 'চতুর বিনোদ' রচনা করেছিলেন। এই কাহিনীধর্মী গদ্যরচনা ভারতীয় গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র আসনের অধিকারী হতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সাময়িক পত্রের অভ্যুদয়ের ফলে আধুনিক গদ্য সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সে কালের সাহিত্য মুখ্যতঃ কাব্যধর্মী হলেও তাই ছিল ওড়িয়া সাহিত্যে গল্প ও উপন্যাসের প্রথম অরুণোদয়।

ঔপন্যাসিক ফকীরমোহনের আত্মচরিত থেকে জানা যায় যে তিনি 1868 সালে 'বোধদায়িনী' পত্রিকায় 'লছমনিআ'-শীর্ষক একটি ছোটগল্প লিখেছিলেন। এই লেখাটি ফকীরমোহনের কোনও পুস্তকে সংকলিত হয়ে না থাকায় তার স্বরূপ সম্বন্ধে মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এই ঘটনার দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পরে 1898 খ্রীষ্টাব্দে ফকীরমোহনের প্রসিদ্ধ গল্প 'রেবতী' সাহিত্য-মাসিক 'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'রেবতী'ই ওড়িয়া সাহিত্যে প্রথম সার্থক মৌলিক ছোটগল্প বললে অত্যুক্তি হবে না। ফকীরমোহনের পূর্বে 1874 খ্রীষ্টাব্দে কবি রাধানাথ রায় 'উৎকল দর্পন' পত্রিকায় 'ইতালীয় যুবা' নামে এক গল্প প্রকাশ করেছিলেন। সেটি এক বিদেশী গল্প অবলম্বনে লিখিত ও সম্পূর্ণ কাহিনীধর্মী ছিল। সেই রকম, এই সময়ে প্রকাশিত মধুসূদন রাও-এর 'প্রণয়র অদ্ভুত পরিণাম'-ও এক বিদেশী কথাবস্তু অবলম্বনে লেখা। তবে 1897 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'হেমমালা' মধুসূদনের এক মৌলিক গল্প। ত্যাগদীপ্ত প্রেম এই গল্পের মুখ্য উপজীব্য হলেও বাস্তবিক এটিকে কাহিনীর মতই লাগে। কাজেই প্রকৃতপক্ষে ফকীরমোহনই ওড়িয়া গল্প সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা।

ফকীরমোহন এবং তাঁর সমসাময়িক চন্দ্রশেখর নন্দ ওড়িয়া সাহিত্যে অনেকগুলি ছোটগল্প দান ক'রে গেছেন। ওড়িয়া গল্পসাহিত্যের এই দুইজন আদি পুরুষের গল্পগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্য থেকেই প্রেরণা লাভ করেছেন। তাঁদের কাল প্রতিবেশী বঙ্গ সাহিত্যে এবং হিন্দী সাহিত্যেও গল্পের অভ্যুদয়ের কাল। কাজেই প্রতিবেশী সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ তাঁদের ছিলনা। ফকীরমোহন 1898 থেকে 1916 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর গল্পগুলি রচনা ক'রে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন এবং 1917 সালে তাঁর গল্পসংগ্রহ 'গল্পস্বল্প' মুদ্রিত হয়েছিল। অথচ চন্দ্রশেখর নন্দের গল্পগ্রন্থ 'চিত্র' 1906 খ্রীষ্টাব্দে কবি রাধানাথের মুখবন্ধ সহ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে আপন অভিমত প্রদান ক'রে রাধানাথ লিখেছিলেন যে ভারতীয় ভাষায় এ শ্রেণীর গ্রন্থের সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যায়, এমনকি উন্নততর বঙ্গ সাহিত্যেও এরূপ পুস্তক আছে কিনা সন্দেহ। ওড়িয়া গল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে এ কম গৌরবের কথা নয়। গল্পের প্রথম যুগের ওড়িয়া গাল্পিক ফকীরমোহন আপন প্রেরণা ক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে 6/9/1974 তারিখে উৎকল সাহিত্য সমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে লিখেছিলেন—

"কিছু লোকে মনে করেন, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে উপন্যাসের নাম জানিলাম; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে উপন্যাস, নাটক, দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষ। দর্শন

কিংবা নাটক সম্বন্ধে যদি বা কাহারও কিছু বক্তব্য থাকে, একথা দৃঢ়ভাবে বলা যাইতে পারে যে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত বেদের নচিকেতা উপাখ্যান কিংবা ইন্দ্র-বরুণ সংবাদ বৈদিক উপন্যাস। ইহাতেও যদি কাহারও কোনও আপত্তি থাকে তবে বলি সর্বসাধারণে ধর্মগ্রন্থের প্রচারের জন্য বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ বা উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। এই পৌরাণিক বাক্য অস্বীকার করা কাহারও সাধ্য নহে।''

('উৎকল সাহিত্য', ভাগ 18, সংখ্যা 6, পৃঃ 272—273)

ফকীরমোহনের 'মৌনা মৌনী', 'বগলা বগুলি' (বেঙ্গমা বেঙ্গমী), 'অজা-জাতি কথা' (দাদু-নাতির কথা), 'ধূলিআ বাবা' (ঐ নামে পরিচিত সন্ন্যাসী) প্রভৃতি সম্পূর্ণ কাহিনীধর্মী। এই গল্পগুলিতে কোনও বৈচিত্র্য নেই। তেমনি তাঁর জন্মস্থান বালেশ্বর সম্বন্ধীয় দুটি প্রবন্ধ 'বালেশ্বরী রাহাজানী' ও 'বালেশ্বরী পঙ্গালুণ'[১] এবং অন্য দুইটি প্রবন্ধ 'কমলাপ্রসাদ গোরাপ' ও 'কালিকাপ্রসাদ গোরাপ' এই চারটিকে প্রবন্ধধর্মী গল্প বলাই ঠিক। এগুলিতে ওড়িশার লুপ্তপ্রায় নৌবাণিজ্যের গৌরবের কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে 'রেবতী', 'পেটেন্ট মেডিসিন্', 'রাণ্ডিপুস অনন্তা' (বিধবার ছেলে অনন্তা), 'গারুড়িমন্ত্র' (বিষ ঝাড়ার মন্ত্র) প্রভৃতি ফকীরমোহনের কয়েকটি সার্থক ছোটগল্প। এই গল্পগুলির কলাকৃতি অতি উচ্চ কোটির এবং সমাজসচেতন সংস্কারপ্রাণ ফকীরমোহনের উন্নত ও রসোত্তীর্ণ অভিব্যক্তির পরিচয় এতে পাওয়া যায়। সমাজের নানা দুর্নীতি অন্যায় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ফকীরমোহন এই গল্পগুলির মধ্য দিয়ে প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন। এই গল্পগুলি তৎকালীন সমাজের এক বিচিত্র ইতিহাস বললে অত্যুক্তি হবে না।

তেমনই চন্দ্রশেখর নন্দের গল্পগুলিতে এ দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং তৎকালীন সমাজের সমাজসচেতনতা ও সংস্কারপ্রবণতার পরিচয় মেলে। তাঁর কয়েকটি গল্প স্থানীয় কিংবদন্তী আশ্রয় ক'রে লেখা। আবার, কয়েকটি গল্প তিনি লিখেছেন বৈদিক ও বৌদ্ধ গল্প অবলম্বন ক'রে আধুনিক গল্পের আকারে। তবে অধিকাংশ গল্পে পারিবারিক জীবনের চিত্র অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

এই যুগে 'উৎকল সাহিত্য' এবং 'মুকুর' মাসিক পত্রিকাদ্বয় কথাসাহিত্যের বিকাশে প্রচুর উৎসাহ যুগিয়েছিল। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুইটি দশকের মধ্যে যাঁরা গল্প রচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন তাঁরা হলেন বাঙ্কনিধি পট্টনায়ক, দিব্যসিংহ পাণিগ্রাহী, লক্ষ্মীকান্ত মহাপাত্র, চিন্তামণি মহান্তি, গোদাবরীশ মিশ্র, দয়ানিধি মিশ্র এবং গোপাল চন্দ্র প্রহরাজ। তবে এই সময়ে শ্রীমতী রেবা রায়ও কয়েকটি মৌলিক ছোটগল্প রচনা করেছিলেন। 1901 সালের 'উৎকল সাহিত্যে'র ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর 'শকুন্তলা' নামক ছোটগল্প উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া কুমারী নর্মদা কর ধারাবাহিক ভাবে টলস্টয়ের গল্পগুলি অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেছিলেন। এই অনুবাদগুলি আক্ষরিক ছিল না, অনুবাদিকা উৎকলীয় পরিবেশ ও স্থানীয় নামকরণ

---

১. পঙ্গালুণ-অ—ঝরঝরে ও পরিষ্কার সাদা নুন।

করে সেগুলি পরিবেষণ করেছিলেন। টলস্টয়ের এই নীতিধর্মী গল্পগুলি ওড়িয়া গল্প সাহিত্যের প্রথম যুগের গল্পলেখকদের অনেক প্রেরণা যুগিয়েছিল এমন অনুমান করা যায়। পরিমাণের দিক থেকে বেশী ছোটগল্প রচিত না হয়ে থাকলেও ছোটগল্পের টেকনীক বা কলাকৌশল, আভিমুখ্য, এবং শৈলী সম্বন্ধে লেখকগণ ক্রমশঃ বিশেষ সচেতন হয়ে উঠছিলেন। 'উৎকল সাহিত্য' মাসিক পত্রিকার 1903-4 অর্থাৎ ৮ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় গল্পলেখক চন্দ্রশেখর নন্দ 'সাহিত্যরে ক্ষুদ্রগল্প' (সাহিত্যে ছোটগল্প) শীর্ষক একটি আলোচনা প্রকাশ করেন এবং ছোটগল্পের রচনাশৈলী সম্পর্কে এক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেন। তেমনি এই সময়ে 'উৎকল সাহিত্য' ষষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যায় গাল্পিক ফকীরমোহন সেনাপতি 'ওড়িয়া কাহানীর ধর্ম ও ধারা' (ওড়িয়া কাহিনীর ধর্ম ও ধারা) সম্বন্ধে একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা প্রকাশ করেন। এই সময়ে মাসিক সাহিত্য পত্রিকায় গল্প অপেক্ষা কাহিনী অধিক প্রকাশিত হত। শ্রীতারিনী চরণ রথ, গোপালচন্দ্র প্রহরাজ, বাঞ্ছানিধি পণ্ডা, হরিকৃষ্ণ দাস, রামকৃষ্ণ মিশ্র, পীতাম্বরী দেবী প্রভৃতি বহু লেখক-লেখিকা ধারাবাহিকভাবে কাহিনীসকল প্রকাশ করতেন। পণ্ডিত গোপবন্ধু সম্পাদিত মাসিক সাহিত্য পত্রিকায় ছোটগল্প আদৌ স্থান পেত না, কেবল 'মুকুর' এবং 'উৎকল সাহিত্য' এ বিষয়ে অগ্রসর ছিল। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু 1920-21 সালে 'সহকার' মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ক'রে তার সম্পাদনা করতে আরম্ভ করেন। 1928-এর মধ্যে ক্রমান্বয়ে অলেখপ্রসাদ দাস, অন্নপূর্ণা দেবী, ভগবান পতি প্রভৃতি এই পত্রিকা সম্পাদনা করেন ব'লে জানা যায়। এই দীর্ঘকালের মধ্যে 'সহকার'-এর পৃষ্ঠায় ছোটগল্প প্রায় স্থান লাভ করত না। অথচ সেই সময়ে 'উৎকল সাহিত্যে' কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, সরলা দেবী, সুপ্রভা কর, প্রতিভা কর প্রভৃতি মৌলিক তথা অনুবাদ গল্প প্রকাশ করতেন।

সবুজ আন্দোলন ও ছোটগল্প

প্রকৃতপক্ষে সবুজ সাহিত্য সমিতির আন্দোলনই ওড়িয়া সাহিত্যে ছোটগল্প সৃষ্টির এক অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়। এই সমিতি থেকে 1933 খ্রীষ্টাব্দে 'যুগবীণা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সবুজ-সাধক হরিহর মহাপাত্র। এই পত্রিকায় হরিশ্চন্দ্র বড়াল, সচ্চিদানন্দ রাউতরায়, অনন্তপ্রসাদ পণ্ডা, ভগবতীচরণ পাণিগ্রাহী, সরলা দেবী, গোলোক চন্দ্র দাস, মধুসূদন মিশ্র, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, কমলাকান্ত দাস, রমেশ চন্দ্র নায়ক, গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অন্নদাশঙ্কর রায়, নীপেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, শ্রীমতী শান্তি মুখার্জি, রমারঞ্জন মহান্তি প্রভৃতি বহু তরুণ লেখক-লেখিকা ছোটগল্প লিখতে আরম্ভ করেন। মৌলিক গল্প ছাড়া 'যুগবাণী'তে কতকগুলি প্রসিদ্ধ বিদেশী গল্পও অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। সবুজ গোষ্ঠীর লেখক-লেখিকাগণ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য এবং প্রতিবেশী সমৃদ্ধ বঙ্গ সাহিত্য দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন।

নবযুগ সাহিত্য সংসদ ও 'আধুনিক'

1936 সালে কয়েকজন প্রগতিপন্থী তরুণ যুবক সাহিত্যে এক নূতন আভিমুখ্য সৃষ্টি করবার জন্য নবযুগ সাহিত্য সংসদ-এর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই গোষ্ঠীর মুখপত্র 'আধুনিক' ভগবতীচরণ পাণিগ্রাহীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সোভিয়েত রুশের মার্ক্সীয় আন্দোলন এই গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের প্রেরণা যুগিয়েছিল। সেই সময়ে সবুজ গোষ্ঠীর রোমাণ্টিক ভাবধারার আর সমাদর ছিল না। সবুজ কবি কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী ও বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক এই নবযুগ গোষ্ঠীতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সবুজ যুগের গল্পকার সচ্চিদানন্দ রাউতরায়ের বহু প্রগতিধর্মী বাস্তববাদী গল্প এইসময়ে রচিত হয়েছিল। 'আধুনিক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় গোপীনাথ মহান্তি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ড' লেখেন ব'লে জানা যায়। এই সময়ে যাঁরা গল্প রচনা ক'রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হ'ন তাঁরা হলেন রাজকিশোর রায়, রাজকিশোর পট্টনায়ক, নিত্যানন্দ মহাপাত্র, গোদাবরীশ মহাপাত্র, প্রাণবন্ধু কর, কাহ্নুচরণ মহান্তি। এঁদের গল্পে বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর প্রতি দরদ ও সহানুভূতি, ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা, মানব জীবনের নানা সমস্যা ও সংগ্রামধর্মী জীবনালেখ্য প্রভৃতি সার্থক ভাবে প্রতিফলিত হ'ল। বহু গল্পে রোমাণ্টিক ভাব পরিস্ফুট হলেও কলাকৌশল ও শৈলীর দিক থেকে এই যুগের গল্পগুলি রুচিকর ও বিশ্লেষণাত্মক। গল্প লেখকগণ গান্ধীযুগের সামাজিক আন্দোলন ও রুশ বিপ্লবের সাম্যবাদী আন্দোলনের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। দীন দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি, দলিত জীবনের সুষ্ঠু চিত্রণ এবং সামাজিক বৈষম্য ও আর্থিক শোষণের বিরুদ্ধে স্বরোত্তলন গল্প লেখকগণের লেখনী চালনার প্রেরণা হয়েছিল। বিশেষতঃ ইংরেজী শিল্পসভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উৎকলের গ্রামীণ সভ্যতা ও সমাজে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা কেবল রূপগত হয়ে থাকেনি, সমগ্র সমাজের চিন্তারাজ্যেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

স্বাধীনতা-পরবর্তী ওড়িয়া গল্প ও গল্পকার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বা তার অব্যবহিত পরে যে কয়জন তরুণ লেখক গল্পসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে রত হয়েছিলেন তাঁরা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁরা হলেন গোপীনাথ মহান্তি, সুরেন্দ্র মহান্তি, মহাপাত্র নীলমণি সাহু, বামাচরণ মিত্র, কিশোরীচরণ দাস, অচ্যুতানন্দ পতি, অখিলমোহন পট্টনায়ক, বিভূতিভূষণ ত্রিপাঠী, ব্রহ্মানন্দ পণ্ডা, দুর্গামাধব মিশ্র।

স্বাধীনতা লাভের পরে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রাচীন সামন্তবাদী সমাজ ধসে পড়েছে, এক সমাজবাদী রাষ্ট্র গঠনের জন্য যে সকল পরিকল্পনা ও প্রকল্প কার্যকরী করা হচ্ছে তার ফলে শিল্পযোজনের প্রসার দেশে দ্রুতগতিতে এক প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। সামাজিক ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাত আধুনিক গল্পলেখককে প্রভাবিত করা স্বাভাবিক। আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যে গল্পসাহিত্যই বোধহয় সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।

স্বাধীনতার পরে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকাগুলি এইজন্য প্রবল প্রয়াস ক'রে এসেছে। বহু শক্তিশালী লেখকলেখিকা গল্প রচনাশ নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে এগিয়ে এসেছেন এবং সাময়িক পত্রাদিতে গল্পবিভাগ এক গুরুত্বপূর্ণ আসনগ্র হণ করেছে। এই ক্ষেত্রে যাঁরা উল্লেখযোগ্য সাফল্যের অধিকারী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মনোজ দাস, শান্তনু কুমার আচার্য্য, কৃষ্ণ প্রসাদ মিশ্র, রবি পট্টনায়ক, রণধীর দাস, শ্রীমতী বীণপাণি মহান্তি, শ্রীমতী বসন্ত কুমারী পট্টনায়ক, চন্দ্রশেখর রথ, রজনীকান্ত দাস, অবনী কুমার বরাল, চৌধুরী হেমকান্ত মিশ্র, ফতুরানন্দ, লক্ষ্মীধর মহান্তি, রাজকিশোর মহান্তি, কৃষ্ণচরণ বেহেরা, নিমাইচরণ পট্টনায়ক, বসন্ত কুমার শতপথী প্রভৃতি বহু শক্তিশালী প্রতিভাকে স্মরণ করা যেতে পারে।

এ যুগের গল্পে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, রাজনৈতিক জীবনের পটভূমিতে আধুনিক সমাজসচেতন মানুষের ব্যক্তি-জীবনের লীলা, উৎকট জীবনসংগ্রামের হাহুতাশময় অভিব্যক্তি, সামাজিক অবিচারের গ্লানিকর পরিবেশ, প্রেমের দর্শনের নূতন অভিব্যঞ্জনা এবং যৌনবিকারগ্রস্ত পীড়িত মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতি, সাম্প্রতিক শিল্প-অভ্যুদয়ের মর্মবাণী, শ্রমিক ও সর্বহারার শোষণের বিরুদ্ধে অভিযান, যুদ্ধোত্তর যুগের সমাজের ব্যর্থতা, জীবনের আর্থিক মানসিক ও নৈতিক দুঃস্থিতি প্রভৃতি বিষয় নানা রূপে ও রঙ্গে পরিবেষিত হতে দেখা যায়। কয়েকজন শক্তিশালী গল্পকারের সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গধর্মী শৈলী অতিশয় মনোজ্ঞ ও উপভোগ্য। এগুলিতে শাণিত ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে সামাজিক ত্রুটি ও দুর্বলতার প্রতি কঠোর আঘাত করা হয়েছে। কতকগুলি গল্প প্রতীকধর্মী। এই যুগের গল্পলেখকদের কাছে জীবনই একমাত্র সত্য। জীবন জ্বালাময়, তথাপি তা অতি আনন্দদায়ক। অনেক গল্প আবার অত্যন্ত ভাবাশ্রয়ী। মানব চরিত্রের চিররহস্যময় অনুভূতি আধুনিক গল্পে রূপায়িত।

আধুনিক গল্পসাহিত্যে এমনি নানা রসঘন ও ভাবকেন্দ্রিক প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়। আধুনিক পাঠক মানবজীবনের রসপান করবার জন্য ব্যাকুল, আধুনিক লেখক সে সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। আধুনিক গল্পে অলঙ্করণের স্পৃহা নেই, অযথা বর্ণনাবিলাসে তা ভারাক্রান্ত নয়। সে গল্প ইঙ্গিতময় ও সাবলীল। তাই দেখি অতি সাধারণ পরিবেশের মধ্যে মানুষের সুখ-দুঃখ অভাব অভিজ্ঞতা আজ ওড়িয়া ছোটগল্পের প্রধান আভিমুখ্য। যুগ যুগ ধ'রে যে কথা যে চিত্র ছিল অকথিত, আজ আধুনিক গল্পে তা রসোত্তীর্ণ হয়ে সাহিত্যজগৎকে সার্থক ক'রে তুলেছে। আজকের কথাসাহিত্যে মানববাদী সংবেদনশীলতা সুপরিস্ফুট। ব্যষ্টিকে ছেড়ে সমষ্টির কল্যাণের জন্য এ যুগের প্রাণমনে আন্দোলন শুরু হয়েছে। এ যুগের গল্পের প্রকাশভঙ্গী সঙ্কেতধর্মী ও বুদ্ধিগত, তাই সে গল্পের রস গ্রহণ করতে গেলে সাম্প্রতিক যুগের ঐতিহাসিক পটভূমি এবং আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা অত্যাবশ্যক।

—পঠাণি পট্টনায়ক

সূচীপত্র

ফকীরমোহন সেনাপতি
(1843—1918)

বালেশ্বর শহরের কাছে মল্লিকাশপুরে ফকীরমোহন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে ওড়িয়া কথাসাহিত্যের জনক হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর হাতেই ওড়িয়া সাহিত্য এক নতুন গতি পেয়েছে। রাজা-রাজড়াদের কাহিনী থেকে সরে এসে ফকীরমোহন সর্বহারা মানুষের জীবন-কাহিনীকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করেন নিষ্ঠার সঙ্গে। এদিক থেকে ভারতে আধুনিক সাহিত্যের অবতারনায় ফকীরমোহন একজন অগ্রদূত। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কুটিল সংরক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার।

তিনি সাধারণ মানুষের কাহিনী লিখেছেন "ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ" (উনিশ বিঘা দুই কাঠা), "মামু", "প্রায়শ্চিত্ত" ও "লছমা" উপন্যাসে।

রেবতী

কটক জেলার হরিহরপুর পরগণায় একটি গ্রামের নাম পাটপুর। গ্রামের শুরুতে একটি বাড়ী। সামনে পিছনে চারখানি ঘর। প্রাচীরের গায়ে একচালার নীচে ঢেঁকিশাল, আঙ্গিনার মধ্যখানে কূপ। সামনের দিকে সদর দরজা। পিছনে খিড়কির। সদর ঘরে বাহিরের লোক আসে, বসে। প্রজারা আসে খাজনা দিতে। শ্যামবন্ধু মহান্তি জমিদারের গোমস্তা। মাহিনা মাসে দুই টাকা। মাহিনা বাদে তামাম-শোধ রসিদ কাটা, লাখেরাজ কোপাই ইত্যাদি হইতেও দু' পয়সা আসে। সব মিলাইয়া মাসে চার টাকার কম হইবে না, সংসার এক রকম কেন, বলিতে গেলে ভালই চলে। এটা হ'ল না, সেটা ঘরে নেই—এমনি কথা বাড়ীর কারও মুখে শুনা যায় না। খিড়কির বাগানে শাক-সব্জি ছাড়া সজিনা গাছ দুইটা। ঘরের লাগাও মাঠ, বছর-বিয়ানী দুইটা গরু বাঁধা—দুধ একটু, ঘোল দুই ফোঁটা হাঁড়ির তলায় লাগিয়া থাকেই। শ্যামের মা বুড়ী ভুষি মিশাইয়া ঘুঁটে দেয়, কাঠ কিনিতে হয় না। জমিদার প্রায় সাড়ে তিন বিঘা জমি চাষের জন্য দিয়াছেন, ধান বাড়তিও হয় না, কমতিও পড়ে না। শ্যামবন্ধু লোকটি বড় সহজ সরল, প্রজারা সমীহ করে, ভালবাসে। বাপুরে বাছারে বলিয়া ঘর ঘর ঘুরিয়া খাজনা আদায় করে, কারও কাছে অন্যায়ভাবে একটি পয়সা নেয় না। প্রজারা খাজনা দিয়া রসিদ চায় না, সে আপনি চার আঙ্গুল তাল পাতায় একখানা রসিদ লিখিয়া চালে গুঁজিয়া দিয়া যায়। জমিদারের পেয়াদা আসিলে গাঁয়ের ভিতরে যাইতে দেয় না, নিজেই তার হাতে ধরিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া তামাক খাওয়ার জন্য দু' পয়সা কোমরে গুঁজিয়া দিয়া

বিদায় করে। শ্যামবন্ধুর ঘরে পোষ্য চার জন। নিজেরাই দুই প্রাণী, বুড়ী মা, আর দশ বছরের মেয়েটি। মেয়ের নাম রেবতী। শ্যামবন্ধু সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় বসিয়া "কৃপাসিন্ধু বদন—" আর অন্যান্য ভজন গায়, কোন কোন দিন কাঠের পিলসুজটির উপরে পিদিম রাখিয়া ভগবত পড়ে, রেবতী কাছে বসিয়া শোনে। সে মুখে মুখে এমনি অনেক ভজন শিখিয়াছে, তার কচি মুখে ভারী মানায়। সন্ধ্যাবেলা বাপের কাছে বসিয়া যখন ভজন গায় গাঁয়ের কেহ কেহ আসিয়া শোনে। একটি ভজন গাহিলে শ্যামবন্ধু বড় খুশী হয়, রোজ মেয়েকে গাহিতে বলে। রেবতী গায়—

'দুখের কথা কাহারে বা বলি
তুমি না চাহিলে নাথ গরিবের ফুরাবে সকলি।
কর বা না কর ত্রাণ চরণে সঁপেছি প্রাণ
হৃদে আছি তোমা নাম ধরি
তোমা বিনা ত্রিভুবন শূন্য হে হরি!
শীতল কর এ জীবন প্রেমামৃত দান করি।

দুই বছর আগে স্কুলের ডেপুটি ইন্সপেক্টর মফস্বল গস্তে বাহির হইয়া পাটপুরে একটা রাত থাকিয়া গিয়াছিলেন। গ্রামের জনকয় মাতব্বর লোকে বলা কওয়া করাতে ডেপুটি বাবু ওড়িশা বিভাগের ইন্সপেক্টরের কাছে রিপোর্ট করিয়া আপার প্রাইমারি স্কুল বসাইয়া দিয়াছেন। শিক্ষকের বেতন মাসে চার টাকা। এই চার টাকা সরকারের কাছ হইতে মেলে। এ ছাড়া প্রত্যেক পড়ুয়া মাসিক এক আনা হিসাবে দেয়। শিক্ষকটি কটক নর্মাল স্কুলের গুরু বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্র, নাম বাসুদেব। নামটি যেমন বাসুদেব মানুষটিও তেমনি বাসুদেব। ছোকরার ভিতর বাহির সবই সুন্দর। গাঁয়ের মাঝ দিয়া চলিয়া যায় কারও দিকে মাথা তুলিয়া চায় না। বয়স আন্দাজ কুড়ি। সুন্দর চেহারা, একটি চালে গড়া। শিশুকালে তড়কা রোগ হইয়াছিল। তার মা মাথায় তাতানো বোতলের মুখ দিয়া ছেঁকা দিয়াছিল। তার দাগ আজও আছে। তা সে দাগ তাকে মানায়। বাসুদেব ছেলেবেলা হইতে বাপ-মা হারা, মামার বাড়ীতে মানুষ। বাসুদেব জাতিতে করণ,শ্যামবন্ধুও করণ। পূর্ণিমা লক্ষ্মীবার ইত্যাদিতে ঘরে পিঠে-পুলি হইলে শ্যামবন্ধু পাঠশালায় গিয়া বলিয়া আসে - বাবা বাসু, সন্ধ্যাবেলা একবারটি আমাদের বাড়ী যেও, তোমার মাসী ডেকেছে। এমনি যাওয়া আসায় তার উপর বাড়ীর সকলের একটা মায়া পড়িয়া গেছে। রেবতী বাসুকে দেখিলে বলে—আহা মা নেই, কি খায়, কে বা দেখে। বাসু রোজ সন্ধ্যায় শ্যামবন্ধুর কাছে দু'দণ্ড বসিয়া আসে। বাসুকে দূর হইতে দেখিলে 'বাসুভাই এসেছে—বাসুভাই এসেছে' বলিয়া রেবতী চেঁচাইয়া বাপকে বলে। রেবতী সন্ধ্যায় বাপের কাছে বসিয়া প্রতিদিন পঠিত পুরানো ভজনগুলি বাসুকে শোনায়। বাসুর সেই গান রোজ নতুনের মত লাগে। একদিন একথা সেকথা হইতে হইতে শ্যামবন্ধু শুনিলেন, কটকে একটি মেয়ে স্কুল আছে, সেখানে মেয়েরা পড়ে, কাপড় সেলাই করা শেখে। সেই অবধি রেবতীকে লেখাপড়া

শিখাইতে শ্যামবন্ধুর ইচ্ছা হইল এবং আপন ইচ্ছার কথা সে বাসুদেবকে বলিল। বাসু শ্যামবন্ধুকে পিতৃতুল্য মান্য করে, বলিল—আজ্ঞে, আমি সেই কথা বলব বলব করছিলাম। দুইজনের পরামর্শে রেবতীকে পড়ানো স্থির হইল। রেবতী কাছে বসিয়া শুনিতেছিল। দুই লাফে ঘরের ভিতরে গিয়া মাকে আর ঠাকুমাকে 'আমি লেখাপড়া শিখব—আমি লেখাপড়া শিখব' খবর দিল। মা বলিলেন—আচ্ছা আচ্ছা, শিখবি। ঠাকুমা বলিলেন—লেখাপড়া কী লো? মেয়েছেলে, লেখাপড়া কী? রাঁধাবাড়া শেখ্, পিঠে-পুলি শেখ্, আলপনা দেওয়া শেখ্, দই মোওয়া শেখ্, লেখাপড়া কীসের?

রাত্রে শ্যামবন্ধু বারান্দায় আমকাঠের পিঁড়িতে বসিয়া ভাত খাইতেছেন। রেবতী সঙ্গে বসিয়া খাইতেছে। বুড়ী সামনে বসিয়া—চারটি ভাত আন্, একটু ডাল দিয়ে যা, নুন একটু দে ইত্যাদি বউকে আদেশ করিতেছেন। কথায় কথায় বুড়ী বলিলেন—হ্যাঁরে শ্যাম, রেবী লেখাপড়া শিখবে—লেখাপড়া কিরে, মেয়েছেলের লেখাপড়া কী? শ্যামবন্ধু বলিলেন—বলছে যখন পড়ুক না। ঝঙ্কড়ের পট্টনায়ক বাড়ীর মেয়েরা যে ভগবত গাইতে পারে, 'বৈদেহীশ বিলাস'এর কলি গায়। রেবতী ভারী রাগিয়া গিয়া ঠাকুমাকে গালি দিয়া বলিল—যালো বুড়ী হাবড়ী! তারপর আবদার করিয়া বাবাকে বলিল—না বাবা, আমি লেখাপড়া শিখব। শ্যামবন্ধু বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, শিখবি। সেদিন এই পর্যন্ত।

তার পরদিন বিকালবেলা বাসুদেব সীতানাথ বাবুর 'প্রথম পাঠ' একখানি আনিয়া রেবতীকে দিতে সে বড় খুশী হইয়া বাপের কাছে বসিয়া বইয়ের গোড়ার পাতা হইতে শেষ পর্যন্ত উলটাইয়া দেখিল। তাতে হাতী ঘোড়া গরু ইত্যাদির ছবি দেখিয়া ভারী খুশী হইয়া উঠিল। রাজারা হাতী ঘোড়া বাঁধিয়া খুশী হন, কেহ কেহ হাতী ঘোড়া চড়িয়া খুশী হয়, আমাদের রেবী তার ছবি দেখিয়াই খুশী। রেবী ছুটিয়া গিয়া মাকে বইয়ের ছবিগুলি দেখাইল, তারপর ঠাকুমাকে দেখাইল। ঠাকুমা কিঞ্চিত বিরক্ত হইয়া বলিলেন—হাঁ হ্যাঁ, যা—যা—। রেবী তাকে দূর-দূর বলিয়া গালি দিয়া ফিরিয়া আসিল।

আজ শ্রীপঞ্চমীর দিন। রেবতী ভোর বেলা ডুব দিয়া স্নান করিয়া আসিয়া নতুন কাপড় একখানি পরিয়া ঘর বার করিতেছে, বাসুভাই আসিলে বই পড়াইয়া দিবে। বুড়ীর ভয়ে বিদ্যারম্ভের'আয়োজন কিছু হয় নাই। বেলা ছয় দণ্ড হইলে বাসু আসিয়া পড়াইল—স্বরে অ, স্বরে আ, হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ, হ্রস্ব উ, দীর্ঘ ঊ ইত্যাদি পড়া শুরু হইল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাসু আসিয়া পড়ায়। দুই বছরের মধ্যে রেবতী অনেক পড়িয়া ফেলিয়াছে। মধু রাও-এর ছান্দমালা গড় গড় করিয়া পড়িতে পারে।

একদিন রাতে শ্যামবন্ধু বসিয়া ভাত খাইতেছেন। মায়ে-পোয়ে কথাবার্তা হইতেছে। আগে বোধ করি কিছু কথা হইয়াছিল, আজ তারই উপসংহার।

শ্যামবন্ধু—কী মা, ভাল হ'ত না?

মা—হ্যাঁ, তাতো ভাল হত, জাতের খোঁজটা নিয়েছিস্ তো?

শ্যামবন্ধু—হ্যাঁ, আজ পর্যন্ত আর কিসের খোঁজ নিচ্ছিলাম ? ভাল করণ, গরিবের ছেলে হলেও জাতে ভাল।

মা— ধনদৌলতের বিচার না লাগে
কেমন জাত সে শুধাও আগে।

তা, ঘরে থাকবে তো ?

শ্যামবন্ধু—ঘরে না থেকে আর কোথায় যাবে ? হাজার হোক মামা-মামীই তো, আর কি ?

রেবতী কাছে বসিয়া ভাত খাইতেছিল, এই সকল কথার মর্ম সে কী বুঝিল সেই জানে, কিন্তু সেদিন হইতে তার ভাবভঙ্গী আমরা অন্যরকম দেখিতেছি। বাপের সামনে বাসুভাই তাহাকে পড়াইলে তার কেমন লজ্জা করে। কারণে অকারণে সব সময়ে হাসি আসে, মাথা নিচু করিয়া দুই ঠোঁট টিপিয়া হাসি লুকায়। আজকাল বাসু যখন পড়াইয়া দেয় রেবতী কখনও বা খুব আস্তে আস্তে পড়ে, কখনও খালি হুঁ হুঁ করিয়া যায়, পড়া সারা হইলে মুখ বুজিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরের ভিতর পালায়। রোজ সন্ধ্যার সময় সদর দুয়ারের কবাটে ভর দিয়া কাতার পথ চাহিয়া থাকে। বাসু আসিলে ঘরের ভিতর পালাইয়া যায়, সাত ডাকেও বাহির হয়না। আজকাল রেবতী ঘরের বাহিরে গেলে বুড়ী রাগ করে।

দেখিতে দেখিতে পঞ্চমী হইতে পঞ্চমী করিয়া দুই বছর হইয়া গেছে। বিধাতার বিধান, কারও দিন সমান যায় না। ফাল্গুন মাসের দিন, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ কোথা হইতে ওলাউঠা আসিল—সকালে গ্রামে শুনা গেল গোমস্তা শ্যামবন্ধুকে ওলাউঠায় ধরিয়াছে। মফস্বল গাঁয়ে ওলাউঠা লাগিলে সকলের বাড়ির কবাট পড়িয়া যায়। তখন লোকে বলে, ওলাউঠা বুড়ী বুঝি বা ঝুড়ি কাঁখে পথে পথে মানুষ কুড়াইয়া ফিরিতেছে। কেহ নাই যে ইহাদের দুয়ারে আসে। স্ত্রীলোক দুটি কী করিবে ? মেয়েটা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া ঘর বার করিতেছে। বাসুদেব শুনিয়া স্কুল ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিল। ভয় নাই ডর নাই, আপন শরীরের ভাবনা নাই, শ্যামবন্ধুর কাছে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতেছে, দু'ফোঁটা জল মুখে দিতেছে। বেলা তিন প্রহরের সময়ে শ্যামবন্ধু বাসুর মুখের পানে চাহিয়া নাকি সুরে থামিয়া থামিয়া কষ্টে বলিল —"বাঁ-সুঁ রেঁ-বঁ-কেঁ দেঁ-খোঁ।" বাসু ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঘরে শোরগোল উঠিল। রেবতী মাটিতে পড়িয়া গড়াইতেছে। গ্রামের লোকে শুনিতে পাইয়া বলিল—তবে বুঝি হয়ে গেল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাবেলায় সব শেষ। কী করিবে—বাসুদেব তো গতকালের ছেলে, আর দু'জন মেয়েমানুষ। গ্রামের ধোপা বন সেঠি একজন সমঝদার ও সহানুভূতিশীল লোক, জীবনে পঞ্চাশ কি ষাট জনকে পার করিয়াছে। কাল হইলে যাইতে হইবে, আজ হইলেও যাইতে হইবে, ধুতিটা কাপড়টাও মিলিবে ভরসা আছে। কোমরে গামছা একখানা বাঁধিয়া টাঙ্গি কাঁধে ফেলিয়া আসিয়া হাজির হইয়া গেল। গাঁয়ে করণ মাত্র সেই একঘর, শাশুড়ী বউ বাসুদেব তিনজনে ধরাধরি করিয়া সংকারের কাজ চালাইয়া লইল। সে

সময়কার কথাগুলি লিখিতে আর হাত উঠে না। যখন শ্মশান হইতে ফিরিল তখন প্রভাতী তারা উঠিয়াছে। ঘরে পা দেওয়া মাত্র রেবতীর মা বাহ্যে গেল, দেখিতে দেখিতে বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে গাঁয়ে চাউর হইল রেবতীর মা আর নাই।

দিন কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। 'কারও পালকির উপর পাটছাতা, কারও বেড়ির উপর কোড়া'। দিন যাইতেছে সকলেরই, যাইবেও সকলেরই। দেখিতে দেখিতে তিনমাস কাটিয়া গিয়াছে। শ্যামবন্ধুর বাড়ীতে দুইটি গাই ছিল, বাকী তহবিলের দায়ে জমিদার কাছারির লোক আসিয়া তাহাদের বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা জানি, জমিদার কাছারির টাকা শ্যামবন্ধু শিবনির্মাল্যের ন্যায় জ্ঞান করে, একটি টাকাও উসুল হইলে কাছারিতে জমা না দেওয়া পর্যন্ত তাহার ঘুম হয় না। কিন্তু তার উপরে টাকা থাক বা না থাক গাই দুটি বড় দুধালো, একথা পূর্ব হইতে জমিদারের জানা ছিল। তাছাড়া, জমিদার চাষের জন্য যে তিন একর জমি দিয়াছিলেন তা ছাড়াইয়া নিয়াছেন। হেলে মজুরটাই বা আর ঘরে কেন থাকিবে? দোল পূর্ণিমার দিন সেও ছাড়িয়া গেল। বলদ দুইটা সাড়ে সতের টাকায় বেচা হইয়াছিল। দুই জনের ক্রিয়াতে খরচ গিয়া যাহা বাকী ছিল যেনতেন করিয়া এক মাস চলিল। আজ ঘটিটা কাল বাটিটা বিক্রয়-বন্ধক করিয়া আর এক মাস গেল। বাসু দুইবেলা আসে, এক দণ্ড রাত্রি অবধি থাকে, ঠাকুমা-নাতিনী শুইতে গেলে বাসায় ফেরে। বাসু টাকা পয়সা কিছু দিলে ঠাকুমা বা নাতনী কেহ নেয় না। জোর করিয়া রাখিয়া গেলে কুলুজিতেই পড়িয়া থাকে। বাসু তাই দেখিয়া আর কিছু দেয় না। বুড়ীর কাছ হইতে একটা দুইটা পয়সা নিয়া সওদা করিয়া দেয়, সেই দুই পয়সার সওদায় আট দশ দিন চলিয়া যায়। ঘরের চাল উড়িয়া গিয়াছে, ছাউনি করা দরকার। বাসু দুই টাকার খড় কিনিয়া খিড়কিতে গাদা করিয়াছে, জল হওয়ায় ছাউনি হইতে পারে নাই। বুড়ী এখন আর দিন রাত কাঁদে না। কেবল সন্ধ্যা হইলে বসিয়া কাঁদে। কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে লুটাইয়া পড়ে। বুড়ী আজকাল চোখে ভাল দেখে না। পাগলিনীর মত হইয়া গিয়াছে, এখন সে কান্না রাখিয়া রেবতীকে গালি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এত যে দুঃখ, এত যে দুর্দশা, সকলের মূল রেবতী—ইহা সে মনের মধ্যে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে। রেবতী লেখাপড়া শেখাতে ছেলে মরিল, বউ মরিল, হালচাষী ছাড়িয়া গেল, বলদ বিক্রি হইয়া গেল, জমিদার বাড়ীর লোক গাই বাঁধিয়া লইয়া গেল। রেবতী অলক্ষ্মী, সে বেচাল, সে লক্ষ্মীছাড়ী। বুড়ী যে চোখে দেখে না তারও কারণ রেবতীর লেখাপড়া শেখা। বুড়ী যখন গালি দেয় রেবতীর দু'চোখে ধারা বহিয়া যায়, ভয়ে বুড়ীর কাছে সে দাঁড়াইতে পারে না। খিড়কির দুয়ারে, হয়তো ঘরের কোণে মুখ ঢাকিয়া কাঠের মত বসিয়া থাকে। বাসুও দোষী, কারণ রেবতী তো এতদিন লেখাপড়া করে নাই, সেই না আসিয়া লেখাপড়া শিখাইল। কিন্তু বুড়ী বাসুকে কিছু বলিতে পারে না, বাসু না হইলে ঘর এক দণ্ড চলে না। আবার জমিদারের কাছারি হাঙ্গামা বন্ধ করে নাই, তাহার লোক আসিয়া আজ এ হিসাবটা কাল সে হিসাবটা চায়। বাসু না

হইলে কাগজপত্রের তাড়া হইতে পড়িয়া বাহির করিয়া দিবে কে ? বাসুর অসাক্ষাতে সে কখন কখন সাদা কথায় আপন মন্তব্য প্রকাশ করে। রেবতী আর আজকাল সেই গৃহ-প্রাঙ্গণ-সঞ্চারিণী লীলাময়ী প্রতিমা নয়, তাহার গলা আর কেহ শোনে না। বাপ মা যাওয়ার দিন হইতে তাহাকে সদর দুয়ারে আর কেহ দেখে নাই। কতদিন অবধি ভেউ ভেউ করিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিত, এখন আর চিৎকার করিয়া কাঁদে না, কিন্তু রাত্রি দিন তাহার বড় বড় চোখ দুইটি ছোট ছোট নীলপদ্মের মত ছল ছল করে। তাহার ক্ষুদ্র প্রাণ—তাহা হইতে অতি ক্ষুদ্র মনটি একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার পক্ষে এখন দিন রাত সমান। সূর্যের আলো নাই, রাত্রির আঁধার নাই। সমস্ত জগৎ শূন্য, কেবল পিতামাতার মূর্তি হৃদয় পূর্ণ করিয়া আছে। মা এইখানে বসিয়া আছেন, বাবা ঐ হাঁটিয়া যাইতেছেন—তাহার চোখে কেবল এই সবই ধরা দিতেছে। বাবা,মা মরিয়া গিয়াছেন আর তাঁহারা আসিবেন না একথা সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। পেটে ক্ষুধা নাই, চোখে ঘুম নাই, দিবানিশি অনুক্ষণ পিতামাতা ধ্যান। ঠাকুমার ভয়ে খাইতে বসে। মেঝে হইতে প্রায় উঠে না। গায়ে হাড় চামড়া দুইখানি লাগিয়া আছে। কেবল বাসুদেব আসিলে সে উঠিয়া বসে, বড় বড় চোখ দুইটা মেলিয়া বাসুর পানে চাহিয়া থাকে, বাসু তাকাইলে ছোট একটি নিশ্বাস ফেলিয়া মাথা নিচু করে। বাসু কাছে থাকা অবধি তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। সে সময়ে তার আর কোন জ্ঞান থাকে না—চোখে বাসুদেব, চিন্তা বাসুদেব, সমস্ত হৃদয়টা বাসুদেবময়।

আঙ্গুলের গুনতিতে শ্যামবন্ধু মরার আজ পাঁচ মাস, জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন, ঠিক দিন দুই প্রহরে বাসু দুয়ারে আসিয়া ডাকিল। এমনি সময়ে সে কোন দিন আসেনা। বুড়ী কষ্টে সৃস্টে গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। বাসু বলিল—ঠাকুমা (বাসু বুড়ীকে ঠাকুমা বলিয়া বরাবর ডাকে), 'দিপোটি' ইন্সপেক্টর হরিপুর থানায় ব'সে পাঠশালার ছেলেদের পড়া ধরবেন, সব স্কুলের ছেলেরাই যাবে, আমার কাছে চিঠি এসেছে, আমি ছেলেদের নিয়ে কাল সকালে যাব, পাঁচ দিন পরে আসব। রেবতী কবাটের কোণে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। ভাগ্যে কবাট ধরিয়া ছিল, নহিলে পড়িয়া যাইত। বাসু পাঁচ দিনের জন্য চাল তেল বেগুন কিনিয়া আনিয়া আঙ্গিনায় রাখিয়া দিয়া বুড়ীকে প্রণাম করিয়া শনিবার যখন সন্ধ্যা লাগিয়া আসিতেছে এমনি সময়ে রওনা হইল। বুড়ী বলিল—বাবা রোদে ঘুরবি না, গা-গতরের দিকে চাইবি, বেলা হ'লে দু'টো মুখে দিবি। এই বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল। রেবতী একদৃষ্টে বাসুর দিকে চাহিয়া আছে। বাসুরও আজ আগের মত চাহনি নাই। আগে বাসুর ইচ্ছা হইত রেবতীকে ভাল করিয়া দেখে কিন্তু তাকাইতে পারিত না—আজ চারি চক্ষুর মিলন, চোখ ফিরাইবার কাহারও শক্তি নাই। বাসু চলিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, ঘর বাহির অন্ধকারে ভরিয়া গিয়াছে, রেবতী যেমন চাহিয়া ছিল তেমনি চাহিয়া আছে। বুড়ীর হাঁকে তাহার চৈতন্য হইল। ঘর বাহির সব অন্ধকারময়।

রেবতী বসিয়া দিন গুনিতেছে—আজ ছয় দিন। বাবা মা যাওয়া অবধি সদর দুয়ার দেখে নাই, আজ সকাল হইতে দু'বার সদরে উঁকি মারিয়া গেছে। বেলা আন্দাজ ছয় দণ্ড, হরিহরপুর হইতে স্কুলের ছেলেরা ফিরিবামাত্র লোকে বলাবলি করিতে লাগিল—হরিহরপুর থেকে ফেরবার সময়ে গোপালপুরের বটগাছের তলায় পণ্ডিতকে ওলাউঠায় ধরল। চারবার দাস্ত হ'ল, মাঝ রাতে চ'লে গেলেন। গ্রামের লোকেরা হায় হায় করিল, ছেলে মেয়ে মায়েরা চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কেহ বলিল—আহা, কী রূপ গা। কেহ বলিল—কী ধীর শান্ত গো। কেহ বলিল—পথ দিয়ে চলে যাবে, কারও পানে মুখ তুলে চাইবে না।

রেবতী শুনিল, বুড়ী শুনিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুড়ীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, আর কাঁদিতে পারে না, শেষে উঠিয়া বলিল—আহা বাপ, বিদেশে এসে আপন বুদ্ধির দোষে প্রাণ হারালি রে! অর্থাৎ রেবতীকে লেখাপড়া শিখাইবার দুর্বুদ্ধির ফলে সে মরিয়া গেল, তাহা না হইলে কখনও মরিত না। শোনা অবধি রেবতী গিয়া ঘরের ভিতরে পড়িয়া আছে, সাড়া শব্দ নাই। সে দিনটা গেল। পর দিন সকালে বুড়ী রেবতীকে কাছে পিঠে না দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—ওলো রেবতী, রেবী লো, অ পোড়ার মুখী! বুড়ী পাগলীর মত হইয়া গেছে, কাঁদা কাটা নাই, কেবল রাগের ভরে দিনরাত রেবতীকে গালি দেওয়া। প্রতিবেশী লোকেরা, পথের লোকেরা যখন তখনই শোনে—ওলো রেবতী, ও রেবী, অ পোড়ার মুখী! বুড়ী চোখে দেখে না, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া গিয়া রেবতীকে পাইল, ডাকিল। জবাব না পাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দেখিল ভারী জ্বর, গা দিয়া আগুন ছুটিতেছে, জ্ঞান নাই। বুড়ী অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া কী ভাবিল। কী করিবে কাহাকে ডাকিবে, মনে মনে বিশ্বসংসার উজাড় করিল, কাছে কাহাকেও দেখিল না। কিছু স্থির করিতে না পারিয়া গিয়া বলিল—'যেমন কম্ম তেমন ফল', অর্থাৎ তুই লেখাপড়া শিখেছিস, তাই জ্বর হ'ল, আমি কী করব?

একদিন গেল, দুই দিন গেল, তিন দিন গেল, চার দিন গেল, পাঁচ দিনও গেল। রেবতী মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, চোখ খোলে না, ডাকিলে উত্তর নাই, হুঁ-হাঁটুকুও নাই। আজ ছয় দিন, রেবতী সকাল হইতে দু'তিনবার চেঁচাইয়াছে, বুড়ী চিৎকার শুনিয়া কাছে গেল, গায়ে হাত বুলাইয়া দেখিল, হাত পা ঠাণ্ডা। ডাকিলে হুঁ হুঁ জবাব দিল, বড় বড় চোখ করিয়া মুখের পানে চাহিতেছে, কিছু না বলিতেই কত কথা বলিয়া যাইতেছে। কোন কবিরাজ দেখিলে 'তৃষ্ণা দাহঃ প্রলাপশ্চ—' ইত্যাদি শ্লোক পড়িয়া বলিতেন—'সন্নিপাতস্য লক্ষণম্'। বুড়ী কিন্তু খুশী হইল। গায়ে তাত নাই, কথা কহিতেছিল না, এখন কহিতেছে, জল খাইতে চাহিয়াছে, ছয়দিন হইল মুখে এক ফোঁটা জল পড়ে নাই, দুটা পথ্যি পেটে পড়িলে মেয়েটা উঠিয়া বসিবে। 'তুই শুয়ে থাক্, আমি চারটি রেঁধে নিয়ে আসি' এই বলিয়া বুড়ী ভাঁড়ারের দিকে গেল। পথ্য কী রাঁধিবে? ঘরে ডালা হাঁড়ি-কুড়ি ভাঁড়া সব খুঁজিয়া দেখিল এক মুঠি চাল নাই। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া একদণ্ড বসিয়া

রহিল। বাসু পাঁচ দিনের মত চাল ডাল কিনিয়া দিয়া গিয়াছিল, তাহাতে দশ দিন চলিয়া গিয়াছে। বুড়ীর দৃষ্টিশক্তি থাকিলে বুঝিতে পারিত। বসিয়া চিন্তা করিলে বুদ্ধি আসে। ঘরে বাসন কোসন কিছু নাই, হাতে একটা ফুটা ঘটি পড়িল, সেইটা নিয়া হরি সা'র দোকানে চলিল। হরি সা'র ঘর গাঁয়ের মাঝখানে, তার রীতিমত দোকান নাই, চাল ডাল নুন তেল রাখে, কোন দিন বিদেশী লোক কেহ আসিলে কেনে। বুড়ী ঘটিটি লইয়া হরি সা'র দুয়ারে গেল। হরি সা বুড়ীর হাতে ঘটি দেখিয়া তার অর্থ বেশ বুঝিল। বুড়ী তার অভিপ্রায় জানাইতে হরি ঘটিটা হাতে নিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বলিল—না না, আমার ঘরে চাল নাই, আর এ ফুটো ঘটি রেখে কে চাল দেবে? হরির ঘরে যে চাল ছিল না তাহা নহে, দিতে ইচ্ছাও, তবে শস্তায় লইতে হইবে। চাল নাই শুনিয়া বুড়ীর তো মাথায় বাজ পড়িল। কী করিবে, মেয়েটা জ্বর হইতে উঠিয়াছে, তার মুখে কী দিবে? একদণ্ড সেখানে বসিয়া রহিল। বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে, হরির দিকে দু'বার চাহিল। "যাই, মেয়েটা কী করছে দেখি।" ঘটিটি হাতে করিয়া উঠিল। হরি বলিল – দাও দাও, ঘটিটা দাও। দেখি ঘরে কী আছে। হরি ঘটিটা রাখিয়া সের দুই চাল, পোয়াটেক ডাল, আর কিছু নুন দিল। বুড়ী চার ছ' জায়গা বসিয়া উঠিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। আজ এ পর্যন্ত বুড়ীর দাঁতে দাঁতন লাগে নাই। শরীর মনের কথা আর কী বলিব? ঘরে আসিয়া রেবতীকে ডাকিল। তার বিশ্বাস রেবতী ভাল হইয়া গেছে, জল তুলিয়া দিবে, সে ভাত রাঁধিবে। রেবতী জবাব না দেওয়ায় সে ভারী চটিয়া গিয়া ডাকিল—ওলো রেবতী, ও রেবী, অ পোড়ার মুখী! জবাব নাই।

এদিকে রেবতীর সন্নিপাত রোগ ক্রমশঃ বাড়িতেছে, ভয়ানক যন্ত্রণা, গা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, জিভ শুকাইয়া গিয়াছে, ভয়ঙ্কর পিপাসা, জিভটা যেন ভিতরে ঢুকিয়া যাইতেছে। ঠাণ্ডা জায়গায় যাইতে ইচ্ছা, সারা ঘরে গড়াগড়ি দিয়া বাহিরে আসিল, ভাল লাগিল না। খিড়কির উঠানে গিয়া বারান্দায় বসিল। দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, খুব বাতাস বহিতেছে, আলসেয় ঠেস দিয়া বসিল। সারা বাগানটার দিকে তাকাইয়া দেখিল। বাবা গেল বছর এই কলা গাছটা লাগাইয়াছিলেন, মোচা বার হইয়াছে, দুই বছর আগে মা একটা পেয়ারা গাছ পুঁতিয়াছিলেন, রেবতী ছোটাছুটি করিয়া কুয়া হইতে এক ঘটি জল আনিয়া সে গাছে দিয়াছিল, সেই গাছটা কত বড় হইয়াছে, ফুল ধরিয়াছে। সে গাছ দেখিয়া মা'র কথা মনে পড়িল। বুদ্ধি স্থির নাই, মন চঞ্চল, লাগালাগি কোন কথা মনে পড়ে না, কিন্তু মায়ের আনন্দময়ী মূর্তি মন হইতে যায় না। সন্ধ্যা হইয়া গেল, গাছতলা হইতে ডালপালার আড়াল হইতে অন্ধকার বাহির হইয়া খিড়কি ভরিয়া দিয়াছে, আর কিছু দেখা যায় না। আকাশের দিকে চাহিল, এক-পহুরে তারা হইতে ধক ধক করিয়া কিরণ বাহির হইতেছে। এক দৃষ্টে রেবতী সেই তারার দিকে চাহিয়া আছে, চক্ষে পলক পড়ে না। তারার আকার ক্রমে বাড়িতেছে, একটা চাকার মত

বড় হইয়া গেল, আরও বড় হইয়া গেল, আরও বড়, ক্রমশঃ আরও উজ্জ্বল। আহা! এ কী মূর্তি তারার মধ্যে? শান্তিদায়িনী প্রেমময়ী আনন্দময়ী মায়ের অভয়া মূর্তি বসিয়া সস্নেহে কোলে নিবার জন্য ডাকিতেছে। মা দুইটি কিরণ হস্ত বাড়াইয়া দিলেন। সেই কিরণ দুইটি আসিয়া দুই চক্ষু স্পর্শ করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে আর কোন শব্দ নাই। কেবল নিশ্বাসের শব্দ, সে শব্দ ক্রমশঃ প্রবল হইল, খুব দীর্ঘ নিশ্বাস, শেষে মা—মা—দুইবার অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল। খিড়কি নিস্তব্ধ, নীরব।

এদিকে বুড়ী পা ঘষটাইয়া রেবতীর শুইবার জায়গায় গিয়া দেখিল কেহ নাই। এ ঘর ও ঘর, বাহিরের আঙ্গিনা, ঢেঁকির নীচে, ঢেঁকির পাশে দেখিল, কোথাও নাই। ভাবিল, জ্বর সারিয়া গেছে খিড়কির দিকে বেড়াইতেছে। সেই ডাক—ওলো রেবতী, ও রেবী, অ পোড়ারমুখী! খিড়কির আঙ্গিনায় গেল, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া বারান্দায় উঠিল। বারান্দা মাটি হইতে দুই হাত উঁচু, এক হাত চওড়া।

আ ম'ল, তুই এইখানে বসে আছিস্? গায়ে হাত দিয়া বুড়ী প্রথমে চমকাইয়া উঠিল, আর একবার ভাল করিয়া পা হইতে মাথা পর্যন্ত হাত বুলাইল, নাকের কাছে হাত দিয়া একটা বিকট শব্দ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বারান্দার নীচে ধুপধাপ শব্দ।

শ্যামবন্ধু মহান্তির বাড়ীর কাহাকেও কেহ আর দেখে নাই। প্রতিবেশীরা রাত্রি এক প্রহরের সময়ে শেষ শব্দ শুনিয়াছিল—

ওলো রেবতী, ও রেবী, অ পোড়ারমুখী!

গোদাবরীশ মহাপাত্র (1899—1975)

পুরী জেলার বাণপুর থানার কুমারঙ্গ গ্রামে গোদাবরীশ মহাপাত্র জন্মগ্রহণ করেন। গোদাবরীশ একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার এবং সাংবাদিক। তাঁর সম্পাদিত ব্যঙ্গধর্মী পত্রিকা "নিআঁ খুন্টা" ওড়িয়া সাংবাদিকতায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 1938 সাল থেকে মৃত্যু অবধি তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। প্রশাসন ও সমাজের দুর্নীতি ও অসাম্য মনোভাবের নগ্ন প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি। তাঁর কবিতাগ্রন্থ "কন্টা ও ফুল" সাহিত্য অকাদেমী কর্তৃক পুরস্কৃত হ'য়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: "মু "দিনে মন্ত্রী থিলি", "ওড়িশার মশাণি ভিতর" (ওড়িশার শ্মশানে), "মদ দোকানর ইতিহাস"।

নীলা মাষ্টারনী

কথাটা তিন গাঁয়ের বটে, কিন্তু খবরটা দশ পঁচিশ গাঁয়ের জানা। এ গাঁয়ের কাক অন্য গাঁয়ের আকাশে উড়িয়া আর গাঁয়ের খড়ের চালে বসিয়া কোনো বাছবিচার না করিয়া সবখান হইতেই আহার সংগ্রহ করিয়া ফেরে, সব গাঁয়েই একইরকম ডাকে। এ গাঁয়ের গরুর পাল ও গাঁয়ের মাঠে চরিতে যায়। এ গাঁয়ের পথের কুকুর খাবার খুঁজিতে আর দু'চার গাঁয়ে ঘুরিয়া আসে; কিন্তু এই কাক-কুকুর ও গাই-গরুকে কেউ কিছু বলে না, কেবল এ গাঁয়ের মানুষ আর গাঁয়ে গেলে, সে গাঁ ডিঙ্গাইয়া তৃতীয় গাঁয়ের রাস্তায় পা দিলে কিংবা সেই গাঁয়ের লোক এ গাঁয়ে আসিলে, অথবা তিন গাঁয়ের লোকের কারও সঙ্গে কারও দেখা হইলে কার মুখে কত কথা শোনা যায়। কেউ বলে লেখাপড়ার দোষ, কেউ বলে সমাজের দোষ, কেউ বা বলে লেখাপড়ার দোষ নয় বা সমাজের দোষ নয়, দোষটা নীলা মাষ্টারনীরই। নিমাপাড়ার আশপাশের তিনখানি গাঁয়ের ঘাটে বাটে এমনি কত কথা হয়।

এই নীলা মাষ্টারনী কে?

সময়টা গ্রীষ্মকালের রাত। আকাশ ধোঁয়াটে। ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় পৃথিবীটা ছায়া ছায়া দেখাইতেছে। রাত এক প্রহরের বেশী হইবে এই তিনটি গাঁয়ের মধ্যে একটি গাঁয়ের ছোট কুঁড়ে ঘরের ভিতরে দুই তিনখানা ময়লা কাপড়ের পুঁটুলির মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া বাইশ বছর বয়সের একটি যুবতী কত কথা ভাবিতেছে। দেখিলে কারও মনে হইতে পারে যুবতী সারাদিন খাটিয়া খুটিয়া

আসিয়া ক্লান্ত হইয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, হুঁশ নাই, কেবল খাটুনির দরুন গায়ের ব্যথার জন্যই সে এপাশ ওপাশ করিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাহার গ্লানি, তাহার কষ্ট দেহের নয়, তাহা মনের। গত তিন বৎসর তাহার অন্তরাত্মা যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। সে চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে বটে, চোখে তাহার ঘুম নাই। চোখ বুজিয়াও সে যেন সব দেখিতে পাইতেছে। তাহার মুদ্রিত চোখের সম্মুখে সে একটা গোটা জগৎ সংসারের দৃশ্য দেখিতে পাইতেছে, তাহা একেবারে বিধ্বস্ত। সেই জগতে রাস্তাঘাট নাই, কূলকিনারা নাই, মাথা গুঁজিবারও ঠাঁই নাই। সে দেখিতেছে, দশ বারো বছর আগেকার দৃশ্য। মানস-চক্ষুতে তাহা কত সুন্দর। দেখিতেছে, একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের নিরালা কুটীর। সেই কুটীরের ভিতরে দুইটি সন্তান ও তাহাদের পিতা। মা দুই বছর আগে চলিয়া গিয়াছেন। মা চলিয়া যাওয়ার দুঃখ তাহার মনে যত না বাজে, বাজে বাবার মনে। রাত না পোহাইতেই বাবা উঠিয়া গাঁয়ের প্রান্তে পুকুরধারের মন্দিরের বাগান হইতে এক আঁজলা সদ্য ফোটা ফুল তুলিয়া আনিয়া আবার বাহির হইতেছেন, আর সেই শিশু দুইটি বাহিরের বারান্দায় তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। এক প্রহর বেলায় বাবা ফিরিয়া আসিতেছেন, ঘরে আবার আনন্দের কোলাহল উঠিতেছে। বাবা তাহাদের ক্ষণেক বুকে চাপিয়া ধরিয়া গোপনে চোখ মুছিতেছেন। তারপর ঘর ঝাঁটাইয়া উনান নিকাইয়া রান্না সারিয়া ঠাকুর ঘরে পূজায় বসিতেছেন। পূজায় বসিয়া ঠাকুরকে তিনি কত কী যে বলিতেছেন ছেলেমেয়ে দুটি কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না।

যুবতী আবার পাশ ফিরিতেছে। চোখ খুলিয়া দেখিল ঘরে কেহ নাই। আবার চোখ বুজিল। আবার সে দেখিতেছে সেই অতীতের ছবি। আবার আর এক দৃশ্য। সেই মাতৃহীন সন্তান দুটির মধ্যে ছোটটি ভাই, বোনটি আট দশ বছরের। ভাইবোনে গাঁয়ের পাঠশালায় লেখাপড়া করিতেছে, ধূলি ধূসরিত হইয়া বই-শ্লেট হাতে করিয়া ঘরে ফিরিতেছে, মাতৃশূন্য সেই কুটীরে পিতার স্নেহ পাইয়া হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইতেছে।

যুবতী আবার পাশ ফিরিয়া তেমনি মানস-চক্ষে দেখিতে লাগিল আর এক দৃশ্য। মেয়ের বয়স হইল, বাবা দেখিয়া শুনিয়া বর আনিলেন, আঙিনায় বেদীর উপরে বসিয়া নববস্ত্রে সর্বাঙ্গ মুড়িয়া পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে সে কাহার পাণি গ্রহণ করিল। ইহা দেখিয়া অর্ধসুপ্ত অবস্থায় তাহার সেই দেহটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। তাহার রোমকূপে শিহরণ লাগিল। সে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া আবার সেই ময়লা কাপড়ের ভিতর মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। তারপর দেখিল সব শেষ। বিবাহের ছয় মাস মাত্র হইয়াছে, সেই মাতৃশূন্য কুটীরের ভিতরে মাতৃহীনা কিশোরীর নিরাভরণ অঙ্গ সৌষ্ঠব সকালের ঝরিয়া পড়া শেফালী ফুলের মত পড়িয়া রহিল। কে তাহাকে কুড়াইয়া তুলিয়া দেবতার মস্তকে দিবে? সমাজে সে বিধান নাই।

এ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যুবতীর দুই চোখ হইতে দুই ফোঁটা নির্মল অশ্রু ঝরিয়া

পড়িয়া সেই ময়লা কাপড়ের ভিতরে কোথায় মিলাইয়া গেল। সেই সময়ে তাহার মুখ হইতে কেবল বাহির হইয়া আসিল—মা গো।

মা সেখানে ছিল না। সে তো কবেই চলিয়া গিয়াছে, বাবাও চলিয়া গিয়াছেন। সে দেখিল, সেই কুঁড়ে ঘরের ভিতরে সেই নিরাভরণা কন্যাকে বাবা লেখাপড়া শিখাইতেছেন। সে সেলাই শিখিল, সে পড়িতে শিখিল, সে হিসাবপত্র রাখিতে শিখিল। এমনি সময়ে সে অঞ্চলে আসিল নারী আন্দোলনের জোয়ার। সেই জোয়ারের তরঙ্গাঘাতে বাবা মাতিয়া উঠিলেন, কাছের গাঁয়ের প্রাইমারী স্কুলে মেয়েকে কাজে বসাইয়া দিলেন। সেই হইতে তাহার নাম হইল নীলা মাষ্টারনী।

যুবতী ময়লা কাপড়ের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া দেখিল নীলা মাষ্টারনীকেও আর দেখা যায় না। বাবা চলিয়া গেছেন—যেখানে গেলে কেউ আর ফেরে না, সেইখানে। আর ভাই সরিয়া গেছে কাছ হইতে দূরে।

নীলা মাষ্টারনী গেল কোথায়? তিনখানি গাঁয়ের মধ্যে মাঝখানেরটিতে নীলা মাষ্টারনী 'মাষ্টারনী' হইয়া রহিল। বুড়ারা তাহার নিন্দা করিলেন, যুবকেরা প্রশংসা করিল, ছাত্রছাত্রীরা তাহাকে মায়ের মত দেখিল। নীলা মাষ্টারনী এ গাঁয়ে পড়াইয়া ও গাঁয়ে তার সেই পিতৃ-মাতৃহীন কুটীরের ভিতরে ফিরিয়া গিয়া আদরের ভাইটিকে মানুষ করিতে লাগিল।

যুবতী ছট ফট করিয়া উঠিয়া আবার উপুড় হইয়া পড়িয়া অতি বিচিত্র দৃশ্য দেখিল। যে গাঁয়ে নীলা মাষ্টারনী শিশুদের স্কুলে পড়ায় সেই গাঁয়ে কয়েকটি যুবকের চেষ্টায় একটি যাত্রার দল খোলা হইয়াছে। রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, ভারতলীলা—এমনি কত পালা শিখিয়াছে সেই যাত্রার ছেলেরা। সেই সকল লীলার ভিতরে নীলা মাষ্টারনীর জীবনলীলা আরম্ভ হইয়াছে। ভারতলীলায় অর্জুন সাজে দুইখানি গাঁয়ের মন্দিরের সেবায়েত ধোবা মদন সেঠী। তৃতীয় গ্রামে তাহার বাড়ি। লক্ষ্যভেদ লীলায় অর্জুন হইয়া মদনা যখন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে মাছের চোখে তীর লাগাইল, সেই তীর হৃদয়চক্রের তলে তলে অতি গোপনে নীলা মাষ্টারনীর চোখে গিয়া লাগিল। মানস-চক্ষুতে এ দৃশ্য দেখিয়া যুবতী আবার তেমনি ছটফট করিয়া উঠিল। দেখিল মদনা সেঠীর তীর নীলা মাষ্টারনীকে অন্ধ করিয়া দিল। নীলা মাষ্টারনী চোখ থাকিতে অন্ধ হইয়া দ্রৌপদীর বেশে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল। তাহার শিক্ষকতা গেল, তাহার ভ্রাতৃস্নেহ গেল, তাহার সমাজ-বন্ধন গেল। সে লোকাপবাদকে ডরাইল না, সমাজের বন্ধন মানিল না, গাঁয়ের লোকের কথা শুনিল না। পিতৃ-পিতামহের কুটীর ছাড়িয়া আপন সমাজের সকল মমতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল মদনার সঙ্গে।

ওঃ কী দারুণ দৃশ্য! দুইটি মাস নীলা মাষ্টারনী মদনাদের ঘরে বধূ হইয়া রহিল। তারপরে আসিল বিষম পরিস্থিতি। যাত্রার আখড়া ভাঙ্গিয়া গেল। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ ফুরাইয়া গেল। নীলা মাষ্টারনীর দ্রৌপদীবেশ কোথায় গেল। মদন খাইল মদ। নীলা মাষ্টারনী বারণ করিল। তারপর কলহ, তারপর অভাব,

তারপর ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি কাঁধে লইয়া নীলা মাষ্টারনী চলিল ধোপানীর বেশে পুকুর ঘাটে। মাথার উপর লজ্জা অপমানের ভার এত হইল যে পিঠে ময়লা কাপড়ের বোঝার ভার না থাকিলেও সে আর মাথা উঁচু করিয়া রাখিতে পারিত না। যুবতী এখন ময়লা কাপড়ের স্তূপের ভিতর হইতে মুখ তুলিয়া যে কাহার আশ্রয় নিবে ভাবিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল যে সে সেই অতীতের 'নীলা মাষ্টারনী', ও গাঁয়ের মাতৃহীন দুইটি শিশুর মধ্যে একটি, যে অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছে।

সেই আগেকার নীলা মাষ্টারনী ও আজিকার নীলা ধোপানী ময়লা কাপড়ের মধ্যে পড়িয়া থাকিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়া রাত আসিয়া পড়িল। রাতও যখন এক প্রহর হইতে দুই প্রহরে গড়াইল পড়শীর ঘরে লোকের গলা শুনা গেল। নীলা ধোপানী পাগলিনীর মত দুয়ার খুলিয়া পড়শীর ঘরে গিয়া বলিতে লাগিল—যা এনেছ দাও, আমায় চাখতে দাও! আমারি ভাইয়ের বাড়ীতে না নেমন্তন্ন? আমি আজ সেখানে থাকলে তোমায় দিতাম না নেমন্তন্ন খেতে? তোমায় দিতাম না এঁটো ভাত তরকারি? তুমি আমায় দেবে না? পড়শীর ঘরের বউ মাথা নিচু করিয়া ভাবিল—নীলা মাষ্টারনীর ধোপানী হ'তে এখনও বাকি আছে?

সেদিন এমনি গেল। ভাইয়ের নেমন্তন্ন বাড়ীর কথা ভাবিয়া ভাবিয়া নীলা মাষ্টারনী তার পরের দিন ঘাটে গেল না। ভাইবউয়ের বিবাহের চেলী পড়শীর ঘরের বউ কাচিতে আনিয়াছিল। নীলা মাষ্টারনী কাকুতি মিনতি করিয়া তাহাকে বলিল—আমি কেচে দেব লো, আমি কেচে দেব। আমার ভাই বউয়ের চেলী আমায় দাও, আমি কেচে আনব। তাহাই হইল। নীলা মাষ্টারনী চেলী কাচিয়া আনিয়া আর পড়শীর বাড়ীতে ফিরাইয়া দিল না। ও গাঁ হইতে তাগাদা আসিল। চেলী ফেরত আসিলে বাকী আর সকল মঙ্গলানুষ্ঠান হইবে; কিন্তু ফেরত দেয় কে? চেলী তো নীলা মাষ্টারনীর হাতে। শুনা গেল নীলা মাষ্টারনী বলিতেছে, ভাই না আসিলে চেলী ফেরত দিবে না।

ভাই আসিবে? ভাই আসিবে ধোপার বাড়ীতে দিদি বলিয়া ডাকিতে? এ তো অসম্ভব কথা! তিনখানি গাঁয়ে—যে গাঁয়ে নীলা মাষ্টারনীর জন্ম হইয়াছিল, যে গাঁয়ে সে 'মাষ্টারনী' হইয়াছিল, আর শেষে যে গাঁয়ে ধোপানী হইয়া সে দুই গাঁয়ের ময়লা কাপড় সাফ করিতে লাগিল—সবখানে একটা হইচই উঠিল। এদিকে ভাই তার ঘরে বসিয়া ভাবিল—যে একদিন ছিল তার দিদি, তার কাছে যাইবে কী না। এক প্রহর রাত হইল। যাইবে কি না, যাইবে কি না ভাবিতে ভাবিতে ভাই কখন আসিয়া দিদির কাছে হাজির হইয়া গেছে তাহার হুঁশ নাই। ডাকিল—দিদি! অমনি চার পাট করা চেলীখানি হাতে করিয়া আলুলায়িতকেশা বিব্রতবদনা অশ্রুমুখী নীলা মাষ্টারনী আসিয়া অন্ধকারে ভাইকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—আমি চ'লে এসেছি ব'লে তুই চ'লে এলি? লোকে বলবে কী? তুইও কি কুলে কলঙ্ক দিবি? ফিরে যা, ফিরে যা!

ভাই তার আনন্দমুখরিত কুটীরে ফিরিয়া গেল, আলোতে দেখিল—এ কার চোখের জল তাহার হাতে লাগিয়াছে, কার স্নেহের স্পর্শ তাকে বিচলিত করিয়া দিতেছে, কার অনুতাপবাণী তার অন্তরকে মথিত করিতেছে ?

চেলী হাতে তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া সবাই অবাক।

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী (1901—)

কালিন্দীচরণের জন্ম পুরী জেলার বিশ্বনাথপুরে। সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি তাঁর দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন। তাঁর উপন্যাস "মাটির মণিষ" অকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত হ'য়েছে। বইটি ভারতের নানা ভাষায় অনূদিতও হ'য়েছে। নিচের গল্পটি ওড়িয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প বলে আদৃত হ'য়ে থাকে। বর্তমানে ইনি সাহিত্য অকাদেমীর ফেলো। নানা সর্বভারতীয় ও ওড়িয়া সাহিত্য সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত। কবিতা, উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধের নানা গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তাঁর রচিত "ভক্তকবি মধুসূদন" ওড়িয়া সাহিত্যের জীবনী-সাহিত্যের অভাব পূরণ করেছে।

মাংসের বিলাপ

জলি ও ডোরা আবাল্য সঙ্গী। ক্ষণেক একে অপরকে ছাড়িয়া থাকিতে সহজে রাজি হয় না। জলির একবার অসুখ করিল, ডোরা তার কাছে অহর্নিশ জাগিয়া বসিয়া রহিল, সকলের যত তাড়না সব তার কাছে ব্যর্থ। অবশেষে সেইখানেই তার পানাহার আনিয়া দিবার হুকুম হইল। ডোরার পা একবার জখম হইল। জলি ইহাই জানে যে ডোরার গায়ে অসীম শক্তি, সে বুঝিতে পারিল না কেন ডোরাকে এতদিন ধরিয়া এক স্থানে বন্দীর মত থাকিতে হইতেছে। তার পায়ে মুখ-স্পর্শ করিয়া কোথায় তার ব্যথা তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিল।

ডোরা ইংলিশ গ্রে হাউণ্ড, জলি ওড়িশার জঙ্গলের কৃষ্ণসার হরিণ। ডোরা আসিয়াছে বিখ্যাত লণ্ডন নগরী হইতে, জলির জন্মস্থান ওড়িশার নিভৃত অরণ্যানী; ডোরা পুরাপুরি মাংসাশী, জলি নিছক শাকাহারী। কিন্তু খুব ছোটবেলা হইতে দুই জনের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিয়া গিয়াছিল।

ডোরার অসুস্থতা নিরাময়ের প্রয়াসে জলি তার সর্বাঙ্গ লেহন করিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অবশেষে ডোরা কতক সুস্থ হইয়া আস্তে আস্তে চলিতে শুরু করিল। তারপর যখন আবার বসন্তকাল আসিল, ফুলের গন্ধ ছুটিল, দুই বন্ধু দক্ষিণা বাতাসে ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করিয়া খেলায় মাতিল—যেন এই আনন্দের স্রোত যে দিক হইতে আসিতেছে সেই রহস্যময় দেশটাকে দু'জনে মিলিয়া এক মুহূর্তে আবিষ্কার করিয়া ফেলিতে চায়। দুইজনের দৌড়িবার ভঙ্গীতে বিশেষ পার্থক্য ও সৌন্দর্যকলা নিহিত আছে। ডোরা যখন দৌড়ায় মনে হয় যেন একটি দীর্ঘ প্রলম্বিত

ক্ষীণসূত্র ক্রমাগত মাটিতে মিশিয়া যাইতেছে। তখন তার চোখ কান পা মুখ ইত্যাদি চিনিবার উপায় নাই। কিন্তু জলির দৌড়িবার ভঙ্গিমা আলাদা। তাহা যেন ফরাসী নৃত্য। পা যেন তার মাটি ছুঁইতেছে না, কেবল শূন্যে হাঁটিয়া চলিতেছে।

জন্তু দুইটি জমিদার বাবুর বড়ই প্রিয়। ডোরা তো বিলাতের আমদানী, তাই তাহার ইংরেজী নাম রাখা হইয়াছিল। জলি তাহার বড় প্রিয় দেখিয়া তাহাকেও সেই ভাষায় অন্য একটি নাম দেওয়া হইয়াছিল। কর্মক্লান্ত দিবসের শেষে জমিদার-বাবু যখন কাছারির সন্মুখে প্রকাণ্ড মাঠে সায়ংভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাহির হন, তখন এই দুইটি পশু তাঁর সহচর হয়। তাঁর সামনে ক্রীড়াকৌতুক করিয়া তাঁর ক্লান্তি হরণ করিয়া যে আনন্দ তারা সঞ্চার করে তার মূল্য সামান্য নহে। নচেৎ শিকারের সময় ডোরার না হয় কিছু আবশ্যকতা আছে, জলি তো সম্পূর্ণ অনাবশ্যক; তথাপি জমিদারবাবুর কর্মপ্রবাহের মধ্যে জলির একটু স্থান আছে। সেই আনন্দটুকুর কারণ সে নিজে।

জমিদারবাবু বেড়াইতে বাহির হইলে জলি তাঁহার পায়ের কাছ ঘেঁষিয়া চলিতে থাকে। ডোরা কখনও পিছনে পড়িয়া গেলে ছুটিয়া আসিয়া তাঁর সামনে নমস্কারের ভঙ্গীতে বসিয়া পড়িয়া লেজ নাড়িতে থাকে। কখনও তাঁর দুই পায়ের মাঝখানে ঢুকিয়া তাঁর গতিবেগ শিথিল করিয়া দেয়। অন্য কোনও কুকুর আসিয়া জলির উপরে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে জলি ত্রস্ত হইয়া বাবুর দুই পায়ের মধ্যে ঠেলিয়া ঠুলিয়া ঢুকিয়া পড়ে। ডোরা জানিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া দর্শন দেওয়া মাত্র তার স্বজাতিগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া বিনীতভাবে অপসৃত হয়। কারণ ডোরার বলবীর্য তার পড়শীদের অজানা ছিল না। তবে ডোরার পদমর্যাদা জ্ঞানও সাধারণ কুকুরের চাইতে অনেক বেশী। কেহ পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে আর তার অনুসরণ করিয়া সে নিজের হীনতা প্রদর্শন করে না।

জমিদারবাবুর শিক্ষা রায়পুরেই সম্পন্ন হইয়াছে। বেশ আধুনিক ধরনের মানুষ, মিষ্টালাপ শিষ্টাচার প্রভৃতি গুণের অভাব নাই। দেশী লোকেদের কাছে চাদর পাঞ্জাবি গায়ে খাঁটি দেশী ও বিলাতীদিগের কাছে পুরাদস্তুর সাহেব। অবসরকালে বড় বড় সাহেব-সুবো শিকারের উদ্দেশ্যে আসিয়া জমিদার-ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁদের জন্য বেশ আয়োজনের সহিত অতিথিশালাও নির্মাণ করা হইয়াছে। কেবল জলি ও ডোরা তাঁর পোষা নয়, আরো কত জাতের পাখী, বানর, ভাল্লুক মাছ প্রভৃতি কত জীব জমিদারবাবুর অন্নে প্রতিপালিত হয়। একটি ছোটখাট চিড়িয়াখানাই বলা যায়।

তবে জলি ও ডোরা তাঁর পার্শ্বচর। বিশেষতঃ তাঁর অতি আদরের একমাত্র কন্যাটি জলি ও ডোরার অন্যতম সাথী। তার অধিকাংশ সময় সে এই দুইটিকে লইয়াই থাকে। বাগানে ধাইয়ের তত্ত্বাবধানে সে যখন কচি ঘাস ছেঁড়ে, জলি জানিতে পারিয়া তার মুখের কাছে নিজের মুখটি নিয়া রাখে। ডোরা দৌড়িয়া আসিয়া তার এই ক্ষুদ্র মনিবটির কাছে কত আদর ও কৌতুকের অভিনয় করে।

ছোট্ট মনিব 'তুমি খাও, তুমি খাও' বলিয়া তার মুখে ঘাস গুঁজিয়া দেন। সে অমান্য না করিয়া তা মুখে নিয়া আপন বাধ্যতা জ্ঞাপন করে। বারান্দার আরাম-কেদারায় বসিয়া এ সকল নিরীক্ষণ করিয়া বাবুর চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

জমিদারবাবু সাহেবদের সহিত যতই মেলামেশা করুন, দেশী লোকেদের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা অথবা ঘৃণা ছিল তা বলা যায় না। দেশের কোন পদস্থ ব্যক্তি তাঁর দ্বারস্থ হইলে আদর অভ্যর্থনায় কোনও ত্রুটি হইত না। প্রজাদের মধ্যেও শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখানো হইত; তবু লোকমত তাঁর রীতি-নীতির অনুকূল ছিল না। বৃদ্ধরা তাঁকে ভ্রষ্ট বিধর্মাচারী বলিত। আর কেহ কেহ অমিতব্যয়ী প্রজাপীড়ক বলিত। দেশের চক্ষে তাঁর প্রধান দোষ তিনি বিদেশীদের সহিত মেলামেশা করেন ও তাদের আচার গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার আহার ও পরিচ্ছদে বিজাতীয় ভাব বহু পরিমাণে দেখা যাইত। সেসবে যতটা সংযম আবশ্যক তিনি তাহা সম্পূর্ণ অবহেলা করিতেন।

এবার শীতের ছুটিতে পুলিশের ডি-আই-জি সাহেব শিকারের উদ্দেশ্যে জমিদার-ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন বলিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁর সহিত তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা আসিবেন। ডি-আই-জি সাহেবের সহিত জমিদারবাবুর খাতির বহুদিনের। এবার আবার সঙ্গে স্ত্রী ও কন্যা আসিতেছেন। চারদিন আগে হইতে অতিথিশালা পরিষ্কার করিয়া সাজানো হইতেছে এবং জঙ্গলের মধ্যে যেখানে হরিণ ও পক্ষী প্রভৃতি শিকার করিবার কথা সেখানে তাঁবু ইত্যাদির আয়োজন চলিয়াছে। আবশ্যক জিনিষপত্র খরিদের জন্য কটকে লোক পাঠানো হইয়াছে। চাকর-বাকর, বেগার খাটার লোক, আমলা প্রভৃতি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। অন্যান্যবারের মতই এবারেও কাহারও মরিবার সময় নাই। অন্যান্য বারের মত এবারেও জমিদারবাবুর অসাক্ষাতে গালিবর্ষণ চলিতেছে।

সাহেবের আসিবার সময়ে তাঁহাকে আগ বাড়াইয়া লইয়া আসার জন্য জমিদারবাবু মোটরগাড়ীতে কিছুদূর গেলেন। নির্দিষ্ট সময়ে সাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদিগের সহিত যোগ দিয়া হাসি গল্পে জমিদারবাবুর মনঃপ্রাণ আপ্লুত হইয়া উঠিল। জমিদার-ভবনে মহা চাঞ্চল্য। কাহারও এক দণ্ড স্থির হইয়া দাঁড়াইবার সময় নাই। সবাই দৌড়-ঝাঁপ করিতেছে। অতিথিদের সঙ্গে এই স্থির হইল যে আজ অতিথিশালায় থাকিয়া পরদিন প্রাতঃরাশের পর শিকারে বাহির হওয়া যাইবে।

জমিদার-ভবন হইতে বার-চৌদ্দ মাইল দূরে মৃগয়াস্থল, ঘোর জঙ্গলের মধ্যে। কাছে লোক-বসতি নাই। চাকর খানসামা বেগারের লোক প্রভৃতি আগে হইতে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম লইয়া চলিল। জলির যাওয়া অনাবশ্যক হইলেও ডোরা তাকে ছাড়িয়া থাকিবে না। যেখানেই লইয়া যাওয়া হোক, সুযোগ পাইলেই আসিয়া তার নিকটে হাজির হইবে। সুতরাং জলিকেও সঙ্গে লইতে হইল। সেজন্য অবশ্য ছোট্ট ঠাকরুনটির অনুমতি লইতে হইয়াছে। তাঁর হুকুম এই : দুই দিনের অধিককাল যেন ডোরা ও জলিকে আটকাইয়া রাখা না হয়।

কিন্তু 'মেরি ক্রিস্টমাস্'-এর আনন্দ উৎসাহে জঙ্গলে থাকার আজ পাঁচ দিন হইয়া গেল। সেই জঙ্গলেও সাহেবের মনের মত সব জিনিষ এমন ভাবে যোগানো হইতেছে যে তাঁর অসুবিধা হওয়া দূরে থাক, নগরের কোলাহল ক্লান্ত জীবনে এই নির্জন বনবাসে তাঁদের বড় আনন্দ হইতেছে। সুতরাং দুই দিনের জন্য আসিয়া আজ পাঁচ দিন হইয়া গেল সাহেবের ফিরিবার কোন গরজ নাই। আজ কিন্তু রসদপত্র সব নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। কাল প্রাতে ফিরিবার কথা।

মধ্যাহ্ন-ভোজন সারিয়া সাহেবের সঙ্গে জমিদারবাবু শিকারে বাহির হইলেন। গত চারদিন সাহেবের স্ত্রী ও কন্যারা ক্রীড়া-কৌতুক নৃত্য-গীত আকণ্ঠ উপভোগ করিয়াছেন, আজ আর তাঁহারা শিকারের সহযাত্রী হইতে পারিলেন না। নিরীহ চাকর ও বেগারের লোকেরা একটি বেড়ালছানাও না মারিয়া কেবল শিকারে একটু সাহায্য করিতে করিতে হাঁপাইয়া পড়িয়াছে, তবু তাহাদের মধ্যে দুই তিন জনকে যাইতে হইল। পাখি মারিতে গিয়া দুই তিনবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার পরে মারা অসম্ভব হইয়া পড়িল। পাখিদের আবার আসিয়া বসিবার অবসর দিবার জন্য এবং সে সময়টা হরিণ ইত্যাদি অনুসন্ধান করিবার জন্য শিকারীদ্বয় নিকটবর্তী জঙ্গলের ভিতরে ঢুকিলেন। অনেক ঘোরাঘুরি করিয়াও কোথাও কোন শিকারের সন্ধান পাইলেন না। চাকর তিনটাকে হরিণ দেখিতে জঙ্গলে পাঠানো হইল। তাহারা কোথাও বসিয়া বড় বড় বিড়ি টানিল কি দোক্তা পাতা ডলিয়া খোশ গল্প করিল তা দেখিবার তো উপায় নাই। শিকারী দুইজন নিঃশব্দে এ জঙ্গল ও জঙ্গল শিকার খুঁজিয়া বেড়াইলেন, তাঁবু হইতে তিন চার মাইল দূরে গিয়া পড়িয়াছেন, তাহা কাহারও খেয়াল নাই।

তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। নিকটবর্তী পাহাড়ের পিছনে সূর্য আড়াল পড়িয়াছে, কিন্তু তার রক্তিম আভা পশ্চিম আকাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শিকারীদ্বয় কেবল জীবদেহের রক্তের শোণিমা দেখিবার অভিলাষী, এদিকে নজর নাই। ওদিকে কিন্তু পূর্বদিক মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। ইঁহাদের দৃষ্টি পৃথিবীর উপরে, আকাশের সঙ্গে সম্পর্ক কী? চাকর তিনজন দুর্যোগের আভাস দেখিয়া খোশ গল্প ছাড়িয়া শিকারীদের অন্বেষণে বাহির হইল। গভীর জঙ্গলে দিনের বেলাতেও তাঁহাদের খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। অন্ধকারে শিকারীদ্বয় একেবারেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিলেন।

আসন্ন বৃষ্টির ঠাণ্ডা হাওয়া যখন গায়ে লাগিল, শিকারী দুইজন চাহিয়া দেখিলেন অকস্মাৎ বৃষ্টির আয়োজন। তাঁবু হইতে তিন চার মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং বৃষ্টির আগে সেখানে ফেরা অসম্ভব। অগত্যা বন্দুক কাঁধে দুই বন্ধু সামরিক কায়দায় ডবল মার্চ শুরু করিয়া দিলেন। গুলির সম্মুখে মৃগকুলের ত্রস্ত কাতর পলায়ন এবং শিকারীর আহ্লাদধ্বনি ও পশ্চাদ্ধাবন এ সময়ে তাঁদের অনুভূত হইল না, কিন্তু ঠিক সেই প্রকার হু হু আনন্দধ্বনি করিয়া মেঘবৃষ্টি তাঁদের আক্রমণ করিল। নিকটে কোথাও আশ্রয় নাই। চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঘূর্ণিবায়ু সন্নিকট অরণ্যানীর

মধ্যে মহাক্রন্দনরোল সৃষ্টি করিল। অতিকষ্টে সন্তর্পণে দুইজনে পথ খুঁজিয়া দেখিয়া চলিলেন। পরিচ্ছদ ভিজিয়া চার মন ভারী হইয়াছে। ঊর্ধ্বশ্বাস হইয়া তাঁবুতে যখন পৌঁছিলেন তখন রাত্রি আটটা।

নৈশ ভোজনের কোনও বন্দোবস্ত নাই, তাহাই এখন বিশেষ ভাবনার কথা হইয়া পড়িল। শিকার তো কিছুই হইল না। উপরন্তু কাল সকালে এখান হইতে ফিরিবার কথা থাকায় এবং শিকার মেলা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ না থাকায় নৈশ-ভোজনের অন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। এখন আর উপায় নাই। জমিদার বাড়ী এখান হইতে বার চৌদ্দ মাইল দূর। আর এই বৃষ্টি মাথায় করিয়া গিয়া রাত্রির অন্ধকারে সেখান হইতে খাদ্যদ্রব্য আনাও কি সম্ভব! মোটরের পথ তো বর্ষার জলে অগম্য হইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। নিকটে কোনও লোকালয় নাই যেখানে সাহেব ও জমিদারবাবুর আহারোপযোগী কিছুমাত্রও পাওয়া যাইতে পারে, মাংস না হইলে যে অনাহার। তায় আবার আজ এত ধকল গিয়াছে। সকলে চিন্তায় পড়িয়া গেলেন। জমিদারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলেও সাহেবেরও ভাবনা হইল। কারণ শিকারে বাহির হইবার সময়ে জমিদারবাবু লোক পাঠাইয়া মাংসের ব্যবস্থা করিতে যাইতেছিলেন, সাহেব কিন্তু নিশ্চয় শিকার মিলিবে বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। এখন কী করা যায়? জমিদারবাবু অযথা বেগার খাটার লোকগুলির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

সাহেব একটু মুচকি হাসি হাসিয়া বলিলেন—Hell, let me devise some means for the dinner.

জমিদারবাবু সেই হাসির উত্তর হাসিতে প্রদান করিয়া বলিলেন—Well !

সাহেব বলিলেন—Do you mind sparing your heart ? It would make a sumptuous feast and you can have a lot of them from the jungles later on. How do you like the idea ? (আপনার হরিণীটি দিতে কোন আপত্তি আছে কি? ইহাতে উত্তম ভোজ হইবে। পরে জঙ্গল হইতে আপনি এমনি অনেক পাইবেন। কেমন, কী মনে করেন?)

জমিদারবাবু কী যেন ভাবিতেছিলেন। সাহেবের বাক্য শেষ হইল দেখিয়া হঠাৎ চমকিয়া উত্তর দিলেন—Oh yes, it's a fine idea (হাঁ হাঁ, খুব ভাল কথা)। জমিদারবাবু সম্ভ্রান্ত বন্ধু ও অতিথির কথায় অমত করিতে পারিলেন না, কিন্তু জলির কথায় তাঁর বুকটা কেন জানি ধক্ করিয়া উঠিল। জলির প্রতি তাঁর একটু বিশেষ মমতা জন্মিবার কারণ আছে। একদিন অন্য এক বিদেশীয় বন্ধুর সমক্ষে আপন শিকার কৌশলের বাহাদুরি দেখাইতে গিয়া তিনি জলিকে পাইয়াছিলেন। তখন তার মা তাহাকে স্তন্য পান করাইতেছিল। জমিদারবাবুর গুলি খাইয়া মা'টি ধরাশায়ী হইল, কিন্তু নির্বোধ শিশু নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিল। জমিদারবাবুর লোক যখন তাহাকে ধরিতে গেল, মা নিকটে আছে বলিয়া সে নিঃশঙ্কভাবে দণ্ডায়মান রহিল। বিদেশীয় বন্ধুর নিকট এই শিকার কৌশলের জন্য বহু বাহবা পাইলেও

এই ক্ষুদ্র হরিণ শিশুর নির্বোধ চক্ষু দুটির পানে চাহিয়া সেই দিন হইতেই তার মাতৃহন্তা জমিদারবাবুর তার প্রতি কেমন একটা বাৎসল্য ও স্নেহ জন্মিয়া গিয়াছিল।

সেই জলিকে হত্যা করিয়া একদিন তার মাংস ভক্ষণ করিতে হইবে একথা তিনি কখনও কল্পনা করেন নাই। এখন এই পরামর্শ শুনিয়া জমিদারবাবুর শিকারী অন্তরও যেন কেমন একটু দমিয়া গেল। তাই বলিয়া এত বড় সম্ভ্রান্ত অতিথির কথা কি ঠেলিয়া দেওয়া যায়? জমিদারবাবুর সম্মতি পাইয়া সাহেব মহানন্দে নিজেই ছুরি হাতে করিয়া প্রস্তুত হইলেন। নিজ হাতে অন্ততঃ কিছু শিকার না করিলে তাঁর মনটা ভাল থাকে না। যুদ্ধে বহু লোকের প্রাণ বধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁর বড় সুখ্যাতি আছে। শোনা যায় কোনদিন শিকার না মিলিলে সেই উদ্দেশ্যে পালিত কুক্কুট প্রভৃতি একটা কিছু জীব বধ করিলে তবে তাঁর মাথা ঠাণ্ডা থাকে। তাঁর এই অভ্যাসের তারিফ করিয়া তাঁর স্ত্রী নাকি বলিয়া থাকেন যে একদিন কিছু শিকার করিতে না পাইয়া সাহেব আপন গলা কাটিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

জলি ও ডোরা একে অন্যের কোলে মাথা গুঁজিয়া অতিশয় আরামে নিদ্রা যাইতেছে। সে সময় অপরিচিত কোন লোকের ডোরার কাছে যাইতে সাহস করা বড় কঠিন। বিশেষতঃ ডোরা ও জলি একসঙ্গে থাকিলে জমিদারবাবুর মাধিআ চাকর ব্যতীত আর কারও তাহাদের কাছে আসার উপায় নাই। জমিদারবাবুর ইঙ্গিতে মাধিআকে জলিকে আনিতে যাইতে হইল। তার পায়ের শব্দ শুনিয়া ডোরা জাগিয়া উঠিয়া ডাকিয়া উঠিল। মাধিআ 'চুপ্' বলায় তার গলা পাইয়া সে স্থির হইয়া রহিল; কিন্তু মাধিআ যখন জলিকে ঘুম হইতে তুলিয়া তাকে লইয়া যাইতে চাহিল তখন ডোরা তার সঙ্গে আসিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। অগত্যা মাধিআকে জলির সঙ্গে সঙ্গে ডোরার শিকল ধরিয়া আনিতে হইল। ডোরার বুদ্ধি অতি প্রখর হইলেও এ সময়ে জলিকে তার কাছ হইতে লইয়া যাওয়ার কারণ সে প্রথমে বুঝিতে পারিল না। মাধিআ নিজে ডোরাকে ধরিয়া জলিকে খানসামাদের কাছে দিল। ডোরার বড় সন্দেহ হইল, তবু সে চুপ করিয়া রহিল। সাহেব নিজের আততায়ী প্রকৃতি চরিতার্থ করিতে উদ্যত হইলেন। ছুরির ফলা আলোতে চক চক করিয়া উঠিল।

খানসামা দু'জন জলির পা বাঁধিয়া তাকে স্থিরভাবে দাঁড় করাইয়া রাখিল, যেন ছুরি চালাইবার সময়ে সে কোনও রকমে নড়াচড়া করিয়া সাহেবের অসুবিধা না ঘটায়। জলির ভাবনা কী? সে তার জীবনের প্রভু জমিদারবাবু এবং সকল দুঃখ বিপদে আবাল্য সহচর পরম বন্ধু ডোরাকে দেখিয়া নিঃশঙ্কভাবে দাঁড়াইয়া রহিল এবং পা দুইটি বাঁধা হওয়ায় একবার তার সুখদুঃখের সাথী ডোরা আর তার অশৈশব বিশ্বাসী প্রভুর দিকে চাহিয়া দেখিল। জমিদারবাবু বন্ধুর পত্নী ও কন্যাদের সঙ্গে খোশগল্পে নিমগ্ন; তবু তাঁর অন্তর হইতে কে বলিয়া দিতে ছিল জলির দিকে একবার চাহিয়া দেখিতে, তিনি চাহিয়াও যেন দেখিতে না পাইয়া হাসি গল্পে ব্যাপৃত রহিলেন। তার দিকে তাকাইলে যেন সে মানুষের ভাষায় কিছু বলিতে যাইবে এবং তাতে তিনি

দোষী সাব্যস্ত হইবেন এবং তাঁর সুনামে বিঘ্ন ঘটিবে। সাহেবের হাতে ছুরি দেখিয়া ডোরার সন্দেহ ক্রমে ঘনীভূত হইতেছে। সাহেব ছুরি পরিষ্কার করিয়া যখন চেয়ার হইতে উঠিলেন জমিদার বাবুর চোখ হঠাৎ কেন জানি জলির উপর পড়িল এবং তাঁর মনে হইল জলি অনেকক্ষণ হইল তাঁর দিকে এমনি কাতর দৃষ্টি মেলিয়া নীরবে জীবন ভিক্ষা করিতেছে। জমিদার কী একটা বাহানায় আসন ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁবুর ভিতরে চলিয়া গেলেন। ডোরা কিন্তু জলির মিনতি শুনিল। আবাল্য আশ্রয়দাতা প্রভুর দিক হইতে হতাশ দৃষ্টি ফিরাইয়া জলি যখন তার প্রিয় সহচর ডোরার দিকে চাহিল, ডোরার প্রাণে তাহা বাজিল। সাহেবের হাতে নিষ্ঠুর ছুরি দেখিয়া ডোরার আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিলনা। এইখানে কত ছাগল হরিণ কাটা হইতে সে দেখিয়াছে। তার প্রাণপ্রিয় জলির দশা তাহাই হইবে ইহাতে তার আর সন্দেহ নাই।

সাহেব যখন ছুরি হাতে করিয়া নামিয়া আসিলেন তৎক্ষণাৎ ডোরা এক ঝটকায় মাঝিআর হাত হইতে মুক্ত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে জলিকে ধরিয়া থাকা একজন খানাসামাকে আঘাত করিল। সাহেব চাকর খানসামা সকলে ইতস্তত: দ্রুতবেগে তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। জমিদারবাবু তাঁবুর মধ্যে অন্যমনস্ক ছিলেন। সাহেবের এ দুর্দশা দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং মাঝিআর উপরে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তবু অন্তরের কী এক অব্যক্ত ব্যথা তাঁর কথায় স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল।

মাঝিআ অতি কষ্টে নিজে ডোরার কাছ হইতে আঘাত পাইয়াও তাকে লইয়া গিয়া একটা গাছে ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিল। সাহেব ছুরি হাতে হাসিতে হাসিতে আবার তাঁবুর ভিতর হইতে বার হইলেন। কৌতুকচ্ছলে গাছে বাঁধা ডোরাকে ছুরিটি দেখাইয়া জলির দিকে আগাইলেন। জমিদারবাবু দেখিলেন জলি আগের মত কাতর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাহিয়া সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে। তিনি হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া সাহেব বন্ধুকে কী একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, 'ওঃ, আমি কি পাগল!' বলিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন। সেখান হইতে উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা হইলেও সাহেব কিছু মনে করিতে পারেন এই আশঙ্কায় তাহা হইতে ক্ষান্ত রহিলেন। সাহেব জলির কাছে যাইতেছেন দেখিয়া জমিদারবাবু রুমাল বার করিয়া মুখ ঢাকিলেন। জলির ভীত ব্যাকুল ক্রন্দন তাঁর কানে যাইতেছিল। তার মধ্যে শুনিতে পাইলেন এক রুদ্ধ কণ্ঠের বিলাপ। তাহা কেবল কানে নয়, তাঁহার মর্মে প্রবেশ করিল। সে স্বর জলির। রুমাল সরাইয়া চাহিয়া দেখিলেন—শেষ।

খাবারের টেবিলে বসিয়া জলির মাংস ভক্ষণ করিতে গিয়া জমিদারবাবুর অন্তরাত্মা না না করিয়া উঠিল। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া বন্ধুদিগের সহিত যোগ দিলেন। বড় কষ্টে যৎসামান্য আহার করিলেন। ভিতরের কী এক অব্যক্ত ব্যথায় প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। রক্ষা এই যে অতিথিদের মধ্যে কেহ তাহা লক্ষ করিতে পারিলেন না। শুইতে যাইবার সময় মাঝিআ আসিয়া খবর দিল ডোরাকে মাংস ইত্যাদি যাহা দেওয়া হইয়াছিল সে তাহা স্পর্শ করে নাই।

জমিদারবাবু অন্যমনস্ক হইয়া শয়নকক্ষে গেলেন। ঘুম আসিতেছিল না। বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া কত কী ভাবিতে লাগিলেন। এ জঙ্গল ও জঙ্গল ঘুরিতেছেন, হঠাৎ মেঘ বৃষ্টির আক্রমণ, চতুর্দিক অন্ধকার—আবার সেই কবেকার এক দুপুর বেলা, গুলি খাইয়া মা তার ভূতলশায়ী হইল, আর নির্বোধ শিশু অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল, একটুও নড়াচড়া নাই, স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিল। আবার সেই ঘন অন্ধকার—দুই বন্ধু বন্দুক কাঁধে তাঁবু অভিমুখে—ছুরি হাতে সাহেবের নৃশংস হাসি, আর সেই হরিণ শিশুটির করুণ দৃষ্টিতে জীবন ভিক্ষা ও মানুষের ভাষায় বাক্য উচ্চারণ—'আমি না আমার মাকে ছাড়িয়া তোমার আশ্রয় লইয়াছিলাম?' জমিদারবাবু চমকিয়া উঠিয়া ভাবিলেন, এ স্বপ্ন। আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন ; আবার সেই মিনতিভরা চাহনি, আবার সেই মর্মন্তুদ বিলাপ। একবার করিয়া ঘুম ভাঙিয়া যায়, কেবল সেই এক স্বপ্ন।

ভোরে উঠিয়া ফিরিবার পালা। মোটরে বন্ধু ও বন্ধুর পরিবারের সহিত জমিদারবাবু আগে চলিয়া গেলেন। হাসি-গল্পে নিজের মন ভুলাইবার যত চেষ্টা করিলেন, অন্তরে কেবল হরিণ-শিশুর সেই রুদ্ধ ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন। বন্ধু সেইদিন সপরিবারে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

মাধিআ ডোরাকে শিকল ধরিয়া টানিতে টানিতে বহু কষ্টে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আনিল, বাবুকে বলিল ডোরা আসিতে একেবারে রাজি হইতেছিল না। জমিদারবাবু তখন একলা বসিয়া আপনমনে কী যেন ভাবিতেছিলেন। মাধিআ আর বেশী কিছু না বলিয়া নীরবে চলিয়া গেল। সে সময়ে জমিদারবাবুর প্রবল আত্মগ্লানি উপস্থিত। বড় কষ্টে তিনি নিজেকে স্থির রাখিয়াছেন। তাহা না হইলে লোকে তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া বসিবে। তাঁহার প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন বার বার বলিতেছে এই জ্ঞানহীন কুকুরটার পদতলে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতে। কারণ তিনি নিজেকে তার তুলনায় অনেক নিম্নে দেখিতেছেন। 'এই মাংসাশী কুকুরটার চাহিতেও কি আমার অন্তর এত নির্দয়! ছিঃ ছিঃ, সংসারে কি কেবল সবল দুর্বলকে আপন অধীনস্থ করিয়া আত্মসাৎ করিয়া উদরসাৎ করিয়া জীবন ধারণ করিবার জন্য জন্মিয়াছে? একজনকে বাঁচিতে হইবে বলিয়া আর একজনের মৃত্যু একান্ত আবশ্যক! মানুষ যে বিশ্বগ্রাস করিতে বসিয়াছে ইহার সপক্ষে যুক্তি কী, না সে সকল জীবের অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও বিবেকবান!' বাস্তবিক জমিদারবাবুর যার পর নাই বিরাগ ও বিকার জন্মিল। যে জিহ্বা জলির মাংসের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা কেমন অবশ হইয়া আসিল, জলির কলিজা যে গলা দিয়া নামিয়াছিল তা সঙ্কুচিত হইয়া কেমন রুদ্ধ হইয়া আসিল,। জমিদারবাবুর মনে হইল, সে গলা যদি চিরদিনের মত রুদ্ধ হইয়া যায় এবং সে জিহ্বা যদি অবশ হইয়া খসিয়া পড়ে তাহা হইলে তাঁর মর্মন্তুদ যন্ত্রণার বুঝি কিছু উপশম হয়।

এই সময় পিছন হইতে কে বলিল—জলি কই? জমিদারবাবু ফিরিয়া দেখিলেন তাঁর সেই চার বছরের শিশু কন্যাটি! তিনি কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া উঠিয়া

গিয়া কন্যাকে আপন উত্তপ্ত বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন—আছে মা, আছে। সে কথায় সে কর্ণপাত না করিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া ছল ছল চোখে বলিল—মিথ্যে কথা, মাধিআ বলল ঐ সাহেব তাকে মেরেছে, আমিও সাহেবকে মারব। কন্যার রাগ ও অভিমান দেখিয়া জমিদারবাবুর চোখ হইতে জল পড়িতে লাগিল। তিনি তাহা কন্যার কাছ হইতে লুকাইবার জন্য কন্যাকে ধাইয়ের হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন ও হৃদয়াবেগ অসহ্য হওয়ায় বিছানায় পড়িয়া শিশুর মত চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু কন্যার সেই প্রশ্ন 'জলি কই?' বার বার তাঁর মনে পড়িতে লাগিল। তিনি নিজেকে সেই প্রশ্ন করিয়া আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে চাহিলেন। হরিণ শাবকের প্রতিটি ভুক্ত মাংসখণ্ডের ক্রন্দন তাঁর প্রতি রোমকূপ হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে তিনি শুনিতে পাইলেন। তাঁর প্রত্যেক শিরায় সে ক্রন্দন বিদ্যুৎ চমকের মত প্রকাশ পাইতে লাগিল। জমিদারবাবু পীড়িত হইয়া পড়িলেন—তারপর দুই সপ্তাহ ধরিয়া জ্বর ও অনাহার। সকলে ভাবিল জমিদারবাবুর এ ফাঁড়া বুঝি আর কাটে না। কিন্তু তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন—নূতন মানুষ হইয়া। সাহেবের উপযোগী অতিথিশালা দরিদ্রের পান্থশালায় পরিণত হইল। জমিদার ভবনে আমিষের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল এবং জমিদারির মধ্যে কেহ হরিণ শিকার অথবা বধ করিতে পারিবে না বলিয়া হুকুম জারী হইয়া গেল।

ডোরা কিছুতেই কিছু খাইল না। সারাদিন অনাহারে থাকিয়া জমিদারবাবুর প্রথম অসুস্থতার দিন কোনওক্রমে ছাড়া পাইয়া কোথায় চলিয়া গেল। মাধিআ খুঁজিতে খুঁজিতে তাকে সেই তাঁবু ফেলার জায়গায় জলির বধ্যভূমি আঘ্রাণ করিতে দেখিতে পাইল। এইখানে সে তার প্রিয় সখাকে হারাইয়াছে—কোনও মতে যদি তার সন্ধান মিলে। সেইজন্য করুণ করিয়া সে তাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। মাধিআ তাহাকে ধরিয়া আনিল। কিন্তু তাহাকে ধরিয়া রাখিবার সকল চেষ্টা বিফল হইল। আবার একদিন সে কেমন করিয়া অদৃশ্য হইল। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও আর তাহাকে পাওয়া গেল না। কেহ কেহ বলে সে সেই তাঁবু ফেলার জায়গার দিকে গিয়াছে। কাঠুরিয়ারা বলে নিবিড় জঙ্গলে কাঠ কাটিবার সময় তাহারা অনেকবার রুদ্ধ পশুকণ্ঠের একটি আর্ত করুণ বিলাপ শুনিতে পায়, কিন্তু সে জলির না ডোরার?

সচ্চিদানন্দ রাউতরায় (1916—   )

সচ্চিদানন্দের জন্ম পুরী জেলার খোর্ধা মহকুমার গুরুজঙ্গ গ্রামে। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি অসহযোগ আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন ও সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর "রক্তশিখা" কাব্যগ্রন্থ 1939 সালে বৃটিশ সরকার নিষিদ্ধ করে বাজেয়াপ্ত করেন। তাঁর "বাজি রাউত" কাব্যগ্রন্থ ইংরেজীতে অনুদিত হ'য়েছে। তিনি সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কৃত কবি। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস: "মাটির তাজ", "মশাণির ফুল" ও "ছাই"।

অন্ধারুআ

গলায় হাঁড় বাঁধল। দাঁতে কুটো দিল। জিভ থাকতে বোবা হয়ে পহলি পধান বারো দুয়ার ঘুরে খাপরা পাতল।

কালো মিশমিশে আঁধারের ভিতর তার ষণ্ডা ষণ্ডা কালো কালো হাত দুটো তুলে গাঁয়ের মাথায় দোকানের কাছে ব'সে পহলি গোঁ গোঁ ক'রে সবাইকে মনের কথা বলার চেষ্টা করে, নানান বোবা ভঙ্গিমা করে দোকানের খদ্দেরদের কাছ থেকে একটা পয়সা বা আধলা চায়। কেউ দেয়, কেউ বা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। বেশীর ভাগই তার দিকে চেয়ে দু'পাটি দাঁত বার করে হিহি করে হাসে, ভেংচায়। পহলি মাটিতে লুটোয়। ঝুঁটি খোলা আলুথালু চুলে হাতের ইশারায় কত কি বলে। সবাই বলে—হুজ্জুতে লোকটা।

মিশ কালো গা, ময়লা কেলোকিষ্টি কাপড় আর এবড়োখেবড়ো চওড়া বুকটা কালো রাত্রির সঙ্গে মিশে যায়, মোটে ঠাহর হয়না। আঁধারের সঙ্গে একাকার হয়ে যায় 'অন্ধারুআ'।

দুরন্ত ছেলে মায়ের দুধ না খেলে মা ভয় দেখিয়ে বলে—ঐ, ঐ 'অন্ধারুআ' আসছে—গাঁয়ের মাথায় ব'সে জিভ সপর সপর করছে!

পহলি চলেছে। পথে সন্ধ্যা হলে কাছে পিঠের গাঁয়ে রাতটা থেকে যায়। সূর্য্যি ডোবার আগে যা হোক দুটো মুখে ফেলে দিয়ে কারও রোয়াকে বিচালি এক গোছা পেতে চার হাত পা মেলে গড়িয়ে পড়ে। সে যে গাঁয়ে যায় সেখানে 'অন্ধারুআ' এসেছে বলে চারদিকে চাউর হয়ে যায়। পিছনে হাততালি দিতে দিতে ছেলের দল

চলে, রাস্তার কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ ক'রে তেড়ে আসে, আবার ছোঁক ছোঁক করতে করতে তার দু পায়ের মধ্যে ঢুকে একপ্রস্ত তাকে শুঁকেও নেয়। 'অন্ধারুআ' সারাদিন পথ চলে, সাঁঝের বেলা ভিক্ষে মাগে।

আঁধার রাত। গর্ভবতী মেয়েমানুষের মত কালো মেঘের তলপেটটা ঝুলে পড়েছে। তার মধ্যে লাঠি নিয়ে অন্ধরুআ চলে চলন্ত আঁধারের মত…।

মাঝে মাঝে অন্ধারুআ স্বপ্ন দেখে…

পাকা ধানের ঢেউ খেলছে ক্ষেতে। বাড়ন্ত ধানগাছগুলোর অগুনতি সারির গোড়ায় গোড়ায় কেউটে কাঁকড়া-বিছে আর কেন্নুইয়ের মেলা বসেছে। আঁসটে গন্ধ পেয়ে চারদিকে গোদা চিল চক্কর দিয়ে দিয়ে উড়ছে উপরে।

সেই মেঘলা আঁধার রাতে মাঠের মাঝে মাচা বেঁধে নারকোলের দড়িতে আগুন জ্বেলে পহলি ক্ষেত পাহারা দিচ্ছে।

ধানগাছের গোড়ায় সব জমা করা রয়েছে গাদা গাদা সার। সার তো নয়, হাড়! পহলির হাড়, তার বউ গেলির মার হাড়……

পহলির মনে পড়ে হাত-পা কালানো ঠাণ্ডার দিনে আঁধার ভোরে উঠে জেলের বাড়ির চিড়ে কোটার আওয়াজ শোনা না যেতেই গেলির মা কেমন শীতে থুর থুর করতে করতে যত পাথুরে জমি, বন-বাদাড়, নাবাল-জলা ঘুরে ঝুড়ি ঝুড়ি গোবর বয়ে বয়ে এনে খিড়কির সারগাদায় জমা করে। আর পহলি গায়ের রক্ত জল ক'রে সেই সার ঝোড়া বোঝাই ক'রে ক'রে ক্ষেতে দিয়ে আসে।

আর শুধু কি তাই? মাঠে পাথরের মত শক্ত মাটিতে লাঙ্গলের ঈষ ধরে হাল দেওয়ার বেলা যে কী কষ্ট তা মনে পড়লে পহলির হাড়ের ভিতর কেমন করে ওঠে। মাথার উপরে আগুনের গোলার মত সূর্য, পায়ের তলায় তেতে ওঠা মাটি, পা দুটো ঝলসে ঝলসে পরতে পরতে চামড়া উঠে গেছে।

পহলির এমনি হাড়ভাঙ্গা রক্তমেশা মেহনত সার্থক করে যে দিন পাকা ক্ষেতের অগুনতি ধানগাছের ভিতর ঝিরঝিরে হাওয়ার লুকোচুরি খেলা লাগল, সেদিন পহলির জীবনে সে এক মচ্ছব। সব ভুলে সে চেয়ে রইল সেই পাকা ধানের কেয়ারির দিকে।

তারপর একদিন—

পহলি ভেবে চলে।

কিটকিটে আঁধার! অঘ্রাণ মাসের হিমেল হাওয়া কলজের ভিতরটা কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। পহলি মাচার উপর খেঁস একখানা গায়ে দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে বটুয়া থেকে চুনের পাত একখানি নিয়ে হাতের তেলোয় দলছে—কানে গেল ক্ষেতের মধ্যে চবর চবর শব্দ। জলকাদায় ধানগাছগুলো দ'লে মাড়িয়ে কী একটা চারদিকে সব তছনছ ক'রে দিয়ে যাচ্ছে যেন বা। পহলি ভাবলে, বরা, নয় তো ভালুক হবে বুঝি।

রাগে সে এই মোটা এক গাছ বাঁশ নিয়ে উঠল।

ধানগাছের কালো ছায়া চিরে জলের শিরাগুলো চিক চিক করছে। ঘন মেঘের

আঁধারের ভিতর পহলির ঠাহর হ'ল একটা মস্ত বড় কালো জানোয়ার। নাকে তার উনপঞ্চাশ পবন বইছে।

পহলি তার পেছনে তাড়া করল, কিন্তু সেই কালো ছায়াটা সমস্ত ধানগাছ মাড়িয়ে চটকে ছুটে বেড়াতে লাগল।

এক একটা ধানগাছ নষ্ট হয় আর পহলির গায়ের এক এক আঁজলা রক্ত শুকিয়ে যায়।

সামনে একটা খাল। জন্তুটা আর যেতে পারলে না—মুখ ঘুরিয়ে ফিরলে। পহলির বাঁশ দুম ক'রে গিয়ে পড়ল মাথায়। ঠিক তার মাথার মধ্যিখানে।

চিকুর ঝলার আলোয় পহলি দেখতে পেলে দু'গাছি ডালের মত উঁচু হয়ে ওঠা দুটো বড় বড় ধারালো শিং।

লেজ তুলে ফোঁস ফোঁস ক'রে নিশ্বাস ছেড়ে জন্তুটা পালাল একমুখে এলোপাতাড়ি হয়ে—পহলি শুনতে পেল খানিকটা গিয়ে সেটা একটা কাঁটা ঝোপে ধুপ ক'রে গিয়ে সেই যে পড়ল, কাদা পাঁকের মধ্যে থেকে আর উঠলই না।

পহলি মাচায় ফিরে এসে নিশ্চিন্তি হয়ে শুল। সে রাতে ঘুমোতে ঘুমোতে স্বপ্ন দেখল একটা মস্তবড় কালো কঙ্কাল, চারদিকে তার কাকের মেলা। একটা উপোসী শকুন সেই মড়ার নাইয়ের ভিতর ঠোঁট ঢুকিয়েছে। মড়ার চারটে খুরই কে কেটে ফেলে দিয়েছে এক এক চোটে।

পুরুত ঠাকুর পুঁথি উলটিয়ে বললেন—তিন পাদ দোষ লেগেছে। পুরুস্তম গিয়ে মুক্তিমণ্ডপে প্রায়শ্চিত্ত না করলে পাপ খণ্ডাবে না। প্রায়শ্চিত্ত না করা অবধি দাঁতে কুটো দেবে, কথা বলবে না।

সারা গাঁয়ে ফুসুর ফাসুর—পহলি গলায় হাড় বাঁধবে। গরু মেরেছে।

সেদিনের পহলি আর আজকের 'অন্ধারুআ'। কত তফাত!

পহলি ভাবে, সেদিন পদ্মপুরাণ প'ড়ে পুরুত ঠাকুর নিধি মিশ্র মশাই তাকে কী বলেছিলেন। ভয়ে মুখটা তার চুপসে যায়। তার চোখের সামনে জেগে ওঠে একটা মস্ত বড় জ্বলন্ত চুলো—বড় বড় হাঁড়ার মধ্যে তেল ফুটছে চড়বড় ক'রে। সে একদিক থেকে আর একদিকে তাকায়, কেঁপে কেঁপে ওঠে। আবার তার চোখে ভেসে ওঠে দুটো মোষের-শিংওলা যমদূত, সেদিন যাদের ছবি ঠাকুর মশাই দয়া করে পুরাণের পাতা উলটে বের ক'রে মিটমিটে পিদিমের আলোয় তাকে দেখিয়েছিলেন। সেই তিনরঙা ছবিটা তার মনে পড়ে। কী বড় বড় চোখ, এমনি তার শিং, হাতদুটো কী ছুঁচলো। ভীতু ছেলের মত সেদিন দুপুরে দেয়ালা ক'রে ওঠে।

এলো এলো, ওই এলো!

এক একদিন পথ চলতে চলতে নির্জন দুপুরবেলা সে ক্লান্তিতে একটা গাছতলায় ব'সে পড়ে। চারদিকে শুনসান, খাঁ খাঁ করছে। তার মনে পড়ে নিচের গাঁয়ের রামা গোয়ালার কথা। গরু মেরে সেকথা লুকিয়েছিল; কিন্তু মরবার সময়ে জিবে ঘা হয়ে গেল, পোকা পড়ল, লেজওলা পোকা মুখে কিলবিল ক'রে চ'লে

বেড়াতে লাগল। গু-মূত পুঁজ-রক্তের মধ্যে প'ড়ে রইল সে। তবু কি তার প্রাণ গেল ?

শেষে পাড়াপড়শী শুধোলে—কীরে রামা, কী করেছিস্ বলে দে। নইলে সহজে কি প্রাণ যাবে ?

রামা অন্যায় কবুল করলে। গরু মারার কথা বলে দিতেই তার হিক্কে উঠল। তিনবার গরুর মত হাম্বা ডাক ছেড়ে তার প্রাণবায়ু উড়ে গেল।

পহলি আর ভাবতে পারে না। তার কানে আসে যেন দূর থেকে একটা গুঁতুনে গরু হাঁকার পাড়ছে। সে ভয়ে গাছটাকে জড়িয়ে ধরে।

কাছে পিঠে হয়তো বা একটি দুটী গরু চরছে। ধলা কালা পাঁশুটে বাছুরগুলো চারপাশে নাচছে কুঁদছে। পহলির মনে হয় তারা যেন শিং উঁচিয়ে মারতে আসছে। লাঠিখানা হাতে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে ওঠে—তরাস-লাগা চোখে এদিক ওদিক চায়।

এক একদিন রাতে পহলি স্বপ্ন দেখে—একটা মরা কালো গরু পেট ফুলিয়ে তারি ঘরের আঙিনায় প'ড়ে আছে, তার পেটের ভিতর একটা মরা বাছুর। গেলির মা তুলসীতলায় ব'সে নিঃসাড়ে কাঁদছে। আর, তার মরা মেয়ে গেলিটা বেঁচে উঠেছে—বাআ বাআ ব'লে চারিদিকে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পহলির ঘুম ছাঁৎ করে ভেঙ্গে যায়। সে উঠে বসে। দূরে মনে হয় যেন ফঁসর ফঁসর করে কী চরছে।

কোনোদিন পথ চলতে চলতে হঠাৎ পহলি থমকে দাঁড়িয়ে যায়। তার মনে হয় পেছন থেকে কে বা ডাকছে। সরু সরু শিং, হাতে একটা বাঘা ফাঁস লাগানো দড়ি। মনে পড়ে যায় রামা গয়লার মুখটা। পুঁজ, রক্ত, লেজওলা পোকা। নিজেই নিজের মনকে বুঝিয়ে সে আবার পথ চলে। একশ'বার বড়ঠাকুর জগন্নাথের নাম স্মরণ কর। পুরীর বড়দাণ্ড-মন্দিরে যাওয়ার বড় রাস্তা। শ' শ' কুষ্ঠ রোগীর মাঝে পহলি ব'সে খাপরা একখানি পেতে ভিক্ষে চাইছে। মন্দিরের বড় দেউলের উপরে বড় ঠাকুরের তেহারা পাটের নিশান উড়ছে। পহলি এক দৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে থাকে। পুরী-বড়দাণ্ড পৌঁছে অবধি তার মনে একটু সাহস এসেছে। সে আর আগের মত দেয়ালা ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখে চমকে ওঠেনা। কাছে শোয়া কুষ্ঠরোগী মেয়েমানুষটা হয়তো বা শুধোয়—আর কতদিন তোকে হাড় বেঁধে থাকতে হবেগো মউসা ? পহলি হাতের আঙ্গুল গুনে ইশারায় বলে—আর সাত দিন।

সাতদিন পরে পহলি গাঁয়ে ফিরল। সে গেলির মায়ের রুপোর খাড়ু বাসন-কোসন বেচে পাঁচটি টাকা ট্যাঁকে নিয়ে পুরী গিয়েছিল। ঘরের জিনিষপাতি বেচে সে পুরী থেকে পাতক মুক্তি করিয়ে এসেছে।

একমাস একুশ দিন পূর্ণ হ'তে সে পঞ্চগব্য করে বামুন খাইয়ে মুক্তি মণ্ডপের গোঁসাই প্রভুদের কিছু কিছু ট্যাকগোঁজা দিয়ে তাঁদের পায়ের ধুলো আর আশীর্বাদ নিয়ে ঘরে ফিরল। আসার সময়ে গেলির মায়ের জন্য মহাপ্রসাদ এক কুড়ুআ (মাটির গভীর পাত্র) আর শুকনো প্রসাদ কয়েক 'মূর্তি'ও আনতে ভোলেনি। ঘরমুখো হয়ে পহলির পা আর মাটিতে পড়ে না। খুশিতে ভরপুর মন।

বাতিলাগা সন্ধ্যের নরম অন্ধকার গাঁয়ের উপরে তার পাতলা ওড়নাখানি বিছিয়ে দিয়েছে। গাঁয়ের মুড়োয় 'মাহাল' গাছের উপরে জোনাকি পোকার সাঁঝের মেলা বসেছে। গেলির মা উপোষী মুখের উপর কাপড়ের আঁচলটা ঢেকে দিয়ে তুলসী বৃন্দাবতীর কাছে সাঁঝের বাতিটি রেখে দণ্ডবৎ প্রণাম করছে, এমনি সময়ে পিছন থেকে পহলি ডাক দিলে—ঘরের সব ভাল তো গেলির মা ?

গেলির মা যা জবাব দিল তাতে পহলির বুক শুকিয়ে গেল। তার ঘরমুখো হাসিখুশি চোখের পলকে কোথায় উবে গেল।—ঘরে আজ পনর দিন চাল নেই, মাড়ুয়াটুকু ছাগলে খেয়ে গেল, তিনদিন আগে শীতের দিনের অকাল ঝড়বৃষ্টিতে হেঁসেলের দেয়ালটা প'ড়ে গেল। আর, ভাগের ক্ষেতের যে ধানটুকু আমদানি হয়েছিল তা যখন জমিদারবাবু পুরী গেছিলেন সেইসময় আসছে সালের খাজনা বাবদে তুলে নিয়ে গেছে, গেল সালের খাজনা একমাসের ভেতর না দিলে আবার ঘরদোর ক্রোক করবে ব'লে শাসিয়ে গেছে।

মাথায় হাত দিয়ে পহলি সব শুনল। কিছু বললে না। সে রাতটা পুরীর মহাপ্রসাদ খেয়ে দুই প্রাণীর কোনোরকমে কাটল।

পরদিন সকালে পহলি দেখল উনুনে হাঁড়ি চড়াবার চাল নেই। আনাজপাতি তো দূরের কথা। হাঁড়িশালের দেয়াল ধসে প'ড়ে মাটি গাদা হয়ে রয়েছে। একটা কোণে মস্ত এক উইঢিপি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। হাঁড়ি-কুড়ি যা খানকয় ছিল দেওয়ালের মাটির চাঙ্গড় প'ড়ে চুরমার হয়ে গেছে। ঘরের ভিতর ছড়ানো খাপরার টুকরো। পহলি দুই মাস নিষ্কর্মা হয়ে পুরীতে ব'সে ছিল—ঘরে একটা কানাকড়িও নেই। বাঁধা দেওয়া বেচবার মত যাও বা ভাঙ্গাচোরা জিনিষপত্র কয়টা ছিল সে সব তো পহলি বিক্রি টিক্রি ক'রে পুরী গিয়ে পাপ খণ্ডিয়ে এসেছে। বাকী আর আছে কী, কিসে হাত দেবে ? বউয়ের হাতে কেবল শাঁখা এক একগাছি—দিন দিন আরো ঢিলে আলগা হয়ে যাচ্ছে।

সকাল হতে গাঁয়ের বামুনেরা হাজির—বিদায় দাও। বামুন শুদ্ধ না করলে নাকি পাপ খণ্ডাবে না। জমিদারের পেয়াদা এসে দোরে বসল—গেল বছরের খাজনা শোধ না করলে বাবু মোকদ্দমা করবেন। জাত ভায়েরা এসে ধ'রে বসল—'জাতিভাত' দিয়ে শুদ্ধ হতে হবে।

পহলি জন খাটতে বেরুল। সবে কেবল পৌষ মাস, ধান কাটার পরে কাজ জোটে কোথায় ? তাছাড়া পহলির ঠাওর হল গাঁয়ের লোকে আজকাল তাকে দেখে কেমন নাক সিঁটকায়। একজন তো মুখ খুলে শুনিয়েই দিলে—'গরু মেরেছে, ছুঁলে ছোঁয়া যাবে। পহলি সেদিন থেকে আলগা হয়ে রয়েছে, কারো সঙ্গে গায়ে প'ড়ে মেলামেশা করে না।

জাত ভাই খাওয়াতে না পারায় পহলির জাত গেল। সবখানে ত্যাজ্য। বামুন গোঁসাইরা বেঁকে বসলেন। ধোপা নাপিত জল আগুন সব বারণ হয়ে গেল। পহলি একঘরে হ'ল।

শালের কোঁড়ার মত শরীর পহ্‌লির দেখতে দেখতে হাড়সার হয়ে গেছে। আর গেলির মা বুঝি ফুঁ দিলে পড়ে যায়। খালি হাড় ক'খানি দেখা যায়। পহ্‌লি বউকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলে।

পহ্‌লির একদিন চুলো জ্বলে তো দু'দিন ঠায় উপোস। দোকানী গোবি সাহু বাকি দেবে না ব'লে দিয়েছে। পহ্‌লি কী করবে আর ভেবে পায় না।

দুঃখ-কষ্ট হেনস্তা-অপমান সয়ে সয়ে পহ্‌লির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে পুরীতে এত খরচপত্র ক'রে মনের যে কালো দাগটা মুছিয়ে নিয়ে এসেছিল তা আবার গভীর হয়ে মনের উপর দাগ কেটে বসেছে।

আগের মত আবার সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন তাকে এক একবার পাগল ক'রে দেয়। এক একবার সে চমকে ওঠে। মনে হয় কালো মতো কী একটা তার চারধারে চরে বেড়াচ্ছে। রাতে সে স্বপ্ন দেখে একটা ঢুঁসুনে বলদ তাকে যেন শিং দিয়ে ঢুঁসিয়ে দিতে ল্যাজ তুলে ছুটে আসছে। সে দেয়ালা ক'রে ওঠে—ঐ এলো, ঢুঁসিয়ে দেবে, পালা, পালা—।

পহ্‌লির আর বাকি যা ছিল—সেই ভাঙ্গা ঘরটুকুও—শেষে খাজনার দায়ে নিলাম হয়ে গেল। এত বড় দুনিয়ায় তার মাথা গোঁজবার একটু ঠাঁইও রইল না। ঘরখানি নিলাম হওয়ার সময় পহ্‌লি ফ্যাল্‌ ফ্যাল ক'রে চেয়েছিল শুধু। তার মুখে রা ছিল না। যখন তাকে জানিয়ে দেওয়া হল যে এবার থেকে আর সে সে-ঘরে থাকতে পারে না তখন সে কেবল চুপটি ক'রে উঠে দাঁড়াল। তারপর একটা শাবল নিয়ে হেঁসেল থেকে তার 'ঈশান বেদী' আর খিড়কির দিকের দেয়াল থেকে তার মরা মেয়ে গেলির ঝেটেরার মঙ্গলচিহ্ন খুঁড়ে তুলে নিয়ে এসে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সেই যে গেল, আর একটিবারও সে ফিরে আসেনি।

বাপ দাদার আমলের ঘরখানি যাবার পরে পহ্‌লির মনের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেল। এ বেলা এখানে ও বেলা সেখানে এমনি করে কোনো মতে রাত কাটিয়ে দিতে লাগল।

ঘরের আঙ্গিনার মাঝখানে ঝাঁকড়া সজনে গাছটি পহ্‌লির বড় প্রিয়। গাদা গাদা ঘুঁটের ছাই ঢেলে ছিল সে তার গোড়ায়। সেই সজনে গাছে ডাঁটা ফ'লে গোছা গোছা মাটিতে পড়েছে, তাও তার একটা তুলে এনে পান্তা খেতে তার হাত ওঠেনি। তারই ছায়ায় ব'সে কত চাঁদনী রাত সে কাটিয়েছে। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক একদিন সেই গাছটার দিকে পহ্‌লি চেয়ে চেয়ে দেখে, তার তলায় একটু গিয়ে বসতে তার বড় ইচ্ছে যায়; কিন্তু সে ফিরে আসে। জমিদার বাড়ীর চৌকিদারটা তাকে দেখে ঠাট্টা ক'রে বলে—কীরে, গরু মারা পহ্‌লি!

পহ্‌লির মনে পড়ে। তার ঘরের পেছন দিকে কানশিরী শাক হয়। শাক গজিয়ে ঝোপ জঙ্গল হয়ে গেছে হয়তো। কুয়োর ধারে সেই সদাবিহারী আর গোড়িবাণ গাছগুলো হয়তো ফুলে ফুলে ভ'রে নুয়ে পড়েছে। মন বলে একবার গিয়ে দু'চোখ ভ'রে দেখে আসে।

তার ভাঙ্গা বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে ওঠে। মনটা তার চুর চুর হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। জেগে জেগে কত কী দুঃস্বপ্ন দেখে, আবোল তাবোল বকে। তার মনে হয়, এসবের মধ্যে কবে বুঝি বা সে মরেই গেছে।

ঘর নিলাম হওয়ার মাসখানেক পরে পাড়ার লোকে একদিন বলাবলি করল—পহলি পধান পাগল হয়ে গেছে, গু-মুতে মাখামাখি হয়ে ইদিক উদিক ঘুরে বেড়ায় আর মানুষ দেখলে বলে—ঐ এলো, এলো, ঢুঁসিয়ে দেবে, হুঁশিয়ার!

পাহাড়ে জ্বালানি কাঠ কুড়োতে বাউড়ি মেয়েরা গিয়েছিল। সাঁঝবেলায় তারা ধোবা সাহুর দোকানের আশে পাশে বলাবলি করছিল—পহলি পাহাড়ের উপরে বসে আছে, কেবল বলদের মত ডাক ছাড়ছে আর বলছে—ঐ এলো, এলো, কী বড় বড় শিং, কী ফোঁসফোঁসানি—মলাম, আমি মলাম গো জমিদারবাবু—

সব শুনে গম্ভীর হয়ে নিধি মিশ্র ঠাকুর বললেন—তার পাপ তাকে এসে দেখা দেবেই তো, যাবে কোথায়! শুদ্ধি না করলে কি গোহত্যার পাপ ছাড়ে? আমরা এত করে বললাম, তা আমাদের কথা তো মনে ধরল না। দশটা টাকা খরচ ক'রে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে শুদ্ধিটা সেরে নিলে আজ সে ভালয় ভালয় গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে ব'সে থাকত। ধর্ম তো আজও আছে।

পরীক্ষিৎ ব্রহ্মা বললেন—আজকাল শাস্ত্র পুরাণের কথা কি আর কেউ মানছে, মিশ্র মশায়? দেখছ না মরণকালে কেমন গরুর মত ডাক ছাড়ছে? তার কাল পুরে এসেছে। কিন্তু পাপ যাবে কোথায়, সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে।

নির্জন পাহাড়ের উপরে পহলি। দেহ তো নয়, কঙ্কাল। একটা ভয়ানক কল্পনার প্রেতাত্মা তার মনের উপর লম্বা ছায়া ফেলে তাকে পেয়ে বসেছে। তা থেকে উদ্ধার কোথায় তার? তার সঙ্গে সঙ্গে জুটেছে বহুদিনের উপোষী খিদে, অভাব যন্ত্রণা আর অপমান। সবকিছুতে মিলে তার মনটাকে পিষে চুরমার ক'রে দিচ্ছে।

পহলি দেখছে সামনে তার ঘর দোর স্ত্রী পরিবার জ্ঞাতি-কুটুম্ব কেউ নেই। আছে কেবল একটা মস্ত ফাঁকা, শূন্য। আর আছে একটা মস্ত বড় পুঁথি, তার পাতে লেখা বড় বড় যমদূতের ছবি—কালো কালো চোখ, সরু সরু শিং। সে পুঁথির এক একটা অক্ষর যেন একটা জাঁতা—তাকে পিষে ফেলবার।

পহলির ঘাঁটা পড়ে যাওয়া মনটা যেন আর নড়ে চড়ে না। চারদিক তার লাগছে যেন খালি, সব খাঁ খাঁ করছে কেবল।

বেতবনের ঘন আগাছার জঙ্গলের ভিতর থেকে অলক্ষুণে কাক ডেকে চলে কা-কা-কা। ঝোপ জঙ্গল, পাহাড়ের টিলা সব যেন জ্যান্ত মানুষের মত থেকে থেকে বারে বারেই তার কানের ভিতর ডেকে চলে—আয়-আয়-আয়।

পহলি দেখে ও গাঁয়ের রামা গয়লার মড়াটা। তার মরা মুখে উপচে ওঠা হাসি। আর দূরে কী যেন একটা ফোঁস ফোঁস ক'রে চ'রে বেড়ায়!!

পহলি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে বেহুঁশ হয়ে একটা ধারালো পাথরের উপরে আছাড় খেয়ে প'ড়ে গেল।

পরদিন পাতা-কুড়ুনী মেয়েরা গিয়ে গাঁয়ের সবাইকে বললে—পহলি ফুঁস্যুর ফুঁস্যুর ক'রে ধুঁকছে, এখন কি তখন।

ছাগল চরায় নোকা (লোকনাথ), সে গিয়ে পাড়ার মাঝে হাত পা নেড়ে বললে—দু' দুটো যমদূত পহলির কাছে জেগে ব'সে রয়েছে। মুখ তাদের বলদের পারা, সে হুই হুই ক'রে উঠতে পালিয়ে গেল।

গাঁয়ের দু'চার জন জোয়ান ছেলে গিয়ে দেখে এল পাথরের ফাঁকে মুখ গুঁজড়ে প'ড়ে আছে পহলি। তার মাথার খুলির আদ্ধেক উড়ে গিয়ে ঘিলু বেরিয়ে পড়েছে।

খবর পেয়ে সেই রাতে গেলির মা এল। গেরস্তকে গরু মারার পাতক থেকে শুদ্ধি ক'রে নেয়ার জন্য সে বাপের বাড়ী থেকে কিছু টাকা নিয়ে এসেছিল। সেই রাতে একবারটি তাকে পহলির কাছে নিয়ে যাবার জন্য কত লোকের কাছে কাকুতি মিনতি করলে, কিন্তু এত বড় গাঁয়ের মধ্যে একজনও মাঝরাতে পাহাড়ের উপর যেতে চাইলে না।

ভোর বেলা গেলির মা টিলার উপরে বাউরী মেয়েদের কাছে সন্ধান ক'রে গিয়ে দেখল, পহলি ম'রে গেছে। মুখ থেকে ফেনা বেরিয়ে গেছে, চোখ উলটে গেছে, কানের কাছে খুলি টুকরো হয়ে ভেঙ্গে কোথায় উড়ে গেছে।

তার চোখের জল ম'রে গিয়েছিল। সে কেবল ফ্যাল ফ্যাল ক'রে সেই দিকে চেয়ে রইল।

শুদ্ধি না হওয়া পহলির মড়া কী ক'রে উঠবে তা নিয়ে গাঁয়ে ভারী তর্কাতর্কি চলল।

গেরস্তকে শুদ্ধি করানোর জন্য বাপের বাড়ী থেকে আনা দশটি টাকা আঁচলের গেরো খুলে গাঁয়ের মুরুব্বিদের হাতে দিয়ে গেলির মা লম্বা হয়ে সকলের পায়ে পড়ল।

বামুন গোঁসাই আর জাতভাইয়েরা খুশী হয়ে পহলির মড়াকে আশীর্বাদ করলেন।

অনন্তপ্রসাদ পণ্ডা (1906—)

অনন্তপ্রসাদের জন্ম বালেশ্বর জেলার সোর থানার কল্যাণী গ্রামে। স্কুলজীবনেই সাহিত্যে হাতে খড়ি। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। রাষ্ট্রপুঞ্জের বৃত্তি নিয়ে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেছেন। অনন্তপ্রসাদ একাধারে গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধ লেখক। এঁর বিশিষ্ট উপন্যাস : 'কুলি', 'নুআ ডুনিআ', 'ভাগ্যচক্র'। গল্পগ্রন্থ : 'নৈশ সুন্দরী' 'সভ্যতার তলে' ও 'তৃণগুচ্ছ'।

গোপী সাহুর দোকান

পথের ধারে সেই অতিশয় পুরানো ঝাঁকড়া বটগাছটা তেমনি দাঁড়াইয়া আছে, কত যুগ ধরিয়া। গাছের গোড়াটা কালের করাল কবলে কোন কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গেছে তার ঠিকানা নাই, কিন্তু গাছটিকে এতদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তার গোটা পাঁচ ছয় বড় মোটা মোটা ঝুরি, মাটির ভিতরে ঢুকিয়া তাহারা গোড়ার কাজ চালাইয়া লইতেছে।

গাছটি তার জন্মাবধি এতদিন দেখিয়া আসিয়াছে দুনিয়ার কত পরিবর্তন। যখন তার জন্ম হইয়াছিল তখন এখানে এমনি পাকা সড়ক ছিল না। একটি কাঁচা রাস্তাও ছিল না। তখন এই অঞ্চলে ছিল কেবল একটি আঁকাবাঁকা পাড়াগেঁয়ে পায়ে চলা পথ, চলিয়া গিয়াছিল কোন দূর গাঁয়ের দিকে। তখন পথিকদের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য কোন মুক্তিকামী সনাতনী এই বটবৃক্ষটির বীজ বপন করিয়াছিল এইখানে। এই বটবৃক্ষটি রোপন করিয়া সেই সনাতনীটির মুক্তিলাভ হইল কিনা জানা নাই। হয়তো আজকালের নব্য সভ্য যুবক-যুবতী তার এমনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাজ দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইবে, কিন্তু তার কাজটি যে ছিল লোকসেবার পরম আদর্শস্বরূপ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সে যাই হোক, গাছটি অদ্যাবধি দাঁড়াইয়া আছে। কত পথশ্রান্ত পথিক তার ছায়ায় আশ্রয় লইয়া বৈশাখের কাঠফাটা রৌদ্রে আত্মরক্ষা করিয়াছে কে তার হিসাব রাখিয়াছে?

সেই বটগাছটি তেমনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে দুনিয়ার কত অভাবনীয় পরিবর্তন। সেই আঁকাবাঁকা পায়ে চলা পথটির স্থানে সেখানে যখন একটি মাটির

সড়ক তৈরী হইল তখন শত শত গরুর গাড়ী সেই সড়ক দিয়া চলিল। তখনও গাছটি ছিল গরুর গাড়ীওয়ালাদের এক বিশ্রামস্থল। বৈশাখের গরম হাওয়া ও কাঠফাটা রৌদ্রের ঝাঁজ সহিতে না পারিয়া গাড়ীওয়ালা যখন সেই বটগাছতলায় গাড়ী খুলিয়া তার বলদ বা মহিষ জোড়া গাছের আড়ালে বাঁধিয়া দিয়া গাছের ছায়ায় গামছাখানি পাতিয়া শুইয়া পড়ে তখন তার প্রাণ এক অপূর্ব পুলকে ভরিয়া উঠে। গাছটি যে কেবল রৌদ্রের তাত হইতে পথিক ও গরুর গাড়ীওয়ালাদের রক্ষা করে তাহাই নহে, পৌষ মাসের হাড় কাঁপানো শীতেও আশ্রয় দেয়। শীতের রাতে গরুর গাড়ীওয়ালার হাত পা ঠাণ্ডায় জমিয়া গেলে সে এই বটগাছতলাতেই গাড়ী খুলিয়া দিয়া ধুনি জ্বালাইয়া হেঁস ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়ে।

পথ চলা লোকদের, বিশেষতঃ গরুর গাড়ীওয়ালাদের, খাদ্যপেয় যোগাইতে গোপী সাহু মুদী সেই বটগাছের তলায় তার ক্ষুদ্র দোকানটি দিয়াছিল। বটগাছের দুটি বড় ঝুরির মাঝখানে তার দরমা ও মাটির তৈরি ছোট দোকান ঘরখানি। দোকানটি যখন আরম্ভ করে গোপী সাহুর বয়স তখন ছিল মোটে কুড়ি-পঁচিশ। তার দোকান ঘরে চাল আনাজ হইতে আরম্ভ করিয়া তেল নুন হাঁড়ি কাঠ পর্যন্ত সব জিনিষই মজুত থাকে। চিঁড়া ও মুড়িরও অভাব নাই।

দুপুরে বা সন্ধ্যাবেলায় যে গরুর গাড়ীওয়ালারা সেখানে বিশ্রাম করিবার জন্য থামে তাহারা গোপী সাহুর দোকান হইতে চাল আনাজ হাঁড়ি কাঠ প্রভৃতি কিনিয়া বটগাছের তলায় একটা গর্ত খুঁড়িয়া তিন চারটি পাথর দিয়া উনান পাতিয়া ভাত রাঁধিয়া ফেলে। বেলা হইলে অথবা রাত্রি প্রভাত হইলে উঠিয়া আবার যখন তাহারা গাড়ী জুড়িয়া যাত্রা শুরু করে তখন গোপী সাহুর কাছ হইতে মুড়ি চিড়া গুড় ও তামাক পাতা প্রভৃতি নিয়া গামছায় বাঁধিয়া উপেন্দ্র ভঞ্জ বা কবিসূর্যের রসাল গানের দুই একটা পদ গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া পড়ে। গোপী সাহুর বেশ দু'পয়সা লাভ হয়।

এমনি কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। তারপর জেলা বোর্ডের কনট্রাক্টর ও ইনজিনিয়ররা আসিয়া সেই কাঁচা রাস্তাটিকে মাপ জোখ করিলেন। গোপী সাহু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে সরকার রাস্তাটিকে পাকা করিবেন। গোপী সাহুর কপাল আরও খুলিয়া গেল : কত কুলি মজুর আসিয়া কাজে লাগিল, দিন কতক গোপী সাহুর ভারী লাভ হইতে লাগিল। সে তার মাটির কুঁড়েটি ভাঙ্গিয়া সেই জায়গায় ইঁট পাথর দিয়া দুই কুঠরিওয়ালা একখানি ঘর বানাইয়া লইল। দোকানের সঙ্গে একটি চা-কফির দোকানও জুড়িয়া দিল।

গোপীর বয়স তখন হইয়াছে ত্রিশ কি চল্লিশ। এতদিন তার কোন ভাবনা ছিল না, কিন্তু দোকানের শ্রীবৃদ্ধি ও হাতে কিছু পয়সা জমিবার পরে সে অনুভব করিল একটা অভাব। তার মনে হইল এই দুনিয়ায় সে যেন বড় একা। তারপরে সারাদিন দোকানে বসিয়া যখন সে নিজে দুটি খাইবার জন্য রাঁধিতে বসে বা শুইতে যায় তখন তার মনে একটা অভাবের তীব্র কশাঘাত অনুভব করে। গোপী ভাবিল,

বিবাহ করিয়া বউ ঘরে আনিলে তার বড় সুখ হইত ! হাতে পয়সার তো অভাব নাই, সুতরাং কন্যার অভাব হইল না। কিছুদিনের মধ্যেই নববধূ আসিয়া গোপীর নিঃসঙ্গ জীবনের অভাবটি পূরণ করিয়া দিল।

একটি দিনের পর আর একটি দিন জলের স্রোতের মত বহিয়া যায়। গোপীর মনে হইল, দুনিয়াটা সত্যই এক সুখের খেলাঘর। নববধূ প্রথম প্রথম ঘোমটা টানিয়া দোকানের ভিতর দিকে বসিয়া থাকিত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার সে সলজ্জভাব কাটিয়া গেল। সে হইল দোকানের সর্বময়ী কর্ত্রী ও গোপী হইল তার আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। কিন্তু তাহাতে গোপীর কোন দুঃখ নাই, বরং আনন্দের আতিশয্যে সে অনেক সময়ে পুলকিত হইয়া উঠে। হাতে যা কিছু টাকা পয়সা জমে তাহাতে সে স্ত্রীর জন্য কোমরের গোট, নাকের নথ, নোলক প্রভৃতি গহনা গড়াইয়া ফেলে।

এমনি করিয়া তিন চার বছর কাটিয়া যাইবার পর গোপী ও তার স্ত্রী অনুভব করিল আর একটি নূতন অভাব। একটি সন্তান লাভের ভারী ইচ্ছা হইল গোপী-পত্নীর। তার জন্য দানধর্মে স্বামী স্ত্রী অকুণ্ঠিতচিত্তে অর্থব্যয় করিল। লড়ু বাবার মন্দিরে গিয়া কতবার পূজা অর্চনা করিল। গোঁসাই মহাপুরুষের পীঠস্থানে কত মানত করিল। শেষে গাঁয়ের বাশুলি ঠাকুরানীর থানে একটা কালো পাঁঠা ও এক জোড়া কালো মুরগী বলিদান করিল—গাঁয়ের অন্ধবিশ্বাস অনুসারে।

বাঁশুলি ঠাকুরানীর কৃপায় হোক বা লড়ু বাবার মহিমায় হোক ষষ্ঠী দেবী গোপীর বউকে বরদান করিলেন। শুভক্ষণে গোপীর একটি কন্যা সন্তান জন্মলাভ করিল। স্বামী স্ত্রী উভয়ের আনন্দ উথলিয়া পড়িল। নবজাত কন্যাটির দীর্ঘজীবন কামনায় বুড়ী বাশুলির কাছে আবার এক জোড়া নিরীহ ছাগশিশু বলি দেওয়া হইল। লড়ু বাবার কাছে কত পূজা অর্চনা হইল। মহাপ্রভুর দয়ার ভাণ্ডার বুঝি এবার উছলিয়া পড়িল ঃ পর বৎসর কার্তিক মাসে আবার একটি কন্যা। এমনি ভাবে পাঁচ বছরে পাঁচটি কন্যা লাভ করিয়া সাহুজায়া যখন পাঁচটি সন্তানের মা হইলেন তখন মনের দুঃখে স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন—ওগো, বিধাতা পুরুষের কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নাই, বছর বছর কেবল মেয়েগুলার জন্ম দিতেছেন। যতই যা হোক এরা তো পরের ঘরে যাবে, বেটাছেলে হইলে ভাল হইত।

সাহু দম্পতি আবার অনুভব করিল এক অভাবের গুরু যন্ত্রণা। পুত্র সন্তান একটি পাইবার কামনা করিয়া গোপী এবার বাশুলির থানে এক জোড়া কালো পাঁঠা ও এক জোড়া কালো মোরগ বলি দিল। ঠাকুরানী বুঝি প্রসন্ন হইলেন ঃ পাঁচটি মেয়ের পর সাহু দম্পতি যখন একটি পুত্ররত্ন লাভ করিল তখন তাহাদের কত আনন্দ হইল বলিয়া শেষ করা যায় না। এবার পুত্রের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া তাহারা গাঁয়ের বাশুলি হইতে আরম্ভ করিয়া বড় ঠাকুরানী যে তারাতারিণী তাঁর কাছে একটা মহিষ ও কালো জোড়া পাঁঠা বলিদান করিল।

* * * * * *

ইহার মধ্যে সড়ক তৈরির কাজ শেষ হইয়াছে। গোপী সাহুর দোকানের সম্মুখস্থ সেই মাটির রাস্তাটির বদলে এখন সেখানে পাথরে বাঁধানো পাকা সড়ক। কুলিগুলা সেখান হইতে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং গোপী সাহুর দোকানের আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে। এদিকে কিন্তু একটা পেটের পরিবর্তে এখন হইয়াছে আটটা পেট। তাহার উপর ছেলেমেয়েদের মঙ্গল কামনায় বারো মাসে তেরো পার্বনে পূজো-আর্চা বলি ইত্যাদিতে কত কি খরচ হইয়া গেছে, কিন্তু যেন একটা নেশার ঝোঁকে সাহু দম্পতি সেদিকে একেবারেই নজর দেয় নাই। তবে গরুর গাড়ীওয়ালাদের কাছ হইতে যা দু'পয়সা আসে তাহাতে গোপী কোন মতে কষ্টে সৃষ্টে সংসার চালাইয়া লয়। কিছুদিন পরে বড় দুই মেয়ের বিবাহ হইয়া গেল। বিয়েবাড়ীটা একটু জাঁকজমকের সহিত করিবার জন্য সাহুজায়া জেদ ধরিলেন। সুতরাং গোপী সাহু বাধ্য হইয়া সাহুকারের বাড়ী হইতে কিছু কর্জ আনিয়া কাজটা চালাইয়া লইলেন। পাড়াপড়শী জাতভাইদের বেশ করিয়া খাওয়াইলেন। সকলে ধন্য ধন্য করিল।

একদিন সকালে গোপী সাহু তাহার বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া দাঁত মাজিতেছে, একটা বড় শোরগোল শোনা গেল। ছেলেমেয়েরা ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে ছুটিয়া আসিল। সাহুপত্নীও গৃহকর্ম ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিলেন। গোপী চাহিয়া দেখিল একটা কলের গাড়ী ছুটিয়া আসিতেছে ভেঁাপ ভেঁাপ আওয়াজ করিতে করিতে। কত যাত্রী—কুড়ি কি পঁচিশ হইবে! গোপী ভাবিল, তাহার কপাল খুলিল। এত যাত্রী যদি একসঙ্গে এক একটি পয়সার জিনিষও কেনে তবে তো পাঁচ আনার কি সাত আনার বিক্রি হইবে একবারেই। সাহু তাই তাড়াতাড়ি করিয়া দোকানে যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িল। কিন্তু কলের গাড়ীটা যখন তার দোকানের দিকে একটুও নজর না দিয়া ধূলা উড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল তখন অজ্ঞাতে তার বুকের পাঁজরা ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল একটা দীর্ঘশ্বাস।

গোপী ভাবিল, সকাল বেলা বলিয়া না কলের গাড়ী ছুটিয়া চলিয়া গেল, দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে কিংবা রাতের অন্ধকারে নিশ্চয় এই গাছতলায় আশ্রয় লইবে। তখন অবশ্য তার হাঁড়ি কাঠ চাল কত বিক্রি হইবে। কিন্তু দুপুর বেলা যে কলের গাড়ী আসিল তা এই ঝাঁ ঝাঁ রোদের খাতির না করিয়া গোপী সাহুর দোকান ঘরের দিকে দৃক্‌পাতও না করিয়া কিংবা এত কালের আশ্রয়স্থল এই পুরানো বটগাছের ছায়ার দিকে না চাহিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল একটা নির্মম দৈত্যের মত। গোপীর আশালতার মূলোচ্ছেদ হইল। সন্ধ্যার সময় আবার মোটর বাস আসিল, কিন্তু থামিল না।

গোপী ভাবিল—আচ্ছা, কলের গাড়ী না হয় মানুষগুলিকে বহিয়া লইতেছে, মালপত্র সব তো যাইবে গরুর গাড়ীতে। কিন্তু গোপীর সে আশার মূলেও কুঠারাঘাত করিয়া যেদিন একটা মালবহা লরি সেই পথে ছুটিয়া চলিয়া গেল সেদিন গোপীর মন ভাঙ্গিয়া গেল। গরু বা মহিষের গাড়ীর সংখ্যাও গেল কমিয়া।

গোপীর আয় অনেক কমিয়া গেল, কিন্তু খরচ গেল বাড়িয়া। গোপী অনুভব করিল অভাবের তীব্র কষাঘাত।

*　　*　　*　　*　　*　　*

আরও তিনটি মেয়ের বিবাহের জন্য সাহুকারের বাড়ী হইতে আরও কিছু কর্জ করিল। অভাব অনটনে পড়িয়া গোপী ও তার স্ত্রী রুগ্ন হইয়া পড়িল। পুত্রসন্তানটি পর্যন্ত খাদ্যের অভাবে বাতগ্রস্ত হইয়া পড়িল।

*　　*　　*　　*　　*　　*

গাঁয়ে বসন্ত রোগ আসিল। কত যে লোক মরিল ঠিকানা নাই। একদিন হঠাৎ গোপী সাহুর ছেলের হইল বসন্ত। বুড়ার দেহ মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাকী যা গহনা ছিল বিক্রিবাটা করিয়া ছেলের জীবন রক্ষার জন্য আবার বাশুলি ঠাকুরানীর কাছে কালো পাঁঠা ও কালো মুরগী বলি দিল, কিন্তু এবার কেন জানি ঠাকুরানীর কৃপাদৃষ্টি পড়িল না। ছেলে চলিয়া গেল।

তারপরেই বুড়াকে বসন্তরোগে ধরিল। গায়ে ছুঁচ ফুটাইবার জায়গাটুকুও নাই। তবে বুড়ার তাতে দুঃখ নাই। সে ডাকিয়া বলে—হে মা বাশুলি, ছেলেকে নিয়াছ—ভাল, আমাকেও দয়া করিয়া লইয়া যাও। কিন্তু বুড়ার এ দারুণ করুণ ডাক ঠাকুরানীর পাষাণ হৃদয় ভেদ করিতে পারিল না। বুড়া পড়িয়া থাকিয়া থাকিয়া ভাল হইল, কিন্তু তার চক্ষু দুইটি চিরদিনের মত হারাইয়া বসিল। পথ্য করিয়াছে কি না করিয়াছে, ওদিকে সাহুকার কোর্টে নালিশ করিয়া বুড়া-বুড়ীকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া যা কিছু বাসন-কোসন ছিল নিলাম করিয়া নিল।

বুড়া-বুড়ী দু'জন একেবারেই নিঃস্ব হইয়া পড়িল। সেই বটগাছের তলায় একটি কুঁড়ে ঘরে দু'জনে পড়িয়া থাকে। দিনের বেলা যখন মোটর বাস যায়, বুড়ী বুড়ার হাত ধরিয়া রাস্তার ধারে লইয়া যায়। বলে—হাত বাড়াও, একটা পয়সা কি আধলা চাও, কত বাস যাইতেছে! কিন্তু বুড়ার মুখ ফোটে না। তাহার মনে হয় বুঝি এই বাসগুলাই তার দুর্গতির একমাত্র কারণ। রাগে অভিমানে তার কোটরগত জ্যোতিহীন দুই চক্ষু হইতে ঝরিয়া পড়ে দুই উত্তপ্ত অশ্রুধারা।

রাজকিশোর রায় (1914—)

পুরী জেলার ছতাবর গ্রামে রাজকিশোরের জন্ম। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি অভিনয়, সঙ্গীত ও সাহিত্য নিয়ে চর্চা করছেন। পাটনা ও কলকাতা থেকে ইংরাজী ও ওড়িয়া ভাষায় স্নাতকোত্তর হ'য়েছেন। বর্তমানে ওড়িশা সরকারের শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক। গল্পকার হিসেবে ওড়িয়া সাহিত্যে তিনি ধ্রুপদী রচনাভঙ্গীর অগ্রদূত। তাঁর রচনার বিশিষ্ট শৈলী ওড়িয়া সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁর অনেকগুলি গল্প সংকলনের মধ্যে কয়েকটি : 'নীল লহরী', 'বনজ্যোৎস্না' 'মনর মৃণাল', 'জীবন সঙ্গীত' ও 'আদি পুরুষ'। তাঁর একটি জনপ্রিয় একাঙ্কিকা সংকলন : 'পঞ্চপল্লব'।

কালাপাহাড়

প্রাচী নদীর ধারে এক জনবসতির মধ্যে সেই পরিবারটি। হঠাৎ একদিন সেই পরিবারে চাঞ্চল্য দেখা গেল।

প্রাচী নদীতে বহু জল বহিয়া গিয়াছে, কাল-কল্লোলের ছন্দমুখর অজস্র সন্ধ্যা কাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই সন্ধ্যাটি জয়শীলা ও লোককান্ত উভয়ের মনে এক সার্থক স্মৃতিলেখা আঁকিয়া দিয়াছিল।

কাহিনীটি বহুদিন আগের। জয়শীলা স্বর্গে। লোককান্ত বাঁচিয়া আছেন। কয়টি নিরলস মধ্যাহ্ন। অপরাহ্ণে, সন্ধ্যায় তিনি প্রাচী নদীর দিকে চাহিয়া কত কথা ভাবেন। তাঁর অতীত কীর্তিকলাপ বড় ছেলেমানুষের মত বলিয়া আজ তাঁর মনে হয়, তাঁর অবচেতন মনের ভিতর হইতে একটা বাল্কময় সরীসৃপ বাহির হইয়া আসিয়া তাঁর দেহে জড়াইয়া দুইটা সদাচলিত চক্ষু দিয়া ঘিরিয়া গ্রাস করিয়া বলে…'

—হে যুগসন্ধ পুরুষ, বড় কাজ করিয়াছ। হে মহাচেতা বন্ধু, ঠিক রাজপথ ধরিয়া না চলিয়া অলি গলির মধ্যে ঢুকিয়া যা আবিষ্কার করিলে তা অতি মহৎ ও শ্লাঘনীয়। এখন তোমার প্রাপ্য হিসাবে দেশ যা দিয়াছে তার অতিরিক্ত কয়েকটি চুম্বন তোমার অঙ্গে দিয়া যাইতেছি, তা সরীসৃপীয় হইলেও আমার আশা, তুমি গ্রহণ করিবে।

লোককান্ত শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। প্রাচী নদীর জলতরঙ্গে তাঁর পৌরুষের রূপ প্রতিফলিত হইতেছিল। অনতিদূরে সর্বশুভময়ী মা মঙ্গলার মন্দির হইতে আরতির ঘণ্টার নিঃস্বন ভাসিয়া আসিতেছিল।

* * * * * *

লোককান্ত সেই স্মরণীয় সন্ধ্যায় কোথা হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া ডাক পাড়িলেন—

—জয়শীলা, দরজা খোল।

জয়শীলা তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দেখেন স্বামী কী একটা কাঁধে করিয়া আনিয়াছেন, সেই পদার্থটার উপর তাঁর দোলাইখানি জড়ানো রহিয়াছে। পদার্থটির দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ আছে উচ্চতা আছে। ওজনও আছে বোঝা যাইতেছিল, নহিলে সেটা বহিয়া আনিতে তিনি হাঁপাইয়া উঠিবেন কেন!

—দরজার কপাট দাও, খিল দিয়ে দাও। শোন, এটা আমি আর কাঁধ থেকে নামাব না। জয় দুর্গা বলে এসেছি, সেই দুর্গা নাম নিয়ে কাজটা একেবারে সেরে ফেলি। জয়শীলা, প্রদীপ নিয়ে বসে তুমি ঘণ্টাখানেক কেবল দুর্গানাম স্মরণ কর, তাঁকে ডেকে বল যেন সব বাধাবিঘ্ন দুর্বিপাক পরমেশ্বরী বরাভয়ার কৃপায় দূর হয়ে যায়।

জয়শীলা স্বামীর এই মূর্তি দেখিয়া আর এমনি কথা শুনিয়া হতভম্ব হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর ভাবিলেন স্বামী নিশ্চয় কিছু চোরাই মাল ঘরে আনিয়াছেন। পুলিস বুঝি বা পিছন পিছন আসিতেছে। তাঁর চোখে এ সংসার যেন জ্বলিয়া গেল মনে হইল। তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিলেন—

—কী, চোরাই মাল? এমন চোরের মত করছ কেন? এ দুর্বুদ্ধি তোমায় কে দিল? সুখে দুঃখে সংসার চ'লে যাচ্ছে। ভগবান যখন যা দিয়েছেন তাতেই আমি চালিয়ে নিয়েছি। এখন এ কী কাণ্ড? তোমার পায়ে পড়ি তুমি যা এনেছ আর কোথাও রেখে দিয়ে এস, নয়তো মাটিতে পুঁতে ফেলে এস। পুলিস যদি পিছন পিছন আসতে থাকে তবে তো সর্বনাশ!

লোককান্ত দেখিলেন স্ত্রী জয়শীলা উত্তেজিত হইয়াছেন। মেয়েমানুষ কী বোঝে এ দুনিয়ার কূটকৌশল? বিবাহের বেদীর লোকটাকে স্বামী বলে, সন্তানের জন্ম দেয়, আর সঙ্কীর্ণ মন লইয়া পড়িয়া থাকে।

লোককান্ত খিড়কির দিকে যাইতে যাইতে বলিলেন—.

—আচ্ছা, শন্তাটা দাও—না শন্তায় হবে না, সময় যাবে—কোদালটা দাও। তুমি আমার সঙ্গে এসো না। কেবল দুর্গা, মঙ্গলা, অম্বিকা যা মনে আসে তাঁরি নাম নাও। তোমার কথামতই আমি এটা পুঁতে ফেলতে যাচ্ছি। দামী জিনিষ, মণি-মাণিক্যও এর কাছে লাগে না। যতদিন যাবে এটা ততই আরো দামী হবে, শেষে অমূল্য হয়ে উঠবে।

জয়শীলার মন কেমন নরম হইয়া আসিল। নারীসুলভ কৌতূহলের বশে তিনি ভাবিলেন—আহা, স্বামী এখনি পুঁতে ফেলবেন, পোঁতার আগে একবারটি যদি দেখতে পেতাম কী অমূল্য পদার্থ

বলিলেন—ওগো, একটু দেখতে দেবে না? এতদামী জিনিষ, একটু দেখব না?

লোককান্ত খিড়কির দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিলেন—না, মেয়েমানুষ, তোমাদের

বিশ্বাস কী ? ব'লে বেড়াবার জন্য জিভ সুড় সুড় করছে হয়তো। শাস্ত্রে বলে দুষ্কুলা নারীকে বিশ্বাস করবে না।

জয়শীলা ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিলেন—কী-ই-ই, আমি দুষ্কুলা ? কী না কী চুরি ক'রে এনে এই রাতে পুঁততে চলেছ, সকালে আবার তুলে এনে ঘরে পুরবে। পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে এই কাজ করছ। বললাম ব'লে আমি হলাম দুষ্কুলা, তুমি কোন সুকুল থেকে এসেছ তাই শুনি ? বল ওটা কী, নইলে চেঁচিয়ে পাড়াপড়শী জড় করব।

ত্রস্ত চকিত স্বামী ততক্ষণে কোদাল হাতে অদৃশ্য হইয়াছেন।

প্রাচী নদীর জলপ্রবাহের সঙ্গে কোদাল খোঁড়ার শব্দ মিশিয়া গিয়াছিল। মাটি কিছু কঠিন হইয়া থাকিবে, কারণ লোককান্তের মাংসপেশীতে ব্যথা ধরিতেছিল। অবশেষে কাজটা সারিয়া তিনি যখন সিধা হইয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল সোয়াস্তির স্বর—আঃ! —হুঁ, একটা চিহ্ন দিয়ে দিই জায়াগাটায়।

পুরী শহরের পথুরিআসাহির প্রসিদ্ধ পাথর কাটা কারিগর সারথি মহাপাত্র বাড়ীর ভিতরকার বারান্দায় হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া কী ভাবিতেছিলেন। দু'এক ঘণ্টা নয়, সেই কখন হইতে তিনি এমনি বসিয়া আছেন। তাঁর কন্যা শেফালী তিনবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া গেছে। বাবা বসিয়া আছেন নির্বিকল্প সমাধিতে।

—মা গো, বাবা কখন থেকে চোখ বুঁজে ব'সে আছেন। আমি ডাকলাম, তাও সাড়া দিলেন না। চুনা পাথরের কোণার্কের ঘোড়া নিতে নট অ ভাই কোন খদ্দের এনেছে। বাবা উঠলে না দরদাম ঠিক করবেন ? তা, শুনছেন না তো।

শেফালী সারথির আদুরে মেয়ে। পা দাপাইয়া কথা বলে, কথার তালে পায়ের তাল মিলিয়া যায়। সবল ঋজু শরীর, বাড়িয়া উঠিয়াছে বলিষ্ঠ অঙ্গ লইয়া। ফুরফুরে চুলগুলি মুখের উপর দিয়া আসিয়া পড়িয়াছে।

সারথির স্ত্রী ভিতর হইতে গলা চড়াইয়া বলিলেন—শেফী, বাবা বুঝি কারিগরী কথা কিছু ভাবছেন। এমন কত সময় বসে থাকেন। একটা কিছু ঠিকমত মনে না আসা অবধি এমনি বসে থাকবেন। মনে একবার এসে গেলে হাসতে হাসতে উঠে পাথর একখানা টেনে নিয়ে ঠুকঠাক শুরু করবেন। আজ তো এ নতুন নয়। যা, নট-অ ভাইকে বল্‌গে পঞ্চাশ টাকার কমে কোণার্কের ঘোড়ার মূর্তি বিক্রি হবে না। দু'শ টাকার কাজ পঞ্চাশ টাকায় দেওয়া হচ্ছে, টানাটানি চলেছে বলেই না। খদ্দেরই বা কই ?

শেফালী "আচ্ছা মা" বলিয়া বাহিরের দিকে ছুটিল।

সারথি ধ্যানস্তিমিত নয়ন খুলিয়া চারিদিকে চাহিলেন। তাঁর বড় আশ্চর্য বোধ হইতেছে—এ কেমন ফরমাশ! দীর্ঘ পঁচিশ বছরের শিল্পী জীবনে এমন কথা তো তিনি কখনও শোনেন নাই!

লোকেরা আসিয়াছে—ওড়িশার ভিতর হইতে, বাহির হইতে, বিশেষতঃ বাহির হইতে, ফরমাস করিয়াছে নানারকম মূর্তি, কিন্তু প্রত্যেকটি পূর্ণাঙ্গ। অথচ এই

ভদ্রলোক অগ্রিম দশটি টাকা দিয়া বলিতেছেন একটি অবলোকিতেশ্বর মূর্তি গড়িয়া দিতে, কিন্তু······

—মহাপাত্র মশায়, 'না' বলবেন না, এই দশটাকা আগাম রইল। অবলোকিতেশ্বর মূর্তিটি পূর্ণাঙ্গ হবে না, একটি পা আর একটি হাত এমনভাবে ভাঙ্গা থাকা চাই দেখলে যাতে মনে হয় যে কাল প্রভাবেই মূর্তিটি খণ্ডিত হস্তপদ। এই খুঁতটুকু এমনভাবে কাটবেন যে জেনে শুনে তা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে বা অপূর্ণ রাখা হয়েছে এমন যেন মনে না হয়।

সারথি বিস্মিত হইয়াছিলেন। অভিনব অনুরোধ বটে! শিল্পী খণ্ডিত মূর্তি গড়িয়া দিবে অর্থের বিনিময়ে!

অবশেষে সারথি হার মানিয়েছিলেন। দ্বিধাগ্রস্ত মনে হস্তপদখণ্ডিত একটি অবলোকিতেশ্বর মূর্তি গড়িয়া দিয়াছিলেন। কালপারাবারের প্রতিবিন্দুতে বহু অবলোকিতেশ্বর বহু বুদ্ধ ও প্রজ্ঞাপারমিতা মূর্তি ভাসিয়া গিয়াছে। নিশ্চিহ্ন বিস্মৃতিতে সারথি আজ দেহাবশেষ রাখিয়া গিয়াছেন। পথুরিআসাহি আজ সাহি মাত্র। সে শিল্পময় ধ্যানদৃষ্টি সে সাধনা ও কল্পনা আজকালের ঘন তমশায় অবলুপ্ত।

* * * * * *

গ্রন্থাগারের কর্মচারী শঙ্কিত বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া ব্যাপারটা বুঝিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও চোখ দুইটা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে মনে হইল তাঁর!

শহরের প্রখ্যাত গ্রন্থাগার কেবল প্রখ্যাত নয়, পুরাতন। সেই গ্রন্থাগারের ভিতরে দুই জনের মধ্যে নিম্নলিখিত রূপ কথাবার্তা চলিতেছিল। সময় রাত এগারটা। পাঠকেরা চলিয়া গিয়াছে।

—না না, এ হতে পারে না।

—কেন হতে পারে না? দেশের জন্যেই তো আমি এসব সংগ্রহ করছি, গবেষণার মত এক পবিত্র কাজের ভার নিয়েছি। এ পথে কেই বা পা বাড়িয়েছেন এর আগে? কেউ না। আমিই একা। কাজেই আমার প্রস্তাবে আপনি রাজি হলে আমি যে মোটা টাকাটা গবেষণার জন্য পেয়েছি তার কিছু আপনাকে দেব। আমার বেশী দরকার কতকগুলি অতি পুরাতন সংখ্যা, আর সেই সব সংখ্যার আর কোনও কপি যেন দ্বিতীয় ব্যক্তির হস্তগত না হয়। তবে এই কথা রইল। কাল রাত বারোটায় আসব। আপনি লাইব্রেরি খুলে রাখবেন। সব খুলবেন না, একটা দরজা শুধু। আমি একটা গরুর গাড়ী নিয়ে আসব।

—হ্যাঁ, গরুর গাড়ী?—কর্মচারীটি শিহরিয়া উঠিলেন।—গরুর গাড়ী কী হবে?

ভদ্রলোক বলিলেন—তা নয় তো কি আমি একখানি দু'খানির জন্য এসেছি? আমি চাই এই সুপ্রাচীন লব্ধ প্রতিষ্ঠ লাইব্রেরির সমস্ত সংবাদপত্র অপহরণ করে সে সবের মালিক হতে। সে সবের মধ্যে যা কিছু আছে তার উপর গবেষণা করে প্রবন্ধ ছাপাব। আর যা কিছু নেই তাও উলটো দিক থেকে 'এষণাগব' করে ছাপাব।

আর কারু কাছে কিছু থাকলে তবে তো প্রতিবাদ করবে? বুঝলেন তো, এই জন্যই গরুর গাড়ী আনব।

কর্মচারীর দুই চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম। একশ' টাকার লোভ ছাড়া যায় না। তাছাড়া কেই বা কেন সেই সকল মলিন কীটদষ্ট পুরাতন খবরের কাগজ পড়িতে আসিবে? এমন লক্ষ্মীছাড়া, অন্য কাজে অপটু কয়জন আছে? তবে গরুর গাড়ী আনিয়া বস্তা বোঝাই করিয়া কাগজ পাচার করার সময়ে ধরা পড়িয়া মাতুলালয় দর্শন সার না হয়। বরং অন্য উপায় আছে।

কর্মচারী বলিলেন—দেখুন, গরুর গাড়ী বা মোটর লরির কথা বাদ দিয়ে আপনি বরং রোজ রাত্রে একটি রিকশা নিয়ে আসুন। চারটি রাতে চারটি রিকশাতেই সব চলে যাবে।

প্রস্তাবটা গবেষকের পছন্দসই মনে হইল। তিনি রাজি হইলেন। বাহাদুরি করিয়া বলিলেন—বন্ধু, এ তো খবরের কাগজ। বড় বড় তথ্যসংবলিত গ্রন্থ থেকে বহু পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিয়ে এসেছি। জ্ঞানের প্রসার ও দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার জন্য এ চৌর্য অপরাধ নয়। সে সম্বন্ধে আমার কনশেন্স ক্লিয়ার আছে।

কর্মচারী প্রার্থনা জানাইলেন—আর কুড়িটি টাকা বাড়াবেন না?

গবেষক চিন্তা করিয়া বলিলেন—দেখুন, এতে আমার আর্থিক লাভ নেই। আচ্ছা বেশ, আর দশটা টাকা বেশী দিতে পারি। একশ' দশ বুঝলেন?

*   *   *   *   *   *

চারিদিকে ছাত্রেরা বসিয়া। গগনবাবু একটি বইয়ের কতকগুলি কপি তাদের ধরাইয়া দিয়াছেন। ছাত্রগণ কর্মনিরত।

গগনবাবু উৎসাহ দিয়া বলিলেন—বেশ, এবার আরম্ভ কর। গোন—।

একজন ছাত্র বলিল—কোন অক্ষরটা?

—আমার নামের প্রথমে যে অক্ষরটা আছে, 'গগনবিহারী'র গ অক্ষর।

অন্য এক ছাত্র বলিল—আজ্ঞে, ছয়শ' পৃষ্ঠার বইয়ের ভিতর গ অক্ষর কতবার আছে তার অন্ত নেই। তবে এমন মহৎ কাজে যখন আপনি ব্রতী হয়েছেন এবং এই অক্ষর গণনা প্রক্রিয়ার ভিতরে আপনার পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শন প্রকাশ পাবে বলে যখন আপনি মনে করছেন তখন আমরা এ কাজ করব। আপনি এই অক্ষর-গণনা নিয়ে কী করবেন?

গগনবিহারী হাসিয়া বলিলেন—আরে মূর্খ, কবি কতবার গ অক্ষর প্রয়োগ করেছেন প্রথমে তা ব'লে নিয়ে তারপর কেন গ অক্ষর প্রয়োগ করেছেন সেই গবেষণা করব। অতএব তোমরা গোন।

একটি রসিক ছাত্র গণনা-রসের ভয়াবহতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া করজোড়ে নিবেদন করিল—আজ্ঞে, এ বড় সাংঘাতিক কাজ। তবে আপনি আগে এই শুভকাজে মঙ্গলাচরণ করুন। চ বর্গের তৃতীয় অক্ষর, র-অক্ষরের পরের অক্ষর, ক-বর্গের অক্ষরে আ-কার দিয়ে যা হয়—আনান।

গবেষক হিসাব করিয়া দেখিলেন যে সাতটি ছাত্রের উদরপূর্তি ও রসনাতৃপ্তির জন্য আট আনা করিয়া সাড়ে তিনটি টাকা খরচ হইবে। তা হোক, গবেষণার কাজ তো আগাইবে। ডাকিলেন—পরমা, সাড়ে তিন টাকার জলখাবার আনবি, যা—শিগগির যা।

* * * * * *

বাস হইতে দুইজন নামিলেন। বাসের ভিতরে একে অন্যকে লক্ষ্য করেন নাই, বাহিরে আসিয়া পরম প্রীতিভরে কোলাকুলি করিলেন। একজন বলিলেন—কেমন চলেছে?

উত্তর পাইলেন—ভালই। তুমি ভূগর্ভবাসী, আমি কাগজের পোকা। আর একজন সে কেবল গণনায় ব্যাপৃত। কোষ্ঠীগণনা নয়, অক্ষর গণনা। এই তিনজনকে বাদ দিলে প্রত্নতাত্ত্বিক আর কেউ নেই।

প্রথম জন চামড়ার ব্যাগ খুলিয়া বাহির করিলেন একখানি নিমন্ত্রণ পত্র। বলিলেন—বন্ধু, তোমায় মনে মনে খুঁজছিলাম। এই নিমন্ত্রণপত্র নাও। নিশ্চয় আসবে। প্রাচী উপত্যকায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির আভাস পেয়েছি। গবেষকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে আমি যা বুঝছি প্রাচী নদীর ধারে যে চাকুন্দে গাছটি ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে তারই নীচে আছে বৌদ্ধ বিহার। আর ঐ চাকুন্দে গাছের বয়স প্রায় দশ বছর হবে। কারণ দশ বছর আগে ··না থাক্, এমনি বাস্-স্টপের কাছে দাঁড়িয়ে এ সব প্রাচীন তত্ত্ব বলতে পারব না। একটি ছোট খাট উৎসবের আয়োজন করেছি। মিউজিয়ম থেকে কিছু টাকা পাওয়া গেছে। দেশের বহু ইতিহাসবেত্তা আসবেন, তাঁদের সামনে আমি যুগযুগান্তের যবনিকা উন্মোচন ক'রে দেখিয়ে দেব যে প্রাচী উপত্যকায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। আমি তা সকলের গোচরে আনব। এই আমার বহু বিনিদ্র রজনীর গবেষণার ফল।

অপরজন উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—সাবাস বন্ধু! আর আমি কী করেছি জানো? আমিও দেখিয়ে দেব আমাদের সাহিত্যের দিক্‌পালেরা কে কেমন ডায়েরি রেখে গেছেন, আর সে ডায়েরি আমি ছাড়া আর কারও কাছে নেই। বড় বড় সাহিত্যেকেরা কোথা থেকে ইন্‌স্পিরেশন পেয়েছেন জানো? এ তথ্য আর কেউ জানে না।

প্রথম জন বলিলেন—কোত্থেকে?

—পায়খানায় ব'সে থেকে! পুরানো খবর-কাগজের মধ্যে এই সত্য নিহিত রয়েছে। কেউ পড়ে না দেখে আমি—

—বাঃ চমৎকার! সত্যি সত্যিই কি এ কথা ছাপা হয়েছে না তুমি গবেষকের দৃষ্টি দিয়ে জানতে পারলে?

—ছাপা আছাপা সব আমাদের বুঝে নিতে হয়। রাধানাথ, ফকীরমোহন ও গঙ্গাধর কাব্য উপন্যাস সৃষ্টি করবার বেগ পেয়েছিলেন বাহ্যকৃত্যের বেগ থেকে। এখনি সব কথা আমি প্রকাশ ক'রে বলব না। রাধানাথের 'উষা' 'চন্দ্রভাগা'

'ঋষিপ্রাণে দেবাবতরণ', ফকীরমোহনের 'রেবতী' 'মঙ্গরাজ'—এ সব সেই স্থান থেকেই এসেছে। তাঁদের ডায়েরির ভিতরে তাঁরাই এ কথা ব'লে গেছেন।

বৌদ্ধ সংস্কৃতির গবেষক প্রাচীন খবরের কাগজের মালিককে প্রীতি আলিঙ্গনে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—সাবাস্! আমরা তিনজনে দেশ ও জাতির জন্য যে কী অসাধ্য সাধন করছি তা দেশ এখন বঝলেই হয়! আচ্ছা, তবে আসি—বলিয়া তিনি বিদায় নিলেন।

সেদিন রাত্রি দুইটার সময় পুরাতন কাগজের মালিক লিখিতেছিলেন—

"প্রিস্টার সাহেব ১৯০৩ সালের ১:ই জুন তারিখের বেলা চারিটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট আড়াই সেকেণ্ড সময়ে বাথরুমে বসিয়া ভাবিতেছিলেন যে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় যে ওড়িয়া ব্যাকরণ ছাপা হইতেছিল তাহা শেষ হইয়াছে।

"ফকীরমোহনের কাঠের গুদামঘরে কাঠ চাপা পড়িয়া যে আজিনা-সাপটি ছটফট করিয়া মারা গিয়াছিল তার প্রেতাত্মা আসিয়া ফকীরমোহনকে বলিয়াছিল যে তিনিও ওড়িয়া সাহিত্য ও ভাষার জন্য তেমনি ছটফট করিবেন ও ১৯৫৮-৫৯ সালের গবেষক মহাশয়ের গুদামে চাপা পড়িয়া ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়িবেন।

"রাধানাথ রায়ের ভার্গবী নদীতীর হইতে দুই মাইল বাইশ গজ আধ ফুট সাড়ে তিনইঞ্চি দূরে অবস্থিত একটি এল্ পি স্কুল উদঘাটন করিবার সময়ে ভয়ানক কাশি উঠিয়াছিল। এই বিষয়টি তাঁহার 'মহাযাত্রা'র ভাবটিকে প্রাঞ্জল করিবে।

"কুন্তলাকুমারী পূর্বজন্মে অগ্নিমান্দ্য রোগে বিশেষ পীড়িত হওয়ায় এ জন্মে প্রতিশোধ মানসে তাঁর কবিতায় কেবলই অগ্নিবর্ষণ করিয়াছেন। এই তথ্যটিকে তাঁহার কাব্য বিচারে লাগাইলে ওড়িয়া সাহিত্যে তাঁহার স্থান প্রাঞ্জল হইবে।

'নিআঁ খুণ্টা'র 'ডামরা কাউ' (দাঁড় কাক) নন্দকিশোরের 'ডামরা কাউ'-এর পূর্বসুরী। উভয় ডামরা কাউ কতদূর উড়িতে পারিত ও কোথায় 'তিনি মঞ্জিকা' ও 'কউড়ি গণা' দেখিত তার একটি তুলনামূলক সমীক্ষা শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

"সম্বলপুর হইতে রওনা হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িয়া গঙ্গাধর আম গাছের তলা হইতে একটি টকটকে লাল আম কুড়াইয়া খাইয়া থাকায় তাঁহার সমস্ত কাব্য ও কবিতা রসাল হইয়াছিল। সেদিন তাঁহার উপবাস ছিল, তথাপি তিনি লোভ সামলাইতে পারেন নাই।"

হঠাৎ গবেষক কোন বিঘ্ন অনুভব করিলেন, তাঁহার লেখনী স্তব্ধ হইল। বিঘ্ন আর কিছুই না, তাঁর স্ত্রী রত্নমালী।

—ওগো শুনছ ?

—কি ?

—ও ছাই-পাঁশ কী লিখছ ?

—কেন ?—ও, তুমি এসে সব পড়ছ বুঝি! খবরদার, ছাই পাঁশ কি আর কিছু দেশবাসী বেশী বোঝে। এটুকু না হ'লে যত বড়ক বি আর লেখক হোন না কেন তাঁদের লেখার রস পরিস্ফুট হবে না!

—তাই নাকি ? দশম শ্রেণী অবধি পড়েছিলাম। আমাদের পণ্ডিতমশাই ভক্তচরণ আম খেতেন কি কাঁঠাল খেতেন তা বলতেন না, কিন্তু 'আরে বাবু শ্যাম-অ খন-অ' ছান্দটি দু'বার এমন করুণভাবে পড়তেন যে আমাদের চোখ থেকে টপ টপ ক'রে জল পড়ত। তাঁর পড়াবার ভঙ্গী এত চমৎকার ছিল, এত মধুর, এত করুণ ; তা কই কারও অগ্নিমান্দ্য রোগ ছিল কি না তা তো কখনও বলতেন না।

গবেষক বলিলেন—আহা, তখন কি গবেষণা হ'ত ? আজ না সে পথ খুলেছে। যাও যাও, দশম শ্রেণীতে কী দু'পাত পড়েছিলেন তাই—সাহস দেখ একবার ! সমস্ত পুরানো কাগজের একমাত্র মালিককে জবাব দেওয়া হচ্ছে !

—ওগো শোন, এ তুষের চাষ করছ কেন ? এসব কারা পড়ে ? রাধানাথের কাশি উঠেছিল ব'লে 'মহাযাত্রা' প্রাঞ্জল হয়ে গেল ? শোন গো—

—বল না, কী ?

—তুমি এসব ছেড়ে কবিতা লেখ গো। জীবনের কত আবেগ কত উচ্ছ্বাস ফুটবে তাতে।

—কী বললে ? কবিতা লিখব ? বলি, আমি পুরুষমানুষ না মেয়েমানুষ ? না ঐ মেনীমুখোদের মত নরম নরম নেকা নেকা কবিতা লিখব ?

—ওগো শোন, নয়তো উপন্যাস লেখ একটা। মানুষের জীবনের কত কথা, কত ব্যথা, আনন্দ, কত কী আছে তাতে। কত রসাল, কত করুণ। লেখ না গো, একটা উপন্যাস লেখ।

—থাম রত্নমালী। আমি জীবনে কখনো গল্প উপন্যাস পড়িনি, লেখা তো দূরে থাক। বুড়ী আই গল্প বলে, বুড়োরা গল্প করে। অশিক্ষিত লোক গাঁয়ের পথে ঘাটে গল্প করতে করতে যায়। এরা হ'ল গপ্পে ! এরা আর কিছু জানে না ব'লে গল্প উপন্যাস লেখে। ছি ছি—

—শোন গো, কত মনের প্রাণের কথা ওরা জানে বল তো ? তোমার লেখা প'ড়ে কারো কখনো চোখ ছল ছল ক'রে উঠবে ? কিন্তু ওদের লেখা পড়লে কত ভাব কত আনন্দ মনে আসে। অমনি লেখ না গো !

—রত্নমালী, আমায় বিরক্ত করো না। আমি ঐসব করতে গেলে আর দু'জন এগিয়ে যাবে, আমি পিছিয়ে পড়ব। একজন মাটির নিচেকার কথা জানতে পারছে। খোঁড়া নেই খুঁড়ি নেই সে বলছে প্রাচী নদীর উপত্যকায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি চাপা প'ড়ে আছে। আর একজন সে বইয়ের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট অক্ষর ক'বার পাওয়া যায় আর তা কেন এত বার লেখা হয়েছে এই নিয়ে গবেষণা করছে। এরা অমর হয়ে যাবে, রত্নমালী। আর আমি যদি তোমার ঐ মেয়েলী কথা শুনে ঐ সব হাসি-কান্না বিরহ-মিলন-কথা লিখতে বসি তবে আমি ম'রে গেলে আমার কথা কারও মনেই পড়বে না। তুমি যাও তো, দশম শ্রেণীর বিদ্যে আর জাহির করো না। বরঞ্চ শ্যাম-অ খন-অ গায়ন পদ্ধতিতে তোমার ছেলে কেশবানন্দকে আদর সোহাগ ক'রে চোখের জল ফেল গে, যাও।

*   *   *   *   *   *

বিরাট এক শামিয়ানার নিচে দেশের সুধী পণ্ডিত গবেষক ঐতিহাসিকগণ উপস্থিত। প্রাচী নদী তরুণী বধূর ন্যায় এত জনসমাগম দেখিয়া ফিক ফিক করিয়া হাসিয়া বহিয়া যাইতেছে। আজ দেশের শ্রেষ্ঠ গবেষক রহস্যের দ্বার উদঘাটন করিয়া দেখাইয়া দিবেন যে একদা প্রাচী নদীর তটে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ছিল—হাজার হাজার বৎসর আগে।

কাঠুরিয়ারা চাকুন্দে গাছটা কাটিয়া ফেলিয়া দিল, খনন কার্য চলিল। এদিকে পাবলিসিটি ভ্যান হইতে রেকর্ড বাজানো হইতেছিল। চায়ের ব্যবস্থাও ছিল।

গবেষক লোককান্ত আশা আনন্দ ও সাফল্যের এক প্রতিমূর্তি। সকলে তাহাকে সম্ভ্রম দেখাইতেছে—সত্য, কী বিরাট গবেষণা! কী আশ্চর্য দিব্যদৃষ্টি ইঁহার!

মোটে দশ হাত খোঁড়ার পরেই কে একজন চিৎকার করিয়া উঠিল—বেরিয়েছে, বেরিয়েছে!

—কি বেরিয়েছে?

—মূর্তি।

—মূর্তি?

—হাঁ, বৌদ্ধমূর্তি।

সকলে যে যার আসন ছাড়িয়া আগাইয়া আসিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ সেই উদ্বেলিত জনতাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বহু ফোটোগ্রাফার ক্যামেরা বাগাইয়া প্রস্তুত হইয়া গেলেন।

একজন কে বলিল—অবলোকিতেশ্বর মূর্তি। বাম পাদের অর্ধেক নেই। ডান হাতও খণ্ডিত।

আর একজন বলিল—হবে না? হাজার হাজার বছর আগেকার মূর্তি। মহাকালের যাত্রার বেগে একেবারে ধ্বংস না হয়ে এমনটা যে রয়েছে—মনে হয় প্রাচী নদীর মৃত্তিকাশয্যায় এটি আজ অবধি সুরক্ষিত হয়েছিল।

লোককান্ত তখন গাঁয়ের ভর হওয়া মানুষের মত কেবল টলিতেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। একটা সামান্য প্রদেশ ওড়িশা, সেখানে তিনি আর থাকিবেন না। পৃথিবীময় ঘুরিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করিবেন। সে জন্য সর্বত্র হইতে তিনি সাহায্য পাইবেন, তা তিনি জানিতেন। তিনি মস্ত লোক হইয়া গেলেন।

প্রাচী নদীর তটে বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

পুরীধামে স্বর্গদ্বারের শ্মশানে পথুরিআসাহির শিল্পী সারথি মহাপাত্রের মরদেহ কতকাল আগেই ভস্মীভূত হইয়া গেছে।

বেচারা চাকুন্দে গাছ! অবলোকিতেশ্বরের মাথার উপরে থাকিয়াও সে রক্ষা পাইল না। কাটিয়া ফেলা গাছটা প্রাচী নদীর স্রোতের মুখে ভাসিয়া গেল বড় অবাঞ্ছিত বড় অনাদৃতের মত।

প্রাণবন্ধু কর (1914—)

একজন বিশিষ্ট নাট্যকার। ওড়িশার আধুনিক নাট্য-সাহিত্য ও নাট্য-আন্দোলনে প্রাণবন্ধু অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত। বিষয়-বৈচিত্র্য, মঞ্চ-পরিকল্পনায় তিনি নানা সফল পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালিয়েছেন। প্রাণবন্ধুর নাটকে সংলাপ এক আকর্ষণীয় সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যরূপ গ্রহণ করেছে। তাঁর একাঙ্কিকা 'শ্বেতপদ্মা'-র বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। জীবনের ছোট ছোট ঘটনা মূর্ত হ'য়ে ওঠে তাঁর নাটকে।

গল্পকার হিসেবেও প্রাণবন্ধু সফল, তাঁর পরীক্ষা-নীরিক্ষা ওড়িয়া গল্পের জগতেও ঘটেছে। তাঁর গল্প সংকলন: 'প্রাণবন্ধুঙ্ক ক্ষুদ্রগল্প'।

নিশীথের প্রেতাত্মা

একটি ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস—ভারতের গণতন্ত্র শাসনের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের জন্য ছয়টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের কাজ শেষ করিয়া প্রিজাইডিং অফিসার বিশ্ববন্ধু কটকে ফিরিতেছে ইলেকশন ট্রাকে। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সে গিয়াছিল এবং ফিরিয়াছিল বাসযোগে, কিন্তু এবার দীর্ঘ একমাস ধরিয়া রোদে রোদে উঁচু-নিচু আবড়ো-খাবড়ো রাস্তায় ঝাঁকানি খাইয়া ঘুরিয়া আজ সেই মালবহা ট্রাকে করিয়া পোলিং পার্টির সহিত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ফিরিতেছে বিশ্ববন্ধু। সঙ্গে এই প্রথম সে রক্ত আমাশয় রোগ লইয়া আসিতেছে—তার জন্য ট্রাকটা পথে জল আছে এমন জায়গা দেখিয়া গোটা পনের বার থামিয়াছে। রাত দুইটা, চাঁদের আলো রাস্তার দুই পাশের ধানক্ষেতে বিছাইয়া পড়িয়া আছে। বিশ্ববন্ধু বসিয়াছে ড্রাইভারের পাশে, আর তার পোলিং পার্টির অন্যান্য সদস্যেরা ট্রাকের পাটাতনের মধ্যে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত মালপত্রের মধ্যে কোনো মতে ঠাসিয়া ঠুসিয়া বসিয়াছে। ট্রাক হঠাৎ খানা-খন্দে পড়িয়া যখন উঠিতেছে, তাহাদের দেহগুলি ট্রাকের পাটাতন হইতে হাতখানিক শূন্যে উঠিয়া আবার যথাস্থানে ফিরিবার সময় তাহাদের মুখে যে কাতর ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে তা ইলেকশন কর্মকর্তাদের চোখে পড়িতে পাইতেছে না বলিয়া বিশ্ববন্ধুর মনে বড়ই ক্ষোভ হইতেছে। রোদের দাপট হইতে পোলিং কর্মচারীদের বাঁচাইবার জন্য বাখারির ফ্রেমের উপরে তেরপল ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইলেকশনের কাজে শুভযাত্রার পূর্ব দিন যখন খোলা ট্রাকের উপরে এই তেরপলের ছাদ তৈরির কাজ চলিতেছিল তখন কৌতূহলবশে বস্তির পক্কশ্মশ্রু বসির মিঞা হইতে

আরম্ভ করিয়া চার বছরের শিশু পর্যন্ত সকলে ট্রাকের চারিদিকে জমা হইয়া গিয়াছিল। বস্তির লোকেদের উৎসুক দৃষ্টি ট্রাকের এই আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী পদোন্নতির প্রতি কটাক্ষ ভাবিয়া শিখ ড্রাইভার অজিত সিং কী এক প্রকার অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল, সুতরাং তাহাদের ভিড় বাড়িতে দেখিয়া সে তাহাদের হটাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কটকী বস্তির ছেলে তাহারা, সহজে হটিবার পাত্র নয়।

জানালার পাশে বিশ্ববন্ধুর স্ত্রী অঞ্জলি স্মিত হাসিয়া ট্রাকের এই সৌভাগ্য লক্ষ্য করিতেছিল, বিশ্ববন্ধু তা দেখিতে পাইয়া বলিল—এই ট্রাকে আমাদের বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে শ' শ' মাইল, ছয় ছয়টা বুথে কাজ করতে হবে—

—মন্দ কি? ইটকাঠের বদলে তোমাদেরই বয়ে নিয়ে যাবে, অঞ্জলি পরিহাসের সুরে বলিল।

—সত্যি, রিটার্নিং অফিসার যে আমাদের ইট কাঠের সামিল করলেন কেমন ক'রে, ভেবে পাওয়া দায়।

—কেন ভেবে পাওয়া দায়? ভোটের কাজটা কি দেশের কাজ নয়? তার জন্য স্বার্থ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে হবে।

অঞ্জলির এ প্রকার মন্তব্য বিশ্ববন্ধু আশা করে নাই, আহত হইয়া বলিল—লাভ?

—লাভ নেই বলছ? খুব লাভ আছে। দেখতে পাচ্ছনা যাঁরা ব্রিটিশ সরকারের আমলে দেশের কংগ্রেস নেতাদের জেলে ঠুকে গোরা সাহেবদের কাছ থেকে বাহবা পেতেন তাঁরা এখন রাজদত্ত উপাধি ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে খদ্দর পরে মোটর চড়ে বেড়াচ্ছেন বলে দেশের লোক তাঁদের কেমন মাথায় ক'রে রেখেছে? দেখছ না তাঁদের মহৎ স্বার্থত্যাগে দেশবাসী কেমন মুগ্ধ?

—আমার তবে অমনি কিছু লাভ হবে বলছ, অঞ্জলি?

—সে ধরণের লাভ না হতে পারে, তবে ইলেকশন থেকে ফিরে এলে অন্ততঃ আমাশা ইনফ্লুএনজা টাইফয়েড লাভ হবে তো!

বিশ্ববন্ধু অঞ্জলির বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হইয়া বলিল—অঞ্জলি, বি. এ. পাস করে আমায় বিয়ে না ক'রে তুমি রাজনীতি করলে এতদিনে মন্ত্রী হয়ে যেতে।

অঞ্জলি ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল—ভুল হয়ে গেছে। তখন ভেবেছিলাম মন্ত্রিত্ব পাওয়া সহজ কিন্তু তোমায় পাওয়া সহজ নয়।

বিশ্ববন্ধু বলিল—এখনও তো সে ভুলটা ঠিক ক'রে নিতে পার? তোমার বুদ্ধি আছে, বিয়ের ষোল বছর পরেও রূপে মরচে পড়েনি—

অঞ্জলি বিশ্ববন্ধুর কথাটা মানিয়া নেওয়ার মত ভাব দেখাইয়া বলিল—মন্দ হ'ত না। রাণী এলিজাবেথ কোনো উৎসবে যোগ দেওয়ার সময় ডিউক অব্ এডিনবরা যেমন তাঁর পিছন পিছন চলেন আর তাঁর পিছনে তাঁদের ছেলেপেলেরা, তেমনি আমি সভাসমিতি বা উৎসবে যোগ দেওয়ার সময় আমার পিছন পিছন ছেলেদের নিয়ে তুমিও চলতে, কিংবা আমি যদি তোমার ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী হতাম তবে আমায় দিনরাত হাত জোড় ক'রে থাকতে।

বিশ্ববন্ধু হাসিয়া বলিল—কিন্তু মাডাম, এভ্রি ডগ হ্যাজ্ হিজ্ ডে। ঘরে ফিরে আসার পর প্রিন্স অ্যালবার্টের রাণী ভিক্টোরিয়াকে শাস্তি দেওয়ার মত আমিও তোমাকে শাস্তি দিতাম—বুঝলে ?

অঞ্জলি ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল—ইস্. চাকরির ভয় নেই ? সঙ্গে সঙ্গে অফিসে গিয়ে ডিস্‌মিসের অর্ডার—!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভারী ডিস্‌মিস্ করনেওয়ালী। পাঁচ বছর পরে যদি আবার অ্যাসেমব্লিতে নির্বাচিত হয়ে আসতে না পারতে তখন তোমার মজাটা বেরিয়ে যেত।

স্বামী-স্ত্রীর এই মধুরালাপে বাধা দিয়া শিখ ড্রাইভার আসিয়া বলিল—জী, হো গিয়া।

বিশ্ববন্ধু দেখিল ট্রাকের ভোল বদলাইয়া গিয়াছে। ট্রাকের উপরে তেরপলটা খাটানো হইবার পর ছাদটা গরুর গাড়ীর তালপাতা বা দরমার গোল ছইয়ের মত দেখাইতেছে, কিন্তু গরুর গাড়ী নহে কি মোটর বাস্ নহে—পশুও নহে, পাখীও নহে। ট্রাকের পিছন দিকে দুই পাশে ও সম্মুখে ছাপার অক্ষরে ইংরাজী হরফে 'অন্ ইলেকশন ডিউটি' ও 'পার্টি নং ৫০০'-লেখা কাগজ কয়খানি সাঁটিয়া দিয়া ড্রাইভার ট্রাকের মান মর্যাদা বাড়াইতে যথেষ্ট কোসিস্ করিয়াছে।

আজ সেই ট্রাকখানি জ্যোৎস্না রাত্রিতে ফিরিতেছে। যাইবার সময় ট্রাকের এবং পোলিং কর্মচারিদের যে সতেজ ভাব ছিল ফিরিবার সময় আর তাহা নাই। মাটির রাস্তায় ক্রমাগত মাইলের পর মাইল উঠিয়া পড়িয়া চলিতে চলিতে তেরপলের ছাদটি এখন একটা তোবড়ানো আমের মত দেখাইতেছে। ট্রাক আসিয়া বড়চনা পুলিস্ স্টেশনের সামনে দাঁড়াইল। বিশ্ববন্ধু দেখিল একটা মাঠে অনেকগুলি পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বলিতেছে—দোলযাত্রার মেলা। পোলিং অফিসারগণ বলিলেন—সার্, আমরা একটু মেলা দেখব।

বিশ্ববন্ধু সঙ্গে সঙ্গে রাজি হইয়া বলিল—এখানে কাছে পিঠে পুকুর কি ডোবা আছে কোথাও ?

ট্রাক রাস্তার ধারে রহিল, পোলিং পার্টি ও পুলিস পার্টি মেলা দেখিতে গেলেন। আর প্রিজাইডিং অফিসার জামা-জোড়া খুলিয়া বাহির হইলেন মাঠের খোঁজে।

কতক সুস্থ হইয়া বিশ্ববন্ধু ফিরিয়া আসিল ট্রাকের কাছে, কিন্তু যাহা দেখিল তাহাতে সে বিস্মিত হইল।

ট্রাকের বাঁ পাশে সামনের চাকা ও পিছনের চাকার মাঝখানে একটি লোক বসিয়া আছে। বিশ্ববন্ধু ভাবিয়া পাইল না কি উদ্দেশ্যে একটা লোক ট্রাকের নীচে বসিতে পারে। ট্রাকের নীচে অন্ধকার, লোকটির গায়ের রঙও কালো, তার ছেঁড়া ময়লা কাপড়ও এমন যে ঠাহর করা যায় না একটা লোক বসিয়া আছে ট্রাকের তলায়। সেখানে তার উপস্থিতি কেউ যদি না জানিতে পারিত ট্রাক চলিতে আরম্ভ করিলে লোকটা নিশ্চয়ই মরিত। তারপর ইনকোয়ারি—ইলেকশন পার্টি নং ৫০০-র ট্রাক

একটি ভিখারীকে চাপা দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে—ইত্যাদি। কেহই বুঝিতে পারিত না আসল ব্যাপারটা কী। ড্রাইভার হতবাক্ হইয়া ভাবিত কখন লোকটাকে ট্রাক চাপা দিল! প্রিজাইডিং অফিসার বিশ্ববন্ধুও অবাক্ হইয়া ঠিক সেই কথাই ভাবিত।

বিরক্তির স্বরে বিশ্ববন্ধু জিজ্ঞাসিল—কে রে ওখানে গাড়ীর নীচে বসে?

লোকটি নিরুত্তর। ঘাড় নিচু করিয়া সে বসিয়া রহিল চিন্তাশীল দার্শনিকের মত। বিশ্ববন্ধুর গলা পঞ্চমে উঠিল, তথাপি লোকটি বসিয়া রহিল ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের ন্যায়।

সপ্তমে উঠিল বিশ্ববন্ধুর গলা—আরে কে ওখানে ব'সে, কথা বলতে পার না?

এক বৃদ্ধের ক্ষীণ কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠস্বরে উত্তর আসিল—আমি বসে আছি।

নির্ভয় নিঃসঙ্কোচ দু' কথায় উত্তর।

—'আমি' কে? কে তুই?

বৃদ্ধ আবার বলিল—চোর ছ্যাঁচড় নই বাবু। আপনি কেন এমন রাগ করছ?

বিশ্ববন্ধুর চিৎকারে গাঁয়ের কতকগুলি লোক আসিয়া জড় হইল। একটি ছোট ছেলে বলিল—আরে ও, এ তো চইঁ জেনা কুঠে।

—ট্রাকের নীচে গিয়ে ব'সে আছে কেন?—ছেলেটির দিকে চাহিয়া শুধাইল বিশ্ববন্ধু।

—আমি জানি না।

আর একজন গ্রামবাসী বলিল—আজ্ঞে, কুঠেটা বড় কষ্ট পাচ্ছে, মোটরের তলায় প্রাণ দিতে চায় বুঝি বা।

বিশ্ববন্ধু চইঁ জেনার দিকে তাকাইয়া বলিল—এই, চ'লে আয় ওখান থেকে।

বলিয়া বিশ্ববন্ধু অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু চইঁ জেনার বিচলিত হইবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। লোকেদের ভিতর হইতে এক বুড়া বলিল—কিরে চইঁআ, আসিস্ না কেন? বাবুর দেরি হয়ে যাচ্ছে, মোটর ছাড়বে।

—ছাড়ুন না মোটর, আমি কি মানা করেছি?

—কেমন ক'রে ছাড়বেন, তুই ওর তলায় শুয়ে আছিস্ না?—মোটরের ধুরা আঁকড়ে ধ'রে?

—আমি এই ধুরার উপর চেপেই মোটরে ক'রে চ'লে যাব একটু।

রাগিয়া গিয়া বিশ্ববন্ধু বলিল—কোথায় চ'লে যাবি?

—ছতিআ[১]।

—ধুরার উপর চেপে গেলে প'ড়ে যাবি, মরে যাবি।

—আচ্ছা বাবু, মরলে মরব। বেঁচে কী লাভ হচ্ছে?

বিশ্ববন্ধু হতাশভাবে গ্রামবাসীদের দিকে তাকাইয়া বলিল—বড় মুসকিলের কথা হ'ল। আমরা এখন যাই কেমন করে? এ বুড়োর আর কে আছে?

---

১. ছাতিআ—কটক জেলায় বিখ্যাত প্রাচীন বটগাছের নিকটস্থ অর্বাচীন কালের শৈব পীঠস্থান, সেখানে দেবতা জাগ্রত এই প্রসিদ্ধি।

পূর্বোক্ত বৃদ্ধ বলিল—ওর আর কেউ নেই। ছেলে মারা যাবার পর ছেলের বউ তো আর এক জনকে দুতীয়[২] ক'রে চ'লে গেছে।

বিশ্ববন্ধু পকেট হইতে একটা আধুলি বাহির করিয়া চইঁ জেনাকে দিতে গেল। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে বলিল—ও আমার কী হবে বাবু, আমায় কেবল একটু ছতিআ বটে পৌঁছে দাও।

চইঁ জেনার কণ্ঠে অনুনয় ছিল না, ছিল দাবী। বলিল—কত বাবু এই পথে মোটরে চেপে গেছেন, কত কাকুতি মিনতি ক'রে বললুম আমায় একটু ছতিআ পৌঁছে দাও, মোটরের নীচে চেপেই চ'লে যাব—তা কেউ কিছু শুনল!

বিশ্ববন্ধু বুঝিতে পারিল যে শেষ উপায় হিসাবে চইঁ জেনা আর কারও অপেক্ষা না রাখিয়া ট্রাকের অ্যাক্সেল আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া আছে। সে জানে তাহাকে কেহ ছুঁইতে সাহস করিবে না।

ধমক দিয়া বিশ্ববন্ধু কহিল—তুই যদি গাড়ীর তলা থেকে না বেরোস্ তবে পুলিস ডেকে তোকে বার করাব।

চইঁ জেনা অতি নির্বিকারভাবে কথা শুনিয়া গেল।

অজিত সিং ড্রাইভার মেলা দেখিয়া ফিরিল। বিশ্ববন্ধু তাহাকে টর্চটা আনিতে বলিল।

টর্চের আলোয় চইঁ জেনার বিকল অঙ্গ আলোকিত হইল। শিহরিয়া উঠিল বিশ্ববন্ধু। রক্তহীন চোপসানো মুখে বিদ্রোহের দৃঢ় সঙ্কেত। তার টুঁটো হাত দুইটা গাড়ীর চাকার অ্যাক্সেলে আঠার মত লাগিয়া রহিয়াছে। অজিত সিং ঘৃণায় নাক সিটকাইয়া তার নিজস্ব ওড়িয়ায় বলিল—ইয়ে তো জী এক কোঢ়িআ অছি। —আব্বে এ লেঙ্গড়া, উহাঁ বসিকরি কণ করুছু, চাল্—নিকল্।

বিশ্ববন্ধু ড্রাইভারকে ইশারায় চইঁ জেনাকে গালি দিতে বারণ করিল।

—এ বুড়ো আমাদের বিপদে ফেলবে দেখছি। আচ্ছা, দেখা যাক কী হয়।—ড্রাইভার, তুমি যাও মেলা থেকে আর সবাইকে ডেকে আন। বুড়োকে মারধর গালিগালাজ কিছু করোনা। আমি আসছি।—এই বলিয়া আশঙ্কাগ্রস্ত বিশ্ববন্ধু তাড়াতাড়ি করিয়া ডোবার দিকে চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিল ট্রাকের কাছে একটি কনস্টেবল ভিন্ন আর কেহ নাই, কিন্তু চইঁ জেনার কোনও স্থান পরিবর্তন হয় নাই। যথাসম্ভব নিকটে গিয়া বিশ্ববন্ধু বলিল—ও চইঁ জেনা, আয়, চাকার নিচে থেকে বেরিয়ে আয়। একটা টাকা দিচ্ছি, এই নে। কেন আমাদের এমনি হয়রান করছিস্ বলতো? আয়, বেরিয়ে আয়—নইলে পুলিস এসে তোকে মারধর করবে।

নির্ভীকভাবে চইঁ জেনা উত্তর দিল—আমি কী করছি যে পুলিস আমায় মারবে? আমি একটু এর উপর চেপে ছতিআ পর্যন্ত চ'লে যাব।

---

২. দুতীয়—স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বিবাহ, কতক বর্ণেতর হিন্দু জাতির মধ্যে প্রচলিত।

—ছতিআ কেন যাবি বল্ তো ?

—ছতিআ বটের থানে হত্যে দেব।

হাত পা খসিয়া ঠুঁটো হওয়ার পরেও চইঁ জেনা হত্যা দিবে। চইঁ জেনা এখনও ভাবিতেছে তার আবার হাত পা গজাইবে। বিশ্ববন্ধুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

সে জিজ্ঞাসা করিল—যখন হাঁটতে চলতে পারতিস্ তখন কেন ছতিআ বটে চলে গেলি না ? মোটে তো ছ' সাত মাইল পথ।

সেই অন্ধকারের মধ্যেও চইঁ জেনার বিদ্রোহী চক্ষু দুইটি যেন জ্বলিয়া উঠিল বলিয়া মনে হইল। বলিল—আমি যেতে পারতুম, তবে কিনা এই ধোপদুরস্ত বাবুদের জন্যে যেতে পারলুম না। পাঁচ বছর আগে আমার অঙ্গে এই ব্যামো বেরুল। সারা গায়ে দাগ দাগ হয়ে গেল। নাক কান ফুলে উঠল। সবাই আমায় বললে—ছতিআ বটের থানে হত্যে দিলে ভাল হয়ে যাবি, বড় পেতাক্ষ ঠাকুর। সে বছরও এমনি ভোটাভুটির কাজ চলছিল। এই বছরের মত তখন কত বাবু এসে গাঁয়ে সভা ক'রে তাঁদের ভোট দিতে বললে। যেদিন আমাদের এখানে ভোট হবে সেদিন সকালে আমি বেরুলুম ছতিআ বটে। আমার নাম ভোটের কাগজে ছিল, তা আমার তো অসুখ শরীর ভোটের কথায় আমার কিবে কাজ। লাঠি এক গাছ নিয়ে পায়ে পায়ে চলেছি, এক শহুরে বাবু এসে বললে—কিরে বুড়ো, ভোট দিতে বেরিয়েছিস্ ? কোন বাক্সয় দিবি ? আমি বললুম, বাবু আমি ভোট দিতে যাচ্ছি না, আমার তা দিয়ে কী হবে ? আমি যাচ্ছি ছতিআ বট।

তাতে সে বাবু বললে—ছতিআ যাচ্ছিস্ কেন ?

বললুম—আমার মহাব্যাধি হয়েছে বাবু, হত্যে দেব, ঠাকুর ভাল ক'রে দেবেন।

বাবুটি চেঁচিয়ে হেসে উঠে বললে—আরে, ঠাকুর যদি রোগ ভাল ক'রে দিতেন তবে আর ডাক্তার কবরেজ থাকত কেন ? আজকাল এমনি বড় রোগের কটকে গিয়ে চিকিচ্ছে করালে ভাল হয়ে যাবি।

আমি বললুম—কোথায় কটক বাবু, আর কোথায় বা আমি।

বাবু বললে—আরে, আমি নিয়ে যাব। তুই চল্, আগে ভোট দিবি। শোন্, তুই কলার ছবিআলা বাক্সে ভোট দিবি, বুঝলি তো ? আমাদের পার্টি সরকার গড়লে পর দেশের কত উপকার করব আমরা। আমাদের গাঁয়ে বস্তিতে যত কুঠে আছে তাদের তো আগে ভাল করব ওষুধ খাইয়ে। তুই তো দুটো মাসে ভাল হয়ে যাবি। মিছে কেন ছতিয়া বটে না খেয়ে না দেয়ে হত্যে দিয়ে প'ড়ে থাকবি বল্‌তো ? কিছু ফল হবে না।

আমি শুধালুম—বাবু, আমি নিশ্চয় ভাল হয়ে যাব ?

বাবু বললে গা—আমি কি তোকে মিছে বলছি ? দেখবি তখন, আমি তোকে নিজে এসে মোটরে ক'রে কটক নিয়ে যাব। চল্ চল্, সকাল সকাল ভোট দিয়ে আসবি চল্।

বললুম—বাবু, আমি কুঠে, আমায় ওখান থেকে তাড়িয়ে দেবে।

বাবু বললে—কে তাড়িয়ে দেয় আমি দেখব। কুঠে কি ভোট দিতে পারবে না ব'লে আইনে আছে? আয় আমার সঙ্গে চল্, আমি সব সুবিধে ক'রে দেব।

আমি সে বাবুর সঙ্গে গেলুম ভোট দিতে। যে বাক্সের গায়ে কলার ছবি ছিল সেই বাক্সে ভোটের কাগজ গলিয়ে দিয়ে এলুম। বাইরে সে বাবু ছিল। এসে তাকে বললুম। তিনি ভারী খুশী হয়ে বললে—যা বুড়ো, ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্তে খেয়ে দেয়ে বসে থাক্, এই ভোটের কাজ ফুরুলে আমি তোকে নিজে এসে কটকে বড় ডাক্তারখানায় নিয়ে যাব—মোটরে চড়িয়ে।

সেই বাবুর কথা সত্যি মেনে আমি ঘরে ব'সে রইলুম, ছতিআ গেলুম না। ভোটের কাজ ফুরুল, এক মাস গেল, দু' মাস গেল, কোথায় সে বাবু, দেখা নেই। চেয়ে বসেই থাকি—বাবু আসবে, আমায় কটক নিয়ে গিয়ে ভাল ক'রে দেবে। এক বছর গেল। শেষে আমার হাঁটুতে বাতে ধরলে আর উঠতে বসতে পারি না। কেউ চারটি দিলে তবে খাই, না দিলে যেখানে ব'সে আছি তো সেইখানেই ব'সে আছি। সে বাবু আমায় কলা ধরিয়ে দিয়ে গেল গা।

মাঠে ঠাকুর মেলন চলিয়াছে। নিশীথ রাত্রি কাঁপাইয়া ঘণ্টা ও বাজনার শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে—বিশ্ববন্ধু রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনিয়া যাইতেছে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত জীবনের একটি করুণ অধ্যায়।

চইঁ জেনা দম লইবার জন্য থামিল—কিন্তু বিশ্ববন্ধু তবু শুনিতেছে, শুনিতেছে এমনি কত দুঃস্থকে এমনি ভুয়া আশ্বাসবাণী শুনাইয়া ভোটপ্রয়াসীরা তাদের কাছ হইতে ভোট আদায়ের চেষ্টায় পরিপ্রচার চালাইতেছে······গলার সব ক'টা শিরা ফুলাইয়া প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়া যেন তাহারা বক্তৃতা করিয়া ফিরিতেছে, স্বার্থত্যাগের বিরাট প্রতীক সাজিয়া জনতার সামনে দাঁড়াইয়া রাবড়ির মত ঘন মিঠা কথা কহিতেছে।

বিশ্ববন্ধু চইঁ জেনার দিকে চাহিয়া তার উপরে টর্চের আলো ফেলিল। দেখিল চইঁ জেনা তার কথা বলিয়া দিয়া যেন খুব নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে। চাকার অ্যাক্সেলে চড়িয়া দুতিআ যাইবার দাবী যেন তাহার কায়েম হইয়া গিয়াছে।

বিশ্ববন্ধুর ইচ্ছা হইল তাহাকে ট্রাকে চড়াইয়া দুতিআ পর্যন্ত লইয়া যায়—কিন্তু তাই বা কিরূপে সম্ভব? পোলিং পার্টি ও পুলিস পার্টি নিশ্চয় আপত্তি করিবে।

পোলিং পার্টির সকলে মেলা দেখিয়া ফিরিল। ড্রাইভারের কাছে তাহারা সব কথা শুনিয়াছে।

চইঁ জেনার উপরে চোটপাট শুরু হইল। তারপর গালিগালাজ—শালা হইতে হারামজাদা পর্যন্ত—কিন্তু কুঠে চইঁ জেনা নির্বিকার, সে জানে তাহাকে সেখান হইতে ধরিয়া উঠাইতে কেহ সাহস করিবে না, তাকে ছুঁইতে ভয় পাইবে, বিষধর সাপের চাইতে সে আরো ভয়ঙ্কর।

চইঁ জেনা যেমন করিয়া হোক ছতিআ যাইবে, আজ আর সে কলা ধরিতে চাহে না।

কাজেই সকলে মিলিয়া ঠিক করিল একটা বাঁশের লগা দিয়া খুঁচাইয়া তাহাকে বাহির করিবে। তাহাদের এ সিদ্ধান্ত শুনিয়া বিশ্ববন্ধু চমকিয়া উঠিয়া বলিল—অ্যাঁ, বলেন কী আপনারা? খুঁচিয়ে বার করবেন?

একজন পোলিং অফিসার বলিলেন—আর উপায় কী?

—অসম্ভব, তা হয় না—বিশ্ববন্ধু দৃঢ় কর্কশ কণ্ঠে বলিল।

—তবে কি এইখানে এমনি প'ড়ে থাকতে হবে আপনি বলেন? এ তো আচ্ছা ব্যাপার হ'ল দেখছি!

—কিন্তু তাই ব'লে খোঁচাখুঁচি ক'রে ওকে ওখান থেকে বার করবেন? ও কি কুকুর না বেড়াল? আমি বাস্তবিক ভেবে পাচ্ছি না কেমন করে আপনারা এমন কথা মনে আনতে পারেন।

আর একজন পোলিং অফিসার বিরক্ত হইয়া বলিলেন- বেশ, আপনার তাহলে যা ভাল মনে হয় করুন।

সবাই চুপ করিল। বিশ্ববন্ধু বুঝিতে পারিল অনেকগুলি মনের পুঞ্জীভূত বিরক্তি ও অসন্তোষ তাহার উপরে উজাড় হইয়া পড়িতেছে। অস্তগামী চাঁদের মলিন আলোয় সে দেখিতে পাইল কতকগুলি বিরস, নিশ্চল, অবরুদ্ধ সমালোচনার বিষবাষ্পে বিকৃত মুখ।

বিশ্ববন্ধু কৌশলে তাহাদের দূরে ডাকিয়া নিল। তাহাদের সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিল। তাহাদের বুঝাইবার অনেক চেষ্টা করিল—ধৈর্য ধরিতে বলিল, কিন্তু তাহাদের সেই এক কথা—পুলিস আসিয়া তাহাকে বাঁশ দিয়া খুঁচাইয়া না উঠাইলে সেখান হইতে ট্রাক লইয়া যাইবার উপায় নাই।

শেষে নিরুপায় হইয়া বিশ্ববন্ধু অজিত সিংকে ডাকিয়া তার সহিত কি কথাবার্তা বলিল।

তারপরে চই জেনাকে আসিয়া অতি কোমল কণ্ঠে বলিল—আচ্ছা, তুই বেরিয়ে আয় বুড়ো, আমরা তোকে গাড়ীতে চড়িয়ে নিয়ে যাব।

বাহির হইবার কোনও আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া চই জেনা বলিল—তুমি মিছে কথা বলছ, বাবু।

—আমি সত্যি বলছি রে, তুই যাবি আমাদের সঙ্গে।

—হ্যাঁ, আমি কুঠে, সারা গা ঘায়ে ভরতি, আমায় আবার তোমরা সঙ্গে বসিয়ে নিয়ে যাবে!

অন্যান্য পোলিং অফিসাররা বিশ্ববন্ধুর এই অদ্ভুত মীমাংসা শুনিয়া অবাক হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল।

বিশ্ববন্ধু আদেশের ভঙ্গীতে একজন কর্মচারীকে বলিল—আপনি উঠুন তো ট্রাকের উপরে, জিনিষপত্র সরিয়ে বুড়োর জন্য একটু জায়গা ক'রে দিন। যান যান, উঠুন।

চই জেনা দেখিল একজন বাবু ট্রাকের উপরে উঠিল, জিনিসপত্রের ধুপধাপ শব্দ হইল।

বিশ্ববন্ধু চই জেনাকে ডাকিল—আয় বুড়ো, মোটরে উঠবি আয়।

—আমায় ওর উপর তুলে দেবে কে ?

—আমি তুলে দেব। তুই আয়, দেখ আমি তোকে তুলে দিই কিনা।

চই জেনা মাথা তুলিয়া বিশ্ববন্ধুর মুখের দিকে চাহিল। তার মুখে কী দেখিল কে জানে, ধীরে ধীরে ট্রাকের তলা হইতে বাহির হইল। যেন যুগযুগান্তরের এক বিক্ষুব্ধ প্রেতাত্মা হঠাৎ তার দেহে আধার লাভ করিয়া পুলকচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

বিশ্ববন্ধু দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অন্য কর্মচারীরা উত্যক্ত হইয়া উঠিয়া নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করিতেছে। চই জেনা ঘষটাইয়া ঘষটাইয়া ট্রাক হইতে হাত তিনেক দূরে আসিয়া বিশ্ববন্ধুর দিকে চাহিয়া হাত তুলিয়া অতিশয় পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বলিল—দাও বাবু, আমাকে মোটরের উপরে তুলে দাও—তোমার বাবু কত—

চই জেনার বাক্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া ট্রাক ঘর্ঘর শব্দে সেখান হইতে চলিয়া গেল প্রায় একশ' হাত দূরে।

চই জেনার হাত দুইটা নামিয়া পড়িল। বিশ্ববন্ধু বিস্মিত কর্মচারীদের দিকে চাহিয়া বলিল—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, যান ট্রাকে উঠুন।

সকলে সেখান হইতে চলিয়া গেল নীরবে। বিশ্ববন্ধু লজ্জিত মুখে চই জেনার দিকে তাকাইল। মুখ নিচু করিয়া চই জেনা বলিল ক্ষীণ কণ্ঠে—

—আমি জানতুম তুমি আমায় ঠকাবে—আচ্ছা, যাও।

বিশ্ববন্ধু মাথা নিচু করিয়া ট্রাকের কাছে গিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল—

দেখিল—চই জেনা স্থিরভাবে বসিয়া আছে, একটা অস্পষ্ট কালো মূর্তির মত।

বিক্ষুব্ধ প্রেতাত্মা আবার সে ঘট পরিত্যাগ করিয়াছে।

নিত্যানন্দ মহাপাত্র (1912–   )

বালেশ্বর জেলার ভদ্রকে এক কবি-পরিবারে নিত্যানন্দের জন্ম। কান্ত কবি লক্ষীকান্ত তাঁর পিতা। নিত্যানন্দ একাধারে গল্পকার, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক, সমাজবিদ ও রাজনীতিজ্ঞ। 'ডগর' সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বহুদিন। কিছুদিন তিনি রাজ্যের সরবরাহ ও সাংস্কৃতিক বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। আধুনিক জীবনের মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাঁর রচনার বিষয়বস্তু। দু'টি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ: 'ধলা গার কলা গার', 'ক্ষণিকা'। বিশিষ্ট উপন্যাস: 'হিড়মাটি' 'ভঙ্গাহাড়', 'পীরতি পথ খসড়া', 'জীয়ন্তা মণিষ'। কাব্যগ্রন্থ: 'মরম', 'পাঞ্চজন্য'।

অকালের মেঘ

খঞ্জনি বাজিয়ে গান গেয়ে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষে মেগে বেড়ায়। সকালবেলা সেই যে যায় একেবারে বেলা পড়লে গিয়ে আমাদের গাঁয়ের ওদিকটায় যে ফাঁসি দেওয়া বটগাছ আছে না, সেইখানে সেই গাছের তলায় এসে বসে। একটু দূরে যে শিব মন্দিরটা, হিমে বিষ্টিতে সেই তার নিঠুর দরদী। আর রোদের দিনে কী দিন কী রাত—ঐ গাছতলা। ঐখানে ব'সে মন্দিরের দক্ষিণে যে চুয়াটা আছে কত সময় সেই দিকে চেয়ে ব'সে থাকে। সূর্যের তেজে যেমন ঐ চুয়া থেকে ধোঁয়ার মত একটু একটু ক'রে জলের প্রাণ বেরিয়ে যেতে থাকে তেমনি—ঠিক তেমনি—সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি তার সিক্ত কণ্ঠের রিক্তরাগিনী অজানা রাজ্যের অসীম সরণীতে লীন হতে থাকে। যে বোঝে সে গান, তার বুক যেন চৌচির হয়ে ফেটে যায় পলি-মাটির ভুঁইয়ের মত।

পাঁচমিশালী চাল চারটি যেমন তেমন ক'রে ফুটিয়ে, মেগে যেচে আনা পোকাধরা বেগুন ভাতে দিয়ে সেদিন সে খাঁ খাঁ দুপুরে ব'সে খাচ্ছে। মনটা তার অকারণে কেমন ফুটন্ত ফেনের মত টগবগ ক'রে উঠল। এক নাম-না-জানা আনন্দ ঠেলে উঠল তার গলা অবধি, খেয়ে উঠেই সে তার খঞ্জনিটি নিয়ে ব'সে গেল। তার মনে হল তেমন গান সে বুঝি গায়নি কখনো।

গানে নাকি বাঘ ভালুক বশ হয়, কিন্তু বাঘ ভালুকের জায়গা সে নয়। হরিণ নাকি এসে শোনে, তার চোখের পাতা পড়ে না। আমাদের গাঁয়ের কেউ যদি হরিণ দেখে থাকে তো সে বিশ ক্রোশ দূরে। সাপও ভাল গান শুনলে এসে খেলা

করে, কিন্তু তার গানে মাঠ থেকে সাপ বেরিয়ে আসেনি। বেরিয়ে এসেছিল একটি মানুষের বাচ্চা—মাঠ থেকে নয়, ঘর থেকে।

সেদিন থেকে লতা রোজ এসে সুরথের খঞ্জনি বাজিয়ে গান গাওয়া শোনে। কখনো ব'সে, কখনো শুয়ে, কখনো হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে, কখনো গাছের ঝুরি ধ'রে দাঁড়িয়ে, কখনো বা গাছের ডালে কনুইয়ের ভর দিয়ে নরম নরম গোলাপী গাল দু'টি তার ছোট্ট ছোট কচি হাত দুটিতে রেখে অনিমেষ নয়নে সুরথের পানে চেয়ে থাকে। সুরথ গান গেয়ে আবার ভিক্ষে চাইতে বেরোয়, লতা ফিরে আসে ঘরে।

এমনি কত রোদ চ'লে গেল। একদিন লতা আর এল না। একদিন নয়, লাগ লাগ তিন দিন। সুরথ আকুল হয়ে উঠল। তিন দিন তিন হপ্তা হ'ল, লতার আর দেখা নেই। সে লতাদের বাড়ী ভিক্ষে চাইতে যায়। রোজ রোজ গেলে রাগ করবে ব'লে সে সাত দিনে আট দিনে একবার যায়, কিন্তু লতাকে আর পায় না।

সুরথ দেখল তার সামনে সে যে জল দেখছিল, সে কেবল এক মরীচিকা। কখনো বা তার মনে হয় যেন একটা খুব বড় স্বপ্ন দেখতে দেখতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

বুঝতে পারল, লতার আর বাইরে বেরুবার বয়স নেই, কিন্তু তাই বলে সে কি একটু দেখাও দেবে না? সুয্যি দেখা যায়, চাঁদ দেখা যায়, গ্রহ তারা সব দেখা যায়, লতাই কি কেবল আর দেখা দেবে না?

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে তার। যেদিন সে বাপ-মা সবাইকে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার মত একের পর এক অগ্নিতে বিসর্জন দিয়ে এল, ভিক্ষে ক'রে পেট চালানো ছাড়া কোনো দিকে আর কোনো পথ দেখতে পেল না সে—সেদিনের কথা তার চোখের সামনে নিঝুম দুপুরের ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে পুরানো ছবির মত ঝাপসা ঝাপসা দেখতে লাগে যেন—যখন মনে পড়ে তখন সে এক দণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে চারদিকে চায়। সেদিন যেমন আজও তেমনি সেই একই দুনিয়ায় সে একা।

এমনি কত রোদ্দুরের নিত্যি চলা পথের 'পরে একবার ভারী শীতটাই পড়ল। সুরথ যখন ফিরল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। গাছতলায় গিয়ে স্থির হয়ে ব'সে পড়ল, তেমনি আদুড় গায়ে। অকালের মেঘ একখানি যেন একটা কালো ভূতের মত হঠাৎ এল ধেয়ে। বিষ্টি হ'ল, তুফান এল, শিল পড়ল, গাছপালা ভেঙ্গে পড়ে বুঝি বা।

কাঁপতে কাঁপতে সুরথ সেই ভাঙ্গা দেউলের কাছে গেল। গিয়ে দেখে দেউলের দোরে তালা। নিরুপায় হয়ে সে দেউলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। তেমনি জলের ছাট আসছে। দেউলের ফাটল দিয়ে হাওয়া ঢুকে দৈত্যের নিঃশ্বাস ফেলার মত শব্দ হচ্ছে। দুই হাত বুকের উপর জড় ক'রে দু'হাতের তেলো গলায় গুঁজে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শেষে আর না পেরে সে ব'সে পড়ল। তেমনি সময়ে তার চোখে কেমন ক'রে কে জানে একটু ঘুম এসে গেল আশ্চর্যভাবে।

জেগে জেগে স্বপন দেখার মত সে হঠাৎ চমকে উঠে দেখল কে একজন এসে তার গায়ে একটা কম্বল ঢেকে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

লতা!—লতা!—সে চিৎকার ক'রে উঠল। কিন্তু তখন আর কোত্থাও কেউ নেই।

সেই ঝড় তুফানের মধ্যে সে একটা ছায়ার মত লতার বাড়ী অবধি দৌড়ে গেল। —কিন্তু এ কী? তাদের বাড়ীতে কান্নার রোল কেন?

লতা কি ম'রে গেল? মিছে কথা। সে না তার গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে তার আগে আগে চ'লে এল। সে মরল কখন?

তার এ কথায় সবাই অবাক হ'ল। সবাইকে সে দেখল—এই দেখ গো কম্বল, আমার লতা আমায় দিয়েছে। সবাই দেখল মিথ্যে, কোথায় কম্বল? মিছামিছি সে কম্বল গায়ে দিয়েছি ব'লে দেয়ালা করছে। তারপর দিন থেকে সুরথের গান আর এ গাঁয়ে কেউ শুনতে পেল না—তার খঞ্জনি এখানে আর বাজল না।

কিন্তু আর এক গাঁয়ে ঠিক তার পরদিন একটা অদ্ভুত লোককে দেখতে পেল সবাই। লোকটা খিনখিনে সরু গলায় খঞ্জনি বাজিয়ে গান গেয়ে খালি গায়ে ঘুরে বেড়ায়। দয়া ক'রে কেউ বা তাকে গায়ে দিতে ছেঁড়া খোঁড়া এক আধখানা কাপড় দিতে চাইলে বলে—আমার লতা যে কম্বল দিয়েছে, তার চেয়ে কি তোর কাপড় বেশী গরম?

রাজকিশোর পট্টনায়ক (1916—)

ওড়িয়া সাহিত্যের একজন শক্তিধর গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক হিসেবে রাজকিশোর জনপ্রিয়। তিনি পেশাতে আইনজীবি। একজন নিরবিচ্ছিন্ন সাহিত্যসাধক। আধুনিক জীবনে নর-নারীর মানসিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ তাঁর রচনায়। তাঁর বিশিষ্ট গল্পগ্রন্থ: 'পগ্‌ড়ুকি', 'তুঠ পাথর', 'ভড়াঘর', 'নিশান খুন্ট', 'পথর ঢিমা'। উপন্যাস: 'অসরন্তি', 'সঞ্জবতী', 'সিন্দুর গার', 'স্মৃতির মশাণি', 'চলাবাট'।

ফাঁকি

আটশ' টাকা গুণ্ঠ দরে জমি কিনিয়া বাড়ী করার সময়ে বাপে আর ছেলেতে সর্বদা এক কথা—কোথায় বাড়ী হইবে। ছেলে বলে, রাস্তার ধারে করা যাক, তাহলে রাস্তা থেকে নামলেই সহজে বাড়ীতে ঢোকা যাবে। বাপ বলেন—এমন মরুভূমির মধ্যে কেউ বাড়ী করে না। চারিদিকে পাথরের মত শক্ত শুকনো মাটি, এর মধ্যে বাড়ী করার মানে কী?

—তাহলে কী করা যায়, বাবা?

—এটুকু জমি খালি রাখা যাক, গাছপালা কিছু—

—হ্যাঁ বাবা, বাগান করব।

—আগে গাছ লাগাব। তার পরে যত বাগান করবে কর।

—কী গাছ?

—আম গাছ পুঁতব এইখানে। কলমী গাছ। আমি একটা কলমী গাছ করেছি—বিরিবাটির বাগানে। ভাল আম। সেই যে ভাগলপুর থেকে লেংড়া আম আনিয়েছিলাম—মনে নেই তোর?

গোপাল মুখ তুলিয়া সন্দিগ্ধভাবে বাবার দিকে তাকাইল। বাবা কী কলম করিয়াছিলেন কে জানে। গাছ কি ভাল হইবে? ফুলের বাগান করিলে কী সুন্দর হইত।

—বাবা, ফুলের বাগান করলে ভাল হ'ত না?

—এখানকার মাটি বেলে মাটি। জল দেবারও সুবিধা নেই।

—বাবা, আমি জল দেব।

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তুই তো নিজের হাতে জল তুলে চানটুকুও করতে পারিস্ না ব'লে তোর মা চাকর খুঁজছে। তুই করবি বাগান!

—না বাবা!

—বেশ করবি তো কর্। একটা আম গাছ এখানে থাকবে। তুই যত ফুলগাছ লাগাবি লাগা।

আমের চারা আসিল—ছোট একটি হাঁড়ির মধ্যে। কালো মাটির উপরে একহাত উঁচু আম গাছ। সবশুদ্ধ গণ্ডা আষ্টেক পাতা হইলেও হইতে পারে।

—বল্ তো রে, কোথায় পোঁতা হবে।

—বাবা, মাঝখানে পোঁত। নইলে এর ডালপালা পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে চ'লে যাবে, রাস্তার ছেলেরা উৎপাত করবে। গাছের জন্য কোঁদল লাগবে, বাইরের কোঁদল এসে ঘরে ঢুকবে।

—তোর কেবল ঐসব কথা।

বাপের কথায় রাগ করিয়া গোপাল চলিয়া গেল বাড়ীর ভিতর—মায়ের কাছে নালিশ করিতে।

—দেখ্ তো মা, বাবা আম গাছ নিয়ে পাঁচিলের কাছে লাগাচ্ছেন। গাছে আম ফললে পাড়ার ছেলেরা কি আর রাখবে?

—ওগো! আমগাছ ওখানে কেন লাগাচ্ছ? গোপাল এদিকে রাগ করছে।

—ওঃ! তোমার ছেলে কিছু করবে না, খালি—এই আমগাছ হবে, তার ডাল পাঁচিল টপকাবে, রাস্তার ছেলেরা ঝগড়া বাঁধাবে—এই সব! খুব হয়েছে, মা আর ছেলের একই রকম বুদ্ধি।

—হাঁা, একইরকম বুদ্ধি। ওখানে গাছ লাগানো হবে না।

—আমি বলছি হবে। আমার জমিতে আমি গাছ লাগাব।

—অ্যাঁ, তোমার জমি? জমি আমার। তোমার নামে আছে, না?

—যা পালা বলছি।

মায়ে পোয়ে ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল, বিশেষ আলোচনার জন্য।—বাবা সব খারাপ ক'রে দিচ্ছেন। বেশ, করুন।

ঝগড়ার ফলে গাছ সরিল—দুই হাত ভিতরের দিকে। জল দেওয়া হইল। জন্তু জানোয়ার ঠেকাইবার জন্য কঞ্চি দিয়া বেড়াবন্দী করা হইল।

সকালে গোপাল আর গোপালের মা উঠিয়া প্রথমেই গেল আমগাছ দেখিতে, গাছ নেতাইয়া পড়ে নাই তো? না, বেশ তাজা আছে।

মাকে গোপাল চুপি চুপি বলিল—গাছটাকে আর দু'হাত ভিতরে লাগালে কত ভাল হ'ত।

—আচ্ছা, এখানেই থাক। বাবা ভারী একগুঁয়ে, কী আর করা যাবে?

—মা, আমি কিন্তু এ গাছের কিছু করতে পারব না।

কারও হেপাজতের দরকার হয় নাই। আপন চেষ্টাতেই গাছটি বাড়িয়াছে। মা আর ছেলেতে কথা হয়—কলম ঠিক মত করা হয়নি। সে কথা বাবাকে বলিতে গিয়া দু'জনে বকুনি খায়।

সে বাড়ীর নিশানা হইয়াছে আমগাছটি। কেউ গোপালবাবুকে তাঁর বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বোঝান—কাঠজোড়ি নদীর ধার বরাবর পুরীঘাট পুলিশের ফাঁড়ির পশ্চিমে যেখানে পাঁচিলের মধ্যে আমগাছ দেখবেন সেইখানে আমাদের বাড়ী।

অনেক বন্ধুর কাছে এই দুষ্ট আমগাছটা ছন্নছাড়া স্বভাবের মানুষ গোপালবাবুর সহজ পরিচয় হইয়া দাঁড়ায়। গাছ আপনা আপনি বাড়িতেছে, আলো বাতাস আর মাটি হইতে সে তাহার আহার যোগাড় করিয়া বাড়ীর পাহারাদারের মত দাঁড়াইয়া আছে।

নদীর ধারে গ্রীষ্মের গরম বাতাস সে তার সবুজ বুক দিয়া ঠেকায়। কাঠজোড়ি নদীর দিক হইতে ছুটিয়া আসা গরম বালির ঝাপটা আপন দেহ দিয়া আটকায়। সর্বদা সকলের কাছ হইতে নানা অত্যাচার সহ্য করিয়া সে চুপচাপ আপন মনে দাঁড়াইয়া থাকে।

গোপাল তার বন্ধুদের আনিয়া সেই আমগাছের তলায় বসায়। সবাই তারিফ করে, বলে এমনি জায়গায় এমনি আমগাছতলায় ব'সে যত ইচ্ছা বই লেখা যায়। গোপাল খুশী হইয়া বলে—এটা আমাদের পোষা গাছ, তাই এত সুন্দর হয়েছে। গাছ লাগানোর ইতিহাস গোপালের আর মনে ছিল না।

শহর জায়গা। অনেক দূর হইতে লোকের এই আমগাছটির কথা মনে পড়ে। পূজা, বিবাহবাড়ী—সব কাজে গোপালবাবুর কাছে অনুরোধ আসে আমপাতার জন্য, আমের ডালের জন্য।

কেহ চাহিতে আসিলে গোপাল বাবু নিজে আসিয়া গাছের কাছে দাঁড়ান—কচি পাতা নিও না, ঐ থাক, এত পাতা গেলে গাছে কি আর ফল ধরবে? কত লোক আসবে, ঐ থাক।

এমনি অশেষ সাবধানতার সহিত গোপাল সেই ডাল-পাতা বিলায়। পোষা আমগাছের পাতাগুলি সব বুঝি গোনাগুনতি হইয়া আছে। বাড়ীর সবাইকার এক চিন্তা—গাছে কবে ফল ধরবে?

—এই, দেখেছ? আমগাছে বোল ধরেছে।

—বাঃ, ভাল বোল হয়েছে, সব ডালে। আহা, বোল মোটে যদি না ঝরে পড়ে, কত আম হবে।

—কেমন আম হয় দেখা যাবে।

—জাত আম।

—কে জানে, বাবা তো নিজেই কলম করেছেন। ভাল কলমী গাছ ফার্ম থেকে আনলে হ'ত না? তা না, নিজেই কলম করেছেন।

—আমরা ও আম খাব না।

—বাবা, আমরা তোমার আমগাছের আম মোটে খাব না। মা বলছে ভাল আম নয়।

—বেশ খেও না। গাছ তো কেঁদে ভাসাবে কিনা তোমরা না খেলে!

কিন্তু সকালে সকলের মুখে উদ্বেগ। কুয়াশা হইয়াছে। আমের বোল ঝরিয়া যাইবে—এই দেখ, বাতাসে মটর দানার মত বোল ঝরে ঝরে পড়ছে। আগুন লাগানে পিঁপড়েগুলো সব খেয়ে ফেললে।

—আচ্ছা ক'রে ডি-ডি-টি দেব, পিঁপড়ে ম'রে যাবে।

—আরে, আম হয়েছে—!

বাড়ীশুদ্ধ সকলে মিলিয়া গনিতে আরম্ভ করে। অনেকবার গোনা হয়। পাতার আড়ালে আবার কোথায় একটা বাকী রহিয়া যায়, হিসাবে ভুল হয়।—দেখ ছেলেরা, গুনে রাখ। দেখা যাবে কটা আম হয় এতখানি বোল থেকে।

পাড়ার ছেলেদের চোখে পড়িয়া যায়। ঢিপ ঢাপ ঢিল ছোঁড়া শুরু হয়

—এই, নজর রেখো এই ছেলেগুলোর উপরে।

আম হইলে কেউ তো খাইবেই। দুপুরে নজর রাখা এক কাজ হইল। প্রত্যেকটি আম এক একটি অমূল্য সম্পদ।

প্রথম আম ঠাকুরের কাছে ভোগ দেওয়া হইল। সে এক উৎসব। পাকিলেও আমের উপরটা সবুজ রহিয়াছে। ভিতরকার রঙ হলদে না হইয়া গেরিমাটির রঙ দেখাইতেছে। টক না হইলেও মিষ্টি নয়। সবাই এক এক ফালি খাইয়া তারিফ করে—বাড়ীর হাঁদা ছেলেকে সবাই যেমন আদর করিয়া গায়ে হাত বুলায়।

—আমাদের আম খুন্টুনি দিয়ে পাড়ব। দেখেশুনে পাড়লে নীচে প'ড়ে থেঁতলে যাবে না।

বাড়ীর সবাই মিলে খুব সাবধানে আম পাড়ে।

—আরে দেখেছ! ভাল ক'রে দেখ, কাঠবেড়ালী আর বাদুড়ের চোখ এড়ায় না কোনো আম। আমরা এতজনে মিলে আম পাড়লাম, তবু রোজ কাক বাদুড় কাঠবেড়ালীর এঁঠো করা আম পড়ছে কোত্থেকে কে জানে! পিঁপড়েও মরেনি, আধখাওয়া আমে ঠিক লেগে আছে।

এত যত্ন করিয়া যে কয়টা আম ঘরে তোলা হয় তার গোনা-গুনতি দুই চারটি করিয়া বিলানো হয় আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের। বাড়ীর সকলের সঙ্গে একেবারে মিলিয়া মিশিয়া গিয়া আমগাছটি পরিবারের একজনের মত হইয়া উঠিয়াছে। কেবল তার নাম দেওয়া হয় নাই এই যা।

এই যুদ্ধের সময় আমগাছের উপর দিয়া এক বিপদ যাইতেছে। উড়োজাহাজ হইতে যদি বোমা পড়ে তবে তার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য সরকারের লোক ট্রেঞ্চ খুঁড়িয়া রাখিয়া গিয়াছে একেবারে আমগাছের গোড়া পর্যন্ত। সেইদিন হইতে গাছ হেলিয়া পড়িয়াছে পূব দিকে। যতই ঠেকো দেওয়া যাক, সিধা হইতেছে না।

কী করা যায় ? শিশুকাল টাইফয়েড হইলে ছেলে যেমন চিরদিন রুগ্ন থাকিয়া যায়, তেমনি—বোমা তো পড়িলনা—ট্রেঞ্চ খুঁড়িয়া আমগাছটিকে কমজোর করিয়া দিয়া গেল।

খোঁড়া মানুষের হাতে যেমন লাঠি দেওয়া হয়, হেলিয়া পড়া আমগাছকে একটা পেয়ারা গাছের দো-ফেঁকড়া শক্ত ডাল দিয়া তেমনি ঠেকো দেওয়া হইয়াছে। পিঁপড়া কাঠবেড়ালী সেইদিক দিয়া আর একটি পথ খুলিয়া গাছের উপর যাওয়া-আসা করিতেছে। লোক আসিলে গেলে তার গায়ে সাইকেল ঠেসান দেয়।

ফি বছরই সেই এককথা—এ বছর কত আম ফলবে ? তিন বছরে একবার ফলন ভাল হয়। গেল বছর হইয়াছিল একশ' অপেক্ষা পাঁচটি কম। এবার দেখা যাক।

কারও হঠাৎ দয়া হইলে দুই এক তাল গোবর নয়তো এক ঘটি জল ঢালিয়া দেয় গাছতলায়। সকলের নজর গাছের পাতার দিকে। এ বছর কাউকে পাতা দেওয়া হবে না, গাছ কাহিল হইয়া যাইবে, ফলিবে না।

—মা, গাছটা রাস্তার উপরে বড্ড ঝুঁকে পড়েছে, যেতে আসতে মাথায় লাগে, বৃষ্টির সময়ে পাতার জলে গা ভিজে যায়। কেটে দেব কয়টা ডাল ?

—দ্যাখ্ গোপাল, আমগাছে হাত দিলে ঝগড়া হবে তোতে আমাতে।

এমনি শাসানি সত্ত্বেও গোপাল চুপি চুপি কয়েকটা সরু সরু ডাল কাটিয়া ফেলে, কাটিয়া একেবারে বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসে। মা জানিবার কী দরকার, রাস্তাটা সাফ হইলেই হইল।

তবু গাছটার কত মায়া। তার পাতার আড়ালে সব ক্ষতচিহ্ন সে লুকাইয়া ফেলে। গোপালের মায়ের চোখ তা ঠাহর করিতে পারেনা। গোপাল গিয়া হাত বুলাইয়া দেয় গাছের গায়ে। ঠিক বন্ধুর মতই গাছ সব কথা লুকাইয়া রাখিয়াছে।

সে বাড়ীর একটা অঙ্গ সেই গাছটি, বাহিরের লোককে পথ দেখাইবার জন্য বাহিরের বিজলী আলো জ্বালাইলে গাছ তাহা আড়াল করিয়া দেয়। ভিতরের কথা লুকাইয়া রাখে বাহিরের লোকের কাছে। বাহিরের লোককে আপন আড়ালের ওপাশে রাখে।

কত ঝড় বৃষ্টি গিয়াছে, প্রতি বৎসর যত ফুল ফল কুঁড়ি ও পাতা সে ফেলিয়াছে আবার ততই আসিয়া ভরিয়াছে।। গোপাল বড় হইয়া বুড়া হইতে চলিল, গোপালের বাবা মা ভাইবোন ভাগনে ভাইপো সকলেই আগাইতেছে, গাছটির বয়স বাড়ে না। হইয়াছে কাছের দালানটার সমান উঁচু। যতখানি জায়গা লইয়া ছিল তেমনি রহিয়াছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে দেখে মানুষের ছেলেরা ছোট হইতে বড় হইতেছে বুড়া হইতেছে।

প্রতি বৎসর কাক আসিয়া বাসা বাঁধে। বর্ষাকালে বেনে বৌ আসিয়া বসে। রাতে কাল পেঁচা আসিয়া ডাকে, রোজ কাঠবেড়ালী খেলা করে। বাড়ীর পোষা-কুকুর রোজ গাছতলায় প্রস্রাব করে। ফি বছর ছেলেপিলেরা তাহাতে দোলনা টাঙ্গায়। তাদের কলরব কল্লোল, তাদের উৎসাহ আনন্দ সেই আমগাছটির গায়ে গোড়ায় লুটাইয়া পড়ে।

প্রত্যেক বছর ঝড় বহিয়াছে। আমগাছ তাহাতে কাঁপিয়াছে। তার ডালে পাতায় পিঁপড়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। গাছের নীচে পিঁপড়া শিকার করিতে পিঁপড়া-বাঘ বেলে মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া বসিয়া থাকিয়াছে। বাতাস তেমনি গাছ জড়াইয়া, ডাল দোলাইয়া বহিয়া গিয়াছে। সে গাছ অজর। ঘরের মানুষ মরিবার পরে গোপাল মরিবার সময়েও দাঁড়াইয়া থাকিবে সব কিছুর সাক্ষী হইয়া। গোপাল কখনো বা ভাবিয়াছে এই আমগাছে দড়ি দিয়া ঝুলিয়া যে দড়ি দিয়া ছেলেরা দোলনা টাঙ্গাইয়াছে তাহাতেই ফাঁসি দিয়া ঝুলিবে।

গাছ জানেনা, বোঝেনা। তাহাকে উপলক্ষ করিয়া যে যা করে, যে যা ভাবে তার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নির্বিকার। দোলনা পাছে পড়িয়া যায় বলিয়া তার গায়ে ভোমর করিয়া মোটা পেঁচ আঁটা হইয়াছে। মানুষ আর গাছ জীবনের বিভিন্ন প্রকাশ, কিন্তু দুইই পোষ মানে। পোষা মানুষ কাজের বেলায় কৃতঘ্ন হয়, পোষা গাছ সর্বদা কৃতজ্ঞ আর বাধ্য।

* * * *

ঝড় আসে, আসিবে। তাহাতে ভাবিবার কিছু নাই।

সকালবেলা বাড়ীতে হইচই।—আরে! দেখেছ, কাল রাতে আম গাছ ভেঙ্গে প'ড়ে গেছে!—ভাই, ওঠ!—আরে গোপাল, ওঠ! আমগাছের দশা দেখেছিস্?

সবাই ছুটিয়া গেল আমগাছের কাছে। গোপাল দেখিল আমগাছ পড়িয়া আছে মাটির উপরে মরা হাতীর মত। তার দোলনা বাঁধা দড়ি তার ডালের নীচে চাপা পড়িয়াছে মরা মানুষের পরনের কাপড়ের মত! দাঁড়াইয়া থাকিতে যত উঁচু ছিল, পড়িয়া গিয়াও তার ডালপালা তত উঁচু হইয়াই রহিয়াছে।

গোপাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিল গাছের একটা দিক উইয়ে অর্ধেক খাইয়া ফেলিয়াছে, ফোঁপরা হইয়া গেছে। আর অর্ধেক ভাঙ্গিয়া গেছে।

—কিরে গোপাল, ওষুধ দিয়ে পিঁপড়ে মারছিলি না? পিঁপড়ে থাকলে উই লাগত না। এত বড় গাছটাকে উইয়ে খেয়ে ফেললে। গেল—!

—পিঁপড়ে তো মোটে রইল না, উইয়ের রাজত্ব হল। কাঁচা গাছটাকে ভোজ ক'রে দিলে!

কাঠবেড়ালীগুলা দূরে ঘোরাফেরা করিতেছিল।

—আর কী খাবিরে, কাঠবেড়ালী? আমগাছ ম'রে গে ।

নদীতে স্নান করিতে আসে যায় যাহারা, পথে চলা পথিকেরা দাঁড়াইয়া যায়, বলে—কী ঝড়টা না হয়েছিল, এত বড় ফলন্ত গাছটা উপড়ে পড়ল! আহা! আহা!

গাছটা কত ভাল। পড়িয়াছে যে, তা ঘরের উপর পড়ে নাই। বাড়ীর উপরকার বিজলী বাতিটা ভাঙ্গে নাই। দিনের বেলা পড়ে নাই। ডালে কাকের বাসা তেমনি আছে। কালো কালো ছানাগুলা উড়িতে শেখে নাই, চ্যা চ্যা করিতেছে।

সে গাছ আর নাই। ভারী বুদ্ধিমান গাছ ছিল। সেই হৃদয়বান আমগাছটি

আর বাঁচিয়া নাই। কাঠুরিয়া আসিয়া কুড়াল দিয়া গাছের পাবে পাবে টুকরা করিয়া কাটিয়া দিয়া গেল। পাখীর বাসাওলা ডালটি আর একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়া দিল।

খবর-কাগজে লিখিয়াছিল—কটকে অর্ধরাত্রে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি। শহরের ভিতরে পুরীঘাটে আমগাছ উপড়াইয়া পড়িয়াছে। গাছটির মৃত্যু-সংবাদ খবর-কাগজে বাহির হইল। কী কপাল জোর তার!

দুইদিন পরে সন্ধ্যাকালে গোপালবাবু কাহাকে নিজের বাড়ীর নিশানা দিবার সময় বলিতেছিলেন—পুরীঘাট পুলিসের ফাঁড়ির পশ্চিম দিকে গেলে যেখানে প্রথম আমগাছ পাবেন—না না, ভুল বললাম, সে আমগাছটি প'ড়ে গেছে এই ঝড়ে।

আষাঢ়ের ঝড় আপন পরাক্রম দেখাইতে লুটিয়া লইল একটি নিরীহ নিরপরাধ আমগাছকে, তায় আবার সে ছিল দুর্বল, উইয়ে খাইয়াছিল। কিন্তু সে বাড়ীর সেই মানুষদের একটি বন্ধু ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল—সেই ঝড়ের রাতে।

গোপীনাথ মহান্তি (1914—)

কটক জেলার নাগবালি গ্রামে আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের সর্বজনশ্রদ্ধেয় গোপীনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্যের কৃতী ছাত্র। দীর্ঘদিন রাজ্য সরকারের উচ্চ প্রশাসনিক পদে কাজ করেছেন। ওড়িশার গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে একাত্ম গোপীনাথ তাঁর লেখায় অবহেলিত মানবসমাজের কথা বিধৃত করেছেন। আদিবাসী জীবন-যাত্রার গভীরে তাঁর অগাধ প্রবেশ। তাঁর 'অমৃতর সন্তান'-কে পুরস্কৃত করেছে সাহিত্য অকাদেমী এবং 'মাটি মটাল' পেয়েছে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার।

টড়্পা

টড়্পা তার নাম। সব নামের মত সে নামও এক প্রতীক, সেইটুকুই তার সার্থকতা। নইলে শব্দ হিসাবে সে নাম শুনে কিছু বোঝা যেত না।

এও সম্ভব যে ভাষার নিয়মের দিক থেকে সে শব্দেরও কিছু অর্থ আছে; কিন্তু নামের অর্থ মানুষের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখে না। তার সম্পর্ক নাম যারা দেয় তাদের সঙ্গে। সেদিক থেকে আলোচনা করলেও এখানে তা কোনো কাজে আসবে না। কারণ টড়্পা লোকটি ওড়িশার বাসিন্দা হলেও তার ভাষা ওড়িয়া নয়, কন্ধ। আর তাদের সমাজে বাপ-মা ইচ্ছেমত নাম দিতেও পারে না। উৎসুক গাঁয়ের লোক সবাই এসে জড়ো হয়। কন্ধ পুরোহিত ফর্দ করা কতকগুলি নাম ব'লে যেতে থাকে, পুজো-আর্চা চলতে থাকে। ভুঁয়ে পড়ে থাকে সদ্য বলি দেওয়া মুরগীর রক্ত, আর আলো চাল, মুরুজ। ধুনোর ধোঁয়া উঠতে থাকে। দেবতার ভর হওয়া বুড়ী মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে চাল ফেলতে থাকে মাটিতে একটি একটি ক'রে—জলভরা হাঁড়ির ভিতর থেকে তুলে তুলে। যে নাম বলতে বলতে চালটা খাড়া হয়ে দাঁড়াল ব'লে সে বুড়ীর চোখে ঠাহর হয়, সেই নাম দেওয়া হয়। 'টড়্পা'র আরম্ভটা অনুমান করা যেতে পারে, অর্থ নয়।

সে জন্য আবার হাতড়ে হাতড়ে বেয়ে উঠতে হবে উজানে, কোন নাম-না-জানা অতীতের পানে, যখন তৈরী হয়েছিল নামের এই চিরায়ত মালা। কে করেছিল? কেন?

নিয়মগিরি পর্বতের 'ডংগরিআ' (পাহাড়ী) কন্ধদের শুধোলেই অন্যান্য গবেষণার

মত এ গবেষণারও সহজ উত্তর সঙ্গে সঙ্গে মিলে যায়—কে করেছিল? তুমি আমি করেছিলাম নাকি? 'মাহাপুরু' (মহাপ্রভু) করেছিল। সবই তো সে করেছে এই 'ডংগর' (পাহাড়), বন, উপর, নিচ, দিন, রাত—সব। ছেলেমানুষের মত কত শুধোস? জানিস না সে করেছে বলে?

কাজেই বুঝে নিতে হয়—যে 'মাহাপুরু' এই সব সৃষ্টি করেছেন—তার ভিতর আবার এই কোরাপুট জেলার পাঁচ হাজার ফুট উঁচু অবধি চাড়া দিয়ে ওঠা নিয়মগিরি পর্বত আর তার উপরের বাসিন্দা 'ডংগরিআ' কন্ধ, আর তাদের রীতিনীতি ও ভাষা—তিনিই সৃষ্টি করেছেন এই সুন্দর নামটি: টড্‌পা, কী উদ্দেশ্যে তা তিনিই জানেন আর তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে এই ব্যক্তিটি পেয়েছে এই নাম।

গড়-গড় খড়-খড় দুড়-দাড় পাথরের আওয়াজ, গাছের গায়ে ঠক-ঠক কুড়ুলের চোট আর একটা নিরবিচ্ছিন্ন বিস্মৃতি। ঐ টড্‌পার নামের সঙ্গে সঙ্গে মনে প'ড়ে যায় কোথায় কোন পঞ্চাশ মাইল লম্বা বিশ মাইল চওড়া মালভূমি, থাকে থাকে পর্বতের বিমান সাজিয়ে তৈরী, গাছ কেটে কেটে নেড়া হয়ে গেছে তার কত ঠাঁই। সারা পর্বত জুড়ে চাষ, নয়তো বাগান। এক পাহাড়ে কলা গাছ তো আর এক পাহাড়ে পা থেকে মাথা অবধি কমলার বাগান, আনারসের বাগান, কাঁঠালের বাগান—চলেইছে মাইলের পর মাইল। আর কোথাও চাষ করতে করতে মাটি ধুয়ে গিয়ে দেখা যায় শুধু কালো পাথর, সেখানে একগাছি ঘাসও গজায় না, শেওলা হয় আর শুকোয়। আর কোথাও আজও ভীষণ বন, গাছে লতায় জড়াজড়ি, বাঁশ বন, নানা জাতের গাছের বন। তিন ক্রোশ পাঁচ ক্রোশ দূরে দূরে কোথাও বা এক একটি গাঁ। সেখানে পাঁচ ঘর কি পনের ঘরের বাস, তারপর আবার জঙ্গল।

টড্‌পার সঙ্গে তখনও তাদের দেখা হয় নি। বাইরে থেকে আসা কর্মীর দল তেমনি ভীষণ বনের মধ্যে পাহাড়ের ঢাল দিয়ে দিয়ে নেমে নেমে চলেছিল। তখন রাত সাড়ে ন'টা, আশ্বিনের শেষ। এমনিতেই তো নিয়মগিরিতে রোদের দিনেও শীত। পায়ে হেঁটে পাহাড় বেয়ে নামার ভাতে শরীরের ভিতরটা গরম গরম লাগলেও গায়ে ঢাকা দিয়েছিল শীত, তবে তাতে আর কষ্ট হচ্ছিল না, একরকম গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। শীত করার মত তাদের মনে ফাঁকা অবসরও ছিল না। সাতটি মানুষ, আঁধার বনের নিচে দিয়ে দিয়ে সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গের মত পায়ে চলা পথ ঢিল আর পাথর ছড়ানো উঁচু নিচু জমির উপর দিয়ে বেঁকে বেঁকে নেমে গেছে। সেই পথে পা টিপে টিপে নেমে চলেছে একজনের পিছনে আর একজন। পথের ধার ধার দিয়ে ঘন গাছপালার আড়ালে পাতালের মত খাদের ভিতর দিয়ে ঝরনা বয়ে যাচ্ছে, তার শব্দই শোনা যায় কেবল। সর্বদা ভয়, একটু বেহুঁশিয়ার হলে এই বুঝি হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় সেই খাদের ভিতর। সামনের লোকের হাতে একটি মাত্র টর্চ লাইট, সাতদিন ধরে নিয়মগিরি পস্তের পর তার ব্যাটারি কমজোর হয়ে গেছে, বুঝে শুনে জ্বালতে হয়। এদিকে সদাই আতঙ্ক—বাঁ দিকের ঢালুর ঘন বনের ভিতর থেকে হঠাৎ কখন বড় বাঘ লাফ দিয়ে ঘাড়ে পড়বে, নয়তো সোজা সামনে এসে হাজির হবে।

তাই তারা মাঝে মাঝে কথাবার্তা বললেও মোটের উপর চুপচাপ হয়েই চলেছে। আর মাঝে মাঝে যেখানে বাঁ দিকের বনের মধ্যে এক একটা ফাঁক—যেন নিঃশ্বাস নেবার ফুটো—সেখান দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে তারা দেখে চাঁদনী রাত, পাহাড়ী-নদীর কালো জলে শ'য়ে শ'য়ে চাঁদ হেসে চলেছে। ও পাশে যেখানে পাহাড়ের উপর চাষ হয়েছে সেখানে বাজরা, 'গাণ্টিআ' ভুট্টা, শ্যামা ধান, আর মাড়ুয়ার ফসল সব যেন ঘুঁটে একাকার হয়ে গেছে চাঁদের আলোর ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশার মধ্যে। চোখের সামনে ঝোলে কোথায় দিগন্তের শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া স্বপ্নের মত ছবি। স্বপ্নমায়া কত পর্বত, কত উপত্যকা, কত খাড়াই গড়াই সব তাতে গলে মিশে খাপ খেয়ে যায়। আলো-আঁধার বস্তু-ছায়া-মেশা নানারূপ, চুপচাপ।

একটু দাঁড়িয়ে গিয়ে তারা সে দৃশ্যের দিকে চেয়ে থাকে। যেন সেই ক্ষণটুকু তারা আপনা ভুলে তার সঙ্গে মিশে গিয়ে এক হয়। তেমনি নির্জন শুনশান। আবার তেমনি পূর্ণ, তেমনি স্থির, সময়হীন, তেমনি হারাই হারাই।

আর তেমনি থেকে না থাকার মত—মায়ামূর্তি।

তারপরে আবার আঁধারের গুহার ভিতর গড়ানে গর্ত। বনের কন্দরে সরু চলা পথে তারা নেমে যায়। বুক ছম ছম করে। কে জানে কখন ফুরাবে সে পথ। বনের জন্তু-জানোয়ার, আচমকা আছাড়, আর অজানা বিপদের আশঙ্কায় এক এক সময় দম আটকে আসে।

তারা নিয়মগিরি পর্বতের 'ডংগরিআ' কন্ধদের গ্রাম ঘুরে দেখতে এসেছিল, শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে। সবার আগে উন্নয়ন আধিকারিক পরশুরাম। লম্বা, পাতলা, আধা বয়সী প্রবীণ কর্মচারী, পাহাড়ে জঙ্গলবাসী মানুষের আর্থিক উন্নয়নের উপায় চিন্তা ক'রে ক'রে বহু মাল অঞ্চল ঘুরেছেন। এসেছেন ভুবনেশ্বর রাজধানী থেকে। তাঁর পিছনে নৃতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ভরত। নানা জাতি নানা শ্রেণীর লোকের সামাজিক অবস্থা তিনি অধ্যয়ন করেছেন। কিছু লেখা ছাপিয়েছেন। আরো দেখতে জানতে তাঁর খুব আগ্রহ। আকারে খাটো, গোলগাল, উৎসাহী, বয়স চল্লিশ। তাঁর পিছনে স্থানীয় কর্মচারী হরি পাণি, পাহাড়ের নীচে তাঁর উন্নয়নের কাজকর্ম। এবার নিয়মগিরির মালভূমিতেও কাজের পরিকল্পনা হয়েছে, তাই জায়গাটা ঘুরে দেখতে এসেছেন। ত্রিশ বছর বয়সের ছেঁচাপেটা শরীর, কালো মুগুনি পাথরের মত। তাঁর পিছনে জঙ্গল গার্ড মধুসূদন, বয়স প্রায় আটান্ন, শীর্ণ-দেহ, বেঁটে বুড়ো মানুষ। নিয়মগিরি মালভূমিতে তিনি অনেক বছর ঘুরেছেন ব'লে সেখানে তাঁর সব চেনা জানা, তিনি এসেছেন এই বাবুদের সঙ্গে, তাঁদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবার জন্য। তাঁর পিছন পিছন তিনজন চাপরাশী—মকর-অ, নজিরু, রামাইয়া। এমনি সাত জন।

বিষমকটক নামে এক রেল স্টেশনে নেমে নিয়মগিরি পর্বতের মালভূমির উপর উঠে কত গাঁয়ে থেমে থেমে তাঁরা এখন নেমে আসছেন মুনিগুড়া রেল স্টেশনে এসে উঠবেন ব'লে। সিধে রাস্তায় এই দুই স্টেশনের মধ্যে ব্যবধান পনের মাইল; কিন্তু

এক জায়গায় পাহাড়ে ওঠা আর এক জায়গায় নামায় পঁয়তাল্লিশ মাইল। মালভূমিতে সাতদিন কেটেছে তাঁদের। রাস্তা নেই, খাদের খাড়া ধার দিয়ে দিয়ে সরু পথ। ছাতি ফাটানো চড়াই, দেড় হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু, মাথা ঘুরে যাওয়া খাড়া উৎরাই, পথে পথে থাকে থাকে পরতের পর পরত পাহাড়ে ওঠা আর নামা। থাকবার জায়গা নেই, 'ডংগরিআ' কন্ধদের আতিথেয়তায় তাদের এইটুকু টুকু গুহার মত কুঁড়ে ঘরের সঙ্কীর্ণ অন্ধকার বারান্দায় বাস, পানীয় পাহাড়ী নদীর জল, তাতে ভেসে আসে উপরের গাঁয়ের ধুয়ে আসা যত কিছু—কন্ধ গাঁয়ে তিনদিন অন্তর মোষ কাটা হয়, ঝরনায় মাংস ধোয়া হয়, তাতে তার নাড়িভুঁড়িও ফেলা হয়। সেখানে ডাক্তারখানা নেই, ডাকঘর নেই। দোকান-বাজার নেই। থানা পুলিস নেই। কোঠাবাড়ী তো দূরের কথা, খাপরেলও নেই। পুকুর-কুয়ো নেই, সভ্যতার নামগন্ধ নেই। কেবল পাহাড় জঙ্গল, পাহাড় জুড়ে নানা জায়গায় ফসল আর ফলের বাগান। আর আদিম অধিবাসী, যাদের নাম ডংগরিআ কন্ধ। তাদের সঙ্গে কিছু ডম্ব জাতির লোক, তারা কালক্রমে পাহাড়ের নিচ থেকে উপরে উঠে এসেছে জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে। কন্ধকে মদ দিয়ে, কিছু কিছু টাকা দিয়ে তার ফলের গাছগুলি বাঁধা নিয়ে নেয়। একবার এক বোতল মদ দিলে বছরকার মত একটা কমলা গাছ কি চারটে কাঁঠাল গাছ, দুটো টাকা দিলে এক বছরের জন্য এক প্রকাণ্ড কলাবাগান, কুড়িটা টাকা দিলে একর খানেকের আনারস বন, ঐ রকম উপায়েই হলুদ, অড়হর, রেড়ি, নানা ফসল। কন্ধ হাতে কোদাল কুপিয়ে কুপিয়ে সারা বছর ধরে ফসল লাগায়। রাত্রে ঠাণ্ডায় হিমে পড়ে থেকে হরিণ অম্বরের উপদ্রব থেকে ফসল আগলায়, তারপর ডম্ব এসে সে ফসল নিয়ে চ'লে যায়। পাহাড় থেকে বয়ে এনে হাটে বেচে, টাকা কামায়। ডম্ব আর কন্ধ আপন আপন সমাজের প্রথামত চলে। ডম্বের বড় বড় খোলা মেলা ঘর, চওড়া বারান্দা, পরিষ্কার, লেপা-পোছা। কারুকার্য করা কাঠের কবাট। নিচেকার লোকেদের মত স্ত্রীপুরুষ পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরে। শার্ট কোর্ট শাড়ী ব্লাউজ, গায়ের কাপড়, সব ব্যবহার করে। খুব সকালে তার ঘরের দুয়ারের সামনের ধুলো ময়লা সাফ ক'রে গোবর জল ছিটোয়, তার ছেলেপিলেরা দু'অক্ষর পড়েও। কখনো কখনো সে সুর ক'রে পুরাণ পাঠ করে রোজগার করে, কেউ কেউ কাপড়ও বোনে। তবে জিনিষপত্র বয়ে হাটে নিয়ে গিয়ে বেচাই তার প্রধান বৃত্তি, স্ত্রীপুরুষ উভয়ে এই কাজে লাগে। এই ব্যবসার মাল জোগাড় করার জন্য আর কয়টি ব্যবসাও কেউ কেউ করে : লুকিয়ে মদ চোলাই করা বা চোরাই মদ বিক্রি করা, মাংসের জন্য গরু মোষ এনে কন্ধকে বেচা। আরো কত ফন্দি ফিকির বৃত্তি-ব্যবসা জানে তারা, তার মধ্যে সব কিছু বেমালুম খাপ খেয়ে যায়, কেউ কিছু টের পায় না। ডংগরিআ কন্ধ থাকে তার নোংরা ময়লা ধুলোটে চালচলন নিয়ে। পুরুষ পরে কৌপীন, স্ত্রী সেই কৌপীনের ফেরতার উপর বোনা কাজ করে সুন্দর করে। স্ত্রী তার নিজের কোমরে জড়ায় তিন হাতের একখানি মোটা কাপড়, বাইরে বেরুলে আর একখানি তেমনি কাপড়ে কোমর থেকে গলা

অবধি ঢাকে। তার সাধারণ পরিধেয় কুটকুটে ময়লা, মাথার চুল ফুরফুরে রুখখু। পুরুষ নাকেও মাকড়ি পরে, কানে পরে তারের কুণ্ডল, তা থেকে কাঁচের দুল ঝোলে। মাথায় কপালের উপর পর্যন্ত গোল করে কামিয়ে মাঝখানের চুলে কাঁকুই গুঁজে খোঁপা বাঁধে, গলায় রং বেরং-এর কাঁচের মালা পরে, কাঁধে ফেলে টাঙ্গি, কোমরে একবিঘত লম্বা একখানি ছুরি ঝোলায়, হাতে নেয় 'ঢামণা' কাঠের সরু মুখো লাঠি, তার উপর দিকে খোদাইয়ের কাজ করা। স্ত্রী পরে হালি হালি রংবেরং-এর কাঁচের মালা, গিলটি করা কাঁসা পিতলের নানা গহনা। পুরুষের মদের প্রতি বড় আসক্তি। শলপ গাছে রসের ভাঁড় লাগানো থাকে, পেলে গাছে চ'ড়ে পেট ভ'রে রস খেয়ে নেয়, কিনতে মহুয়ার মদ পেলে সব রোজগার সেখানেই উজাড় ক'রে দেয়, নেশায় মাতে, বেহুঁশ হয়। গাঁয়ে পাল-পার্বন পুজো লেগেই থাকে। তাতে মোষ কেটে দেবতার কাছে বলি দিয়ে ভোগ দিয়ে বেঁটে নিয়ে মাংস ক'রে খায়, আত্মীয় কুটুম্বকে ভোজ দেয়। সারা বছর ধরে খেটে খেটে এত ফসল ফলিয়ে, এত মূল্যবান আনারস কমলা পাকা কলা হলুদ কাঁঠাল অড়হর রেড়ি নানা ফসল এত বিপুল পরিমাণে ফলিয়েও ডংগরিআ কন্ধ যে গরিব সেই গরিব। বছরে চার মাস বর্ষাকাল, ঘরে শস্যের অভাব হয়। আমের আঁঠির ভিতরকার তেতো শাঁস, শাক, বাঁশের কোঁড়, শলপ কাঠের ধুলো, কত রকম কত রকম ক'রে কখনো বা কিছু শ্যামা ধান বা মাড়ুয়া থাকলে তাই মিশিয়ে সে দিনের পর দিন চালিয়ে নেয়।

তাঁরা দেখে দেখে আসছিলেন সেই চাল-চলন—আধিকারিক পরশুরাম, অধ্যাপক ভরত, কর্মচারা হরি পাণি। জঙ্গল গার্ড মধুসূদনই কেবল যা বুঝতে বলতে পারে ডংগরিআ কন্ধের ভাষা। সেই সুবিধাটুকু নিয়ে কন্ধদের নানা প্রশ্ন ক'রে নানা খবর তাঁরা নোটবুকে টুকেছিলেন। কন্ধের উপকারকল্পে সাতদিন ধ'রে তাঁরা বহু আলোচনা করেছেন, বহু ভাবনা ভেবেছেন। সেই সাতদিন মনুষ্যজাতি বলতে যেন তাঁদের মনে এসেছে কেবল ডংগরিআ কন্ধ, স্থান বলতে কেবল নিয়মগিরি পর্বতের মালভূমি ; এমনি ভাবনার নেশায় তাঁরা গাঁয়ে গাঁয়ে পথে পথে ঘুরে ঘুরে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। এমনি কারণেই সেদিন মুটাগুণি ছেড়ে বেরুতে বেরুতে তাঁদের চারটে বেজে গেল। তাঁদের জিনিষপত্র বয়ে নিয়ে ভারী পাঁচজন তার ঘন্টাখানেক আগেই রওনা হয়ে গেছে। দেরির জন্য তাঁদের ভাবনা ছিল না, মধুসূদন তাঁদের বলেছিলেন যে মুটাগুণি থেকে মুনিগুড়া পাহাড়ী উৎরাই পথে তিন ক্রোশের কিছু বেশী, যদিও এমনিতে প্রায় পনের মাইল। তারপর যেতে যেতে পথে দৃশ্য দেখতে দেখতে তাঁরা ডংগরিয়া কন্ধের বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন, অধ্যাপক ভরত অনেক ফোটো তুলেছিলেন, আরো তোলেন। দেরি হল।

সমস্যা তো সবাইকার জানা, সমাধান কী? তারই উত্তর খুঁজতে খুঁজতে পথ কেটে যায়। জিজ্ঞাসা করায় জঙ্গল গার্ড মধুসূদন তার মত ব্যক্ত করলে।

—আজ্ঞে, আমি দেখে দেখে বুড়ো হলুম, এদের যেমন দেখেছিলুম এরা তেমনিই আছে। এমন ভাল, বুঝদার লোক দুনিয়ায় আর বোধহয় নেই। অন্যায় বা

মিথ্যের ধারে কাছেও যাবে না, যা দেবে বা করবে ব'লে কথা দেবে তা থেকে এক চুল এদিক ওদিক হবে না। কিন্তু তাকে বদলাতে বললে বদলাবে না। দাঁত মাজবে না, ছুঁচোবে না, লেখাপড়া শিখবে না, মদ ছাড়বে না, আমরা যতই উপদেশ দিই ভাল কথা বলি সে শুনবে না, বলবে—আগে থেকেতো এমন চলন নেই।

হরি পাণি নিজের মতের উপর জোর দিয়ে বললেন—আজ্ঞে, সব বদলাবে, এরা আপনা আপনি বদলাবে। আগে দরকার পাকা সড়ক, নিয়মগিরির অন্ধি সন্ধি যাতে ঘোরা যায়। সড়ক হয়ে এই আঁধার বন খুলে গেলে সভ্যতা আপনি এসে পড়ে। বাইরে থেকে কেউ এলে তাদের থাকবার জায়গা চাই, খাবার জল চাই, অন্যান্য সুবিধে চাই। এদের মধ্যে কাজ করার জন্য অনেক কর্মী চাই। এ কাজ একেবারে কুড়ি পঁচিশ লক্ষ টাকা নিয়ে শুরু করতে হবে, চাষবাস ফল বাগানের কাজ, ছাগল শুওর মুরগী পোষার কাজ, স্কুল, ডাক্তারখানা, কোনো কিছু ফ্যাক্টরি—সব রকম। এত কথা কী, এইখানে যদি খনি টনি বেরিয়ে পড়ত তাহলেই তো ব'সে যেত এক রাউরকেলা, এদের বদলাতে সময় লাগত না।

ভরত বললেন—এদের খালি বদলাবার চেষ্টা করাইতো উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়, ভাবতে হবে কী করলে এদের ভাল হয়। শোষণ চলতে থাকা অবধি যতই এরা রোজগার করুক হাতে কিছুই থাকবে না। যারা শোষণ করেছিল, যারা শোষণ করছে, তাদের কি এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে? তারাও তো এদেশের নাগরিক। কিন্তু শোষণ হয় কেন? সে কি কেবল শোষকের আক্রমণের জন্য না শোষিতের মধ্যেই নিহিত শোষিত হবার প্রবণতার জন্য? উভয়েই দায়ী। এই যে প্রবণতা আমরা কন্ধের মধ্যে দেখে এলাম তা একদিনে গ'ড়ে ওঠেনি। সে যেভাবে বেড়েছে, মানুষ হয়েছে, যেসব রুচি রীতিনীতি বিশ্বাস আঁকড়ে ধরেছে, জীবনের প্রতি তার যে দৃষ্টিভঙ্গী—এই সব মিলে তাকে এমনি করেছে। সে তার দেবতাদের তুষ্ট করতে, পিতৃপুরুষ আর মরে হেজে যাওয়া মানুষের আত্মাকে তুষ্ট করতে মহিষ বলি দেবে, ভোজ দেবে, মদ খাওয়াবে, এসব থেকে তাকে নিরস্ত করবে কে? শীতের দিনেও তাকে এই পাহাড়ে থাকতে হয়, কাজ করতে হয়, খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাতে হয়, কাজেই শরীর গরম রাখতে তাকে মদ খেতে হবে। তার ফুর্তি করার অন্য কিছু নেই, তাই মদের ফুর্তিই তার কাছে বড়। মদ মহিষ চলা অবধি সে পয়সা ওড়াবে, শোষণকারীকে ডেকে আনবে। শিক্ষিত হ'লে তার রুচি বদলাত। কিন্তু তার আশঙ্কা তার ছেলে লেখাপড়া শিখলে পাহাড়ে ফলের চাষ কি ফসলের চাষ করবে না, সে আশঙ্কাও অমূলক নয়। কাজেই স্কুল খুললেও সে পড়াশোনা করতে নারাজ। পাহাড় জঙ্গলে চাষ ছাড়া তার অন্য জীবিকা নেই, চাষ না করতে চাইলে তাকে এখান থেকে চ'লে যেতে হবে। মোটের উপরে শিক্ষিত না হলে সংযম ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন না করলে তার অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হবে ব'লে আমার মনে হয় না। তার জন্য অনেক খরচ, অনেক কর্মী, অনেক ব্যবস্থা তো দরকারই, আরো দরকার অনেক সময়। তার মনকে

তৈরি না ক'রে হঠাৎ তার উপরে আমরা পরিবর্তনের বান ডাকিয়ে দিলে ভাল করতে গিয়ে মন্দ হবে, তার জীবন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

আর পরশুরাম বললেন—তাহ'লে আমরা কি শুধু হতাশভাবে তাকিয়েই থাকব? কবে লক্ষ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে, বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়া হবে, ডংগরিআ কন্ধের আজ যে ছেলে জন্মাচ্ছে কত না কত বছর পরে সে লেখাপড়া শিখে নতুন মানুষ হয়ে নতুন সমাজ গড়বে—সে পর্যন্ত আমরা চুপচাপ বসে থাকব? আর সে এমনি অজ্ঞান অশিক্ষা দারিদ্র্য শোষণের মধ্যে না-মানুষ না-জন্তু হয়ে দিন কাটাতে থাকবে? তাহ'লে তার সম্বন্ধে আমাদের এত শত জেনেই বা লাভ কী? কেবল আমাদের কৌতূহল মেটাব আর সেই জ্ঞান শিকেয় তুলে রাখব, ব্যস্ এই? না, তার চাইতে বরং আমরা কিছু কাজ আরম্ভ ক'রে দিই। সব গ্রাম না হোক কয়েকটি গ্রাম নেওয়া যাক। ঘর ঘর ঘুরে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হোক। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে তাদের এতে রাজি করান হোক। তারা যা বিক্রি করবে সরকারকে বিক্রি করুক, যা কিনবে সরকারের কাছ থেকে কিনুক। তার জন্য একটা দুটো দোকান খোলা হোক। তাদের আবশ্যক মত সরকার থেকে তাদের ঋণ দেওয়া হোক, যাতে তারা আর কারও কবলে না পড়ে। তাদের সুপরামর্শ দেওয়ার জন্য তাদের মধ্যে কর্মিকেন্দ্র খোলা হোক। একটি স্কুল বসানো হোক। ওরা যেই দেখবে এই নতুন পথে তাদের রোজগার বাড়ছে তখন ক্রমে তাই অবলম্বন করবে। বাইরের শিক্ষিত লোকের সংস্পর্শে আসতে আসতে ক্রমে ওদের রুচি ও স্বভাবও বদলাবে। এরই সঙ্গে সঙ্গে চলুক ওদের আরো ভাল ফলচাষী ক'রে তোলার জন্য তালিম দেওয়ার কাজ, আরো ফলের গাছ লাগানোর কাজ। ক্রমে হাওয়া খেলবে, অন্ধকারের ভিতর একটু আলো পড়বে, আর একটু, তার পর আরো একটু।

অধ্যাপক ভরত বললেন—এতেই যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যেত তবে তো হতই। কিন্তু তা কি হবে? ওরা পয়সা উপায় করতে শিখবে কিন্তু তা কী ক'রে রাখতে হয় খরচ করতে হয় তা শিখতে এক যুগ লাগবে। যে এখন ওদের ফসল নিয়ে নিচ্ছে, ঠকিয়ে ভাঁড়িয়ে হাত ক'রে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নিয়ে আসার জন্য পরিশ্রম করছে আর তা বিক্রি ক'রে পয়সা রোজগারের বুদ্ধি আঁটছে সে আর ফসল না নিয়ে বরং আরো সহজে কন্ধদের ফসল বিক্রির টাকাটাই মদের হাঁড়ি দিয়ে টেনে নেবে, সে না নিলে তার মত আর কেউ নেবে। পয়সার লোভ নতুন অনর্থ শেখাবে, ওদের সরলতা সাধুতা যাবে। ক্রমাগত বাইরের লোকের সংস্পর্শে এসে ওরা ফাঁকিবাজি ফন্দিবাজি শিখবে। কারও কোনো প্রভাবের রকমই এই—তার খারাপ গুণগুলিই আগে শিখে নেয় মানুষ। ওরা হয়ে উঠবে সুবিধাবাদী, কর্জ নিয়ে টাকা ডোবাবে, ঋণশোধ এড়াতে নিজের জিনিষ লুকিয়ে চুরিয়ে পরকে বেচবে, পয়সা থাকলে হাটে কিনবে আর না থাকলে সরকারী দোকানে আসবে, বার বার নতুন শোষণের মধ্যে পড়বে। এমনি সব অবাঞ্ছিত ব্যাপারও তো ঘটতে পারে। যে আজ এমনি অশিক্ষিত থেকে মদের নেশায় ডুবে থেকে নিজের শারীরিক ক্ষুধা মেটানোকেই

এতবড় বলে ভাবছে, যার মন নানা অন্ধবিশ্বাসের দরুন ভয় আর সন্দেহে ভরা, সে যে এত সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ হয়ে রয়েছে তা কি তার উন্নত মনের জন্য না তার চোখ খোলেনি বলে ? জেনে বুঝে সত্যাশ্রয়ী হয় জ্ঞানী, যে বোঝে যে ভোগের চাইতে ত্যাগ বড়, যে সংযম শিখেছে, জীবনকে সাধনা বলে জেনেছে, আদর্শকে বুঝে চোখের সামনে স্থির ক'রে রেখেছে। তেমন লোকও কখনো টলি টলি করে, হোঁচট খায় ; কখনো বা আত্মবিশ্বাস হারায়, নিজের ত্যাগ তপস্যার জন্য অনুতাপ করে। আর এখানে তো সে জ্ঞান কি সংস্কৃতির কিছু দেখি না। নিজের মদ মাংস ফুর্তি ছাড়া আর কিছু নেই। সে সত্যি কথা বলে, মিছে কথা ফেঁদে তা সামলাবার মত বুদ্ধি তার যে নেই তা নয়। কিন্তু তার সঙ্গে আছে তার মনের অনেক অজানা ভয়। যেই সে বুঝতে শিখবে সেও হবে মিথ্যাবাদী, ফন্দিবাজ, ঠক, শোষক। তার দুর্দশায় আমার খুবই দুঃখ হয়, কিন্তু তার সে দুর্দশা কেবল তার অন্নবস্ত্রের নয়, তার চেয়ে বেশী, তার মনের। এত দুর্দশায় পড়েও তার সদগুণ আছে, কী উপায় করলে তার এই সদগুণ নষ্ট হবে না অথচ যে গুণ নেই তা আসবে, মন্দ গুণ মন্দ বুদ্ধি আসবে না, সেই উপায় করতে পারা চাই। কিন্তু যত ভাবছি খালি ভাবছিই, পথ দেখতে পাচ্ছি না।

পরশুরাম বললেন—মনের এই সমস্যা কেবল ডংগরিআ কন্ধের নয়, দুনিয়ার সব মানুষের সমস্যা, কারও বেশী কারও কম। সে সমস্যা দূর হতে পারলে যুদ্ধ হিংসা মিথ্যা স্বার্থ অশান্তি অমঙ্গল সব দূর হয়ে যেত। অনেক ভেবেছেন অনেক জেনেছেন এমন লোকে তার পথ ব'লে গেছেন, হাজার হাজার বছর ধরে বলে আসছেন, কিছু হচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে কি কিছু করা হবে না ? এমনি নিঃসহায় নিরাশ্রয় হয়ে এ বেচারারা পাহাড়ে প'ড়ে থাকবে, যা রোজগার করবে বারো ভূতে খেতে থাকবে ! তাদের আর্থিক উন্নতি করতেই হবে, তাই করতে করতে ক্রমে তাদের মানসিক সামাজিক সব উন্নতি হবে। মনে মনে সেই কাজের মুসাবিদা করছি, সমস্যা এতরকমের যে সেজন্য নানানটা ভাবছি। দেখুন, ভাবুন সবাই। কিছু একটা করতেই হবে। না হ'লে আমাদেরই ভাই-বোন এরা এখনও প'ড়ে থাকবে পশুর মত, এত দুঃখ কষ্ট সইতে থাকবে, দুনিয়ায় আজ কে কী হয়ে ব'সে আছে, আর এরা যেন সেই কোন শ' শ' বছর আগেকার অতীত যুগের মানুষ এখনো। এদের জন্য কিছু না ক'রে খালি তাত্ত্বিক আলোচনা করতে থাকলে কেটে যাবে আরো কত শ' বছর, এরা এমনিই থাকবে আর নয়তো হঠাৎ এদের উপর এসে পড়বে এমন কোনো উৎকট প্রভাব যার ফলে এরা মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকতেও পারবে না।

মধুসূদন বললেন—আমি, আজ্ঞে, এদের বড় দুঃখ দুর্দশা দেখেছি।

হরি পাণি বললেন—তাতে আর সন্দেহ কী ! দুঃখ ব'লে দুঃখ ! কে ই বা কিছু করতে পারে—রাস্তা ইত্যাদির সুবিধা না হওয়া পর্যন্ত ? এরা আপনি আমাদের কাছে আসবে, না এত পাহাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে আমরাই এদের কাছে সর্বদা যেতে পারব ? আর, যে-ই আসুক, সে মানুষ তো। অসুখ-বিসুখ, বিপদ-আপদ, নানান

অসুবিধা আর মানুষের অসাধ্য পরিস্থিতি—এসবের মধ্যে সে কাজ করবে কি ? আগে দরকার কাজ করার মত সুবিধা। তা না হওয়া পর্যন্ত মুখেই সবাই হাঁ হাঁ বলবে, কাজের বেলা আর একরকম। কিন্তু কিছু একটা করতে হবে। আজকালকার যুগে কতকগুলি মানুষ এমনি অবস্থায় প'ড়ে থাকাটা সকলের পক্ষেই একটা কলঙ্ক।

তাঁরা মন খুলে যে যার মনের কথা বলছিলেন, কথা বলতে বলতে আপন চোখের সামনে আপন মনে তার ছবি আঁকছিলেন। তারপরে চুপ করছিলেন। মনে মনে সেই সমস্যা নিয়ে অনেক ভাবছিলেন। আর যখন ভাবছিলেন তখন পথ কেটে যাচ্ছিল, ভয় আর শারীরিক ক্লেশও ভোলা যাচ্ছিল। পরের সুখদুঃখের মধ্যে নিজের মন ডুবিয়ে দিলে নিজের দুশ্চিন্তা যেমন ভোলা যায়, তেমনি। আবার সে ভাবনার ঘোর পাতলা হয়ে এলে তখন মনে পড়ছিল নিজেদের তখনকার অবস্থা, ভয়, ক্লান্তি। ক্রমে সেই চেতনা তাঁদের মনের উপর সওয়ার হচ্ছিল, সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো পিছনে প'ড়ে যাচ্ছিল।

এমনি সময়ে এক জায়গায় নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে সামনে দেখা গেল একটা ছায়া। নড়ছিল, স্থির হ'ল। পরশুরামের পিছনে দলটি দাঁড়িয়ে পড়ল। পরশুরাম টর্চের আলো ফেললেন। দেখা গেল, একটি লোক। খালি গা, কৌপীন পরা, কাঁধে টাঙ্গি, বয়স কুড়ি কি পঁচিশ হবে। ডংগরিআ কন্ধ।

কে তুমি ?—পরশুরাম হাঁকলেন।

—এয়েছিলি নাকি বাবু ? যাচ্ছিস্ ? আমি টড়্পা।

দলের সবাই তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। সে প্রথমেই আবদার করলে—বিড়ি দে একটা। মধুসূদন বিড়ি বার করলেন, পরশুরাম দিলেন দেশলাই। সে বিড়ি ধরাল। তারপর দেশলাইটা মুঠো করে ধ'রে বললে—এটা আমি নিলাম, আর দেব না।

—আরে দেশলাই নিলে আমাদের অসুবিধে হবে রে—হরি পাণি বললেন।

—সে কথা আমি শুনব না। মা-বাবার কাছে না নিলে কার কাছে নেব ?

—আচ্ছা নিক, নিক—পরশুরাম বললেন—ভরতবাবুর কাছে বোধহয় আর একটা আছে।

—আছে, ভরত বললেন।

টড়্পা খুশী হল। বললে—আসছিলাম, সেই যেখানে চেটালো পাথরের নিচে ঝোরাটা আছে সেইখানে একটু বসে ধোঁয়া খেলাম। তারপরে জানতে পারলাম তোরা সব আসছিস। অপেক্ষা করলাম, তোরা দেরি করলি। বুঝলাম তোরা চলতে পারছিস না। বন তো, পথ ভুলতেও পারিস। এত রাতে তোদের মত লোক এ পথে কখনো তো দেখিনি। আন্দাজ করলাম বন দেখে তোরা ভয়ে ভয়ে চলেছিস্। ভাবলাম আমি থাকলে তোদের আর ভয় হবে না, পথ ভুলও হবে না। আগে আগে আস্তে আস্তে চলছিলাম তাই। আচ্ছা, আয়।

হরি পাণি জিজ্ঞাসা করলেন—এ বনে বাঘ আছে টড়্পা ?

টড়্পা হাসল, বলল—শুধোস না কেন, জলে মাছ আছে? আকাশে তারা আছে? বাঘ তো থাকতেই পারে, আছেই। সে যাবে কোথায়?

—কাউকে খেয়েছিল?

—খেয়েছিল? তোর খিদে পেলে তোর খাবার তুই খাবি না? কত লোককে খেয়েছে। সেই যেখানে ঝোরা আছে সেটাই তো তার বাসা।

ভরত বললেন—আর এত রাতে তুই একলা যাচ্ছিস্, তোর ভয় করছে না?

টড়্পা বললে—তুই যখন রোট (road) ধরে চ'লে চ'লে যাস্ তোর ভয় করে? রোট ধরে যেতে যেতে মোটর চাপা প'ড়ে মানুষ মরে কি না? আমি দেখেছি তো অমনি। ওট তোদের রোট, এটা আমাদের রোট। আমার কিছু ভয় নেই।

পরশুরাম বললেন—তুই বাপু এই রাতে একলা এই বনে চলেছিস্ কেন? না গেলে চলে না?

—কেমন ক'রে চলবে? টড়্পা আশ্চর্য হ'ল যে কেউ এমনটা ভাবতেও পারে। হাসল। বললে—রাতে ফসল আগলাতে তো ডংগর চড়ি, রাতে দরকার হলে তো বনের পথে বেরুই, আর আজ যে দরকার তার চেয়ে বেশী আর কিছু আছে? তুই বল।

—আরে, কাজটা কি?

—কাজ? পালটা প্রশ্ন করাই যেন তার কথা বলার ভঙ্গী। প্রশ্নটা ক'রে সে একটু ভাবলে, বললে—কাজ তো কিছু নেই, রাতে কি জমিতে কোদাল কোপাব না গাছ কাটব না পাথর ভাঙ্গব? কাজ কিছু নেই; এমনি।

মধুসূদন বললেন—বললি যে কী দরকার আছে?

টড়্পা হো হো ক'রে হেসে উঠল—দরকার; হুঁা, 'ধাংড়ী বেণ্ট'—বাবু, পেনুবালি গাঁয়ে যাচ্ছি সেজন্য।

মধুসূদন হাসলেন। বাইরে থেকে আসা আর সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন। তারপরে মধুসূদন কথাটা বুঝিয়ে দেবার পরে সবাই হাসলেন। তার মর্ম এই—ধাংড়ী বেণ্ট বলতে 'কনে শিকার'। এদের প্রথা এই যে এক গাঁয়ের যুবকেরা অন্য গাঁয়ের যুবতীদের সঙ্গে নাচবার জন্য ভিন গাঁয়ে যায়। তাদের সেখানে আদর অভ্যর্থনা করা হয়, একত্র নাচ গান হয়, রাত্রে সেখানে থেকে পিঠে পানা খেয়ে সকালে তারা ফিরে আসে। এই নাচগান মেলামেশার মধ্যে ভবিষ্যতের স্বামী-স্ত্রী বাছাবাছি হয়, ভাব আদর হয়, তার পরিণতি হয় বিবাহে।

—এত হাসচিস্ বাবু? টড়্পা বলল পরশুরামকে—আজ না বুড়ো হয়েছিস্, কোনোদিন ধাংড়া ছিলি না তুই?

—ধাংড়া ছিলাম বই কি, তবে ধাংড়ী বেণ্ট করিনি, আমাদের ও রকম চলে না।

সবাই দাঁড়িয়ে ছিলেন। উপর আর বাঁ দিক থেকে চাঁদের আলো ছিটিয়ে পড়ছিল। চারিধারে ঝুলছিল নানা চেহারার ছোট বড় ছায়া। চলন্ত জলে ঝনর ঝনর করে আওয়াজ উঠছিল যন্ত্রসঙ্গীতের আলাপের পূর্বাভাষের মত।

টড়্পা পরশুরামের মুখের দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ, তারপর বললে—যে দেশে ধাংড়ী বেন্ট নেই সে দেশের লোক মানুষ না জন্তু ?

শুনে নৃতত্ত্ববিদ্ ভরত চমকে উঠলেন। এগিয়ে এসে বললেন - কেন ?

টড়্পা বললে—দু'জনে কথাবার্তা হাসি-তামাসা নাচগান ক'রে দু'জনকার মন জানলে তবে না দু'জনে মিলে ঘর করবে, তা নইলে কেমন ক'রে হবে ? তাই বললাম তারা মানুষ নয়, জন্তু। চিনবে না জানবে না, ভালবাসবে না, আবার ঘর করবে! ওই তলদেশের লোকেরা যেমন।—অবজ্ঞায় সে নাক বাঁকালো! নুড়নুড়ে নোলকের মত তার নাকের মাকড়ি তিনটে চাঁদের আলোয় চকচক ক'রে উঠল। মুখে বললে—আমরা অমন নই, আমরা ডংগরিআ।

মধুসূদন বললে—ডংগরিআ, যারা এই নিয়মগিরির রাজা।

—তাইতো, জানিস্ তো সব।

ভরত শুধালেন—আচ্ছা, এ কি সত্যি যে তোদের ধাংড়ী তোদের কোলে বসে না, তোরা ধাংড়ীর কোলে বসিস্ ?

টড়্পার আগ্রহ বেড়ে উঠল। মাথা ঝাঁকিয়ে সে বললে—সত্যি—সত্যি—সত্যি, ধাংড়ীর কোলে আমরা বসি। বলতে আপত্তি করল না, লজ্জা করল না, বরং উৎসাহ দেখাল। বললে—দে বাবু বিড়ি আর একটা।

ভরত তার মুখে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়ে দেশলাই ধরিয়ে দিলেন। একদমে প্রায় আধ ইঞ্চি সিগারেট পুড়িয়ে ফেলে সে তাঁর ঘাড় চাপড়ালে, কাঁধ চাপড়ালে। আবার যেন বাহাদুরি দেখানোর মত ক'রে বললে—হ্যাঁ, ধাংড়ীর কোলে আমরা বসি। তুই বসিস্ নি কি বাবু ?

ভরত সবাইকে হাসি সামলাতে ইঙ্গিত করলেন। তবু অনেকখানি হাসি চাপাচুপি সত্ত্বেও ফেটে পড়ার মত শব্দ হ'ল।

হরি পাণি বললেন—আমরা জানি মার কোলে ছেলে বসে।

টড়্পা সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললে—কিচ্ছু কড়া নেই! বিড়ি থাকে তো দে। অ্যাঁ, মার কোলে ছেলে বসে ? ঠিক, ও ধাংড়ী মা নয় কি ? বল্ তুই, তুই আমি কি মা ? আমরা যে ছেলে। ধাংড়ী যে মা। আমরা ছোট থাকলে মা'র কোলে বসব। বড় হলে, ধাংড়া হ'লে যে ধাংড়ী আমাদেরকে রাজি হবে তার কোলে বসব।

হরি পাণি বললেন—আর বুড়ো হলে কার কোলে বসবি ?

টড়্পা বললে—খুব বুড়ো হয়ে যখন প'ড়ে যাব তখন আর একটি মা'র কোলে শোব। সে মাকে তুই জানিস্ না কি ?

হরি পাণি বললেন—কে ?

—কে ? এই বসুমতী, এই 'ধরতনী', সে তো সবাইকার মা, আর কে ? সেই মা'টা জন্ম দেওয়া মা'র মধ্যে আছে, ধাংড়ীর মধ্যে আছে, সব একটাই।

ভরত পরশুরামকে বললেন—এত কথা আছে ?

পরশুরাম বললেন—আশ্চর্য !

সবাই পথ চলতে শুরু করলেন ।

পরশুরাম টড়্পাকে বললেন—তাহ'লে সেই জন্য তুই যাচ্ছিস্ ধাংড়ীদের সঙ্গে একটু নাচ-গানের জন্য। পাঁচ ছয় ক্রোশ পাহাড় নেমে এসেছিস্, আরো নামবি তিন চার ক্রোশ। তোর দরকার খুব জবর বটে।

টড়্পা হাসল, বলল—গেল বুধবারের হাটে কথা দিয়েছিলাম যাব বলে, কথা ভাঙ্গব কেমন ক'রে ?

এল খাড়া উৎরাই, মিশমিশে অন্ধকার বন। টড়্পা আগে আগে চলতে লাগল, বলল—ডর করিস্ নে, কোনো ডর নেই, আমার পিছন পিছন আয়।

পরশুরাম বললেন—আরে থাম্, আমি আগে যাই, টর্চ ফেলি।

টড়্পা বললে—আমার দরকার নেই। জোয়ান লোক, আমার চোখে পথ দেখা যাচ্ছে।

যতই বোঝানো যাক সে কথা শুনলে না, এক জেদ সে আগে আগে যাবে। বললে—এ বন, এ পাহাড়, এ যে আমাদের ঘর, তোরা যে আমার অতিথি। আমি তোদের আগ বাড়িয়ে নেব না তোরা আমায় পথ দেখাবি ? আমাদের গাঁয়ের মাতব্বর লোকেরা শুনলে কী বলবে ? দাউজ মণ্ডল, লামু, বিশি মাঝি শুনলে কী বলবে ? বলবে, টড়্পা তুই ছিলি, আমাদের গাঁয়ের নাম ডোবালি ?

ভরত বললেন—আরে, জন্তু জানোয়ার থাকতে পারে—

—বনের জন্তু সব আমাদের ভাই। আসবে তো আসুক। তোদের কিছু ডর নেই।

তাঁরা ক্রমশঃ নীচে নামতে লাগলেন। এল শকটা নদীর পার ঘাট, হেঁটে পার হওয়া যায়। চওড়া নদী, প্রশস্ত বালির চর। নিচে নেমে নদী পাহাড়ের তলা ঘেঁষে ঘেঁষে বয়ে গেছে।—ওখানে নয়, এই পথে—ব'লে টড়্পা পার হবার জায়গা দেখিয়ে দিলে। বললে—আমার পিছন পিছন আয়, নয়তো ওদিকে বেশী জল।

মোটে এক হাঁটু জল, কিন্তু হীম শীতল।

ও পারের বন পাতলা, খোলা। টড়্পা বললে—এবার আমি যাব। তোদের আর ভয় নেই। আর একটু গেলে খোলা যায়গা। সেইখানে আমি যাব ডান দিকে, তোদের পথ বাঁ দিকে। আমি গিয়ে উঠব পাহাড়ে, দুই ক্রোশ উঠলে পেনুবালি। তোদের সিধে রাস্তা। বন নেই, খোলা ক্ষেত, তারপর গাঁ, তারপর 'রোটে' যাওয়ার পথ। আচ্ছা আমি যাই।

তাঁরা দাঁড়ালেন। পরশুরাম বিনীতভাবে বললেন—তোকে ধন্যবাদ। ভরত বললেন—তুই আমাদের কত উপকার করলি। এমনি তাঁরা তাকে কৃতজ্ঞতা আর সম্মান জানাচ্ছেন, সে পরশুরামের কাছে এসে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বললে—দেতো সিকি একটা, কিছু কিনে খাব।

পরশুরাম ও ভরত হাসলেন। সে আবদার ক'রে বললে—দে দে, আমার বাবার

কাছে না নিলে কার কাছে নেব ? দে, কিছু কিনে খাব।

পরশুরাম পকেট থেকে দুটো দশ নয়া পয়সা বার করলেন। ভরতের পকেট থেকে বেরুল আর একটা। টড়্পার হাতে দেওয়া হ'ল। এক এক ক'রে প্রত্যেকের কাছে এসে বললে--যাচ্ছি? যাচ্ছি? পরশুরামকে বললে—যাচ্ছি বাপ-মা? তারপরে লম্বা লম্বা পা ফেলে আগে আগে চ'লে গেল। একটু দূর থেকে শোনা গেল তার গান।

তাঁরা এগিয়ে চললেন। তরতরিয়ে পা ফেলে সে কোথায় অন্তর্ধান করেছে।

কিছু দূর গিয়ে দেখলেন রাস্তার ধারে কী পড়ে আছে, চক চক করছে। ভরত নুয়ে পড়লেন দেখতে। ধুলোর উপরে একটি দশ নয়া পয়সা। তার কাছেই তেমনি আর একটা। সবাই থামলেন। সবাই বললেন, টড়্পাড় হাত থেকে প'ড়ে গেছে।

—পয়সার উপর লোভ নেই, তবে পয়সার জন্য এমন আবদার করছিল কেন ?

বুড়ো মধুসূদন তার উত্তর দিলেন—আজ্ঞে, ওটা ওর দক্ষিণা। মা-বাপ বলে চেয়ে সে হুজুরকে সম্মান দেখিয়েছে কিনা। ডংগরিআ তো অমনিই। এত বুদ্ধি থেকেও যেন ছেলেমানুষটি। যখন যেটা দরকার তখন সেটা চাই, পেলেই হয়ে গেল। পয়সা তো তার চোখে ধুলোবালি।

তাঁরা পিছন পানে চেয়ে দাঁড়ালেন। কুয়াশা ঘেরা জ্যোৎস্না-রাত মুড়ি দিয়ে নিয়মগিরি ঘুমুচ্ছে, লাগছে যেন সত্যি নয়, স্বপ্ন।

আবার পথ চলা। পরশুরাম বললেন—এবার আলোচনা হোক। ডংগরিআ কন্ধের উন্নয়ন হবে কী উপায়ে।

আলোচনা চলল।

সুরেন্দ্র মহান্তি (1920—)

সুরেন্দ্র মহান্তির জন্ম কটক জেলার পুরুষোত্তমপুর গ্রামে। ওড়িয়া ছোটগল্পের নতুন দিক উন্মোচন করেছেন এই সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, সমালোচক ও সাহিত্যিক। তাঁর গল্পে মানুষ ও তার পরিবেশ এবং উদ্ভূত সমস্যা এক নতুন দৃষ্টিতে উপস্থাপিত হ'য়ে থাকে। ওড়িশায় জগন্নাথদেবের প্রভাবকে কেন্দ্র করে এক মহান ঐতিহাসিক উপন্যাস 'নীল শৈল' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট এর বঙ্গানুবাদ করেছেন, সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কৃত করেছেন এই উপন্যাসকে। সুরেন্দ্র মহান্তি বর্তমানে লোকসভার সদস্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ: 'মহানগরীর রাত্রি', 'রুটি ও চন্দ্র', 'মরালর মৃত্যু'। উপন্যাস: 'অন্ধ দিগন্ত'।

কাঠের ঘোড়া

শৈশবের গন্ধ আছে? তা'হলে তা গোবর-লেপা মাটির বারান্দা আর মধুমালতী ফুল এই দুইয়ের মেশামিশি একটা গন্ধ।

বেদনার ভাষা আছে? তাহ'লে তা নির্জন দুপুর, দূর প্রান্তর থেকে ভেসে আসা কার বাঁশিতে বাগীশ্বরী আলাপ।

স্মৃতির রঙ আছে? তাহ'লে তা দূর পর্বতের নীলিমা।

অশ্রুর রূপ আছে? তবে তা রাত্রি শেষের পোড়া চাঁদ।

এমনি বিভিন্ন রূপাতীত বস্তুর দ্রব্যগুণ নির্ণয় করে অভিধানের আকারে লিপিবদ্ধ করা বিজনবিহারীর 'হবি' বা জীবিকা বহির্ভূত পেশা। এতে দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর কাটাবার পর বার্ধক্যের হিমেল ছায়া নেমে আসছিল তাঁর জীবনের ধূসর প্রান্তরের উপর।

বিজনবিহারী সুদূর কর্মক্ষেত্র হ'তে অবসর নিয়ে বহু বৎসরের অনুপস্থিতির পর তাঁর প্রথম যৌবনের সেই ছোট শহরটিতে ফিরে এসেছেন।

এই শহরে একদিন শুরু হয়েছিল তাঁর জীবনে এই সব উৎপীড়ক অনুশীলন ও গবেষণা—মন্দির গির্জা চায়ের রেস্তোরাঁ থেকে আরম্ভ ক'রে বেশ্যাপল্লী ও সেইসময়ে লুকিয়ে চুরিয়ে চলতে-থাকা দু'একটি বিলাতী মদের দোকানের 'বার' প্রভৃতি নানা স্থানে ও অস্থানে।

তারপরে চরিত্রহীনতার অপরাধে কলেজ হ'তে রাস্টিকেশন, সেই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে সেদিনের এই নিম্নমধ্যবিত্ত শহরের শিষ্ট ও বিশিষ্ট সমাজে বিজনবিহারীর

প্রতি যত নিন্দা ও গালমন্দের ঝড় থেকে আরম্ভ ক'রে কলেজ মাসোহারা বন্ধ ও অবশেষে বিতাড়ন পর্যন্ত নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনা।

এর পরে উত্তর ভারতের নানা শহরের নানা ফুটপাথে ঘুরে ঘুরে জীবন-সংগ্রামের নানা শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভ করতে করতে বিজনবিহারী মানুষ হয়েছেন বা হয়েছিলেন।

কিন্তু সর্বত্র সেই অনুসন্ধান ও সেই জিজ্ঞাসা।

প্রথম চুম্বনের রূপ কী প্রকারের? বিদ্যুৎরেখার মত আঁকাবাঁকা?···মৃত্যুর রঙ কী রকমের? নীল না ঘনকৃষ্ণ?···এই তো সেদিন তিনি উত্তর ভারতের সেই দূরস্থ শহরের কর্মক্ষেত্র হ'তে বিদায় নিয়ে ট্রেনে ওঠার সময়ে শেষে জানলেন বিদায়ের যদি ধ্বনি থাকে তবে তা ট্রেনের হুইস্‌ল্‌!

দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের কর্মক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়ে আসার সময় সেদিন স্টেশনে এসেছিল কেবল তাঁর একাধারে খানসামা বাবুর্চি দারোয়ান ও বন্ধু—কেরলী খ্রীষ্টান। একখানা ময়লা রুমাল সে প্রাণপণে নাড়ছিল সিগনাল পোস্টের ওপারে ট্রেন অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত।

বিদায়ের রূপ কী?

লাট খাওয়া ময়লা একখানা রুমাল!

এই শহরে ফিরে এসে কিন্তু বিজনবিহারীর মনে হল এ যেন অন্য এক শহর··· একদা বহুপরিচিত সেই শহর নয় যার পথে পথে সেদিন আরম্ভ হয়েছিল বিজনবিহারীর জীবন অন্বেষণ।

এ অন্য এক অজানা শহর। স্টেশনে এসে নামা মাত্রই বিজনবিহারী তা স্পষ্ট অনুভব করলেন। কোথায় সেইসব কঙ্কালসার ঘোড়ায় টানা বগি গাড়ী যার কোচোয়ানদের মধ্যযুগীয় কুর্নিশে লেগে থাকত মিউজিয়ম লাইব্রেরির পুরানো কেতাবের কীটদষ্ট হলদে পাতার গন্ধ অথবা দরবারী কানাড়ার রেশ!

মিটার লাগানো ট্যাকসির ড্রাইভারদের কিন্তু সে কুর্নিশের সৌজন্য ছিলনা। তাদের আচরণে নিতান্ত ব্যবহারবাদী রুক্ষতা। ট্যাকসি চালাচ্ছে তারা ট্যাকসির আরোহীদের মতই জীবিকা অর্জনের তাড়নায়, কিন্তু সেদিনকার সেই কোচোয়ানদের মত জীবনচর্যার বিলাসে নয়। জীবন ও জীবিকার মধ্যে সেই মধ্যযুগীয় অদ্বয়তা বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁচা থেকেও বিদায় নিয়েছিল শান্তি ও সৌন্দর্য;

এ অন্য এক অজানা শহর।

এইখানে ছিলনা হর্ষবর্ধন মেস্‌?

কিন্তু ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কাউন্টারে দণ্ডায়মানা রক্তজবাধরা হ্রস্বকেশা সেল্‌স্‌ গার্লটি কখনো কি জানতে পারবেন এখানে একদা ছিল হর্ষবর্ধন মেস্‌ যার ম্যানেজার ছিলেন বাবু গোবর্ধন দাস, কোনও সরকারী আপিসের বড়বাবু? আপিস, আর মেসের হিসাব; তার পরে বাকী সময়টুকু মেসের অন্তেবাসীদের মেস্‌-বাকির তাগাদা। তারই মধ্যে আবার পূজা-অর্চনা সন্ধ্যা-আহ্নিক। নির্দ্বন্দ্ব নির্ঝঞ্ঝাট জীবন।

—ও, আপনি শাড়ীর ভ্যারাইটি চান? ঐ কাউন্টারে যান, বেশ ওআইড রেঞ্জ পাবেন।

—কস্‌মেটিক্‌স্? এ কাউন্টারে নয়।

এইখানে সেদিন ছিল রুম নাম্বার তিন, গোবর্ধনবাবুর আস্তানা। কবাটের গায়ে চক্ দিয়ে ইংরেজীতে লেখা 'নো অ্যাডমিশন ফর পাবলিক'—শান্তিসদন। ঘরের ভিতরে এক অন্ধকার কোণে একখানি হরিণের চামড়া, কমণ্ডলু, আশাযষ্টি আর ধুনুচি প্রভৃতি নানা আধ্যাত্মিক সরঞ্জাম। তার কাছে ছিটের কাপড় ঢাকা একটি চৌকির উপরে সরকারী আপিসের ফাইল, আর মেসের হিসাব।

মেস্ আর নীলু সাহুর আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার প্রায় গায়ে লাগাও ছিল তো। দোকানের সামনে ঝুলত 'আজ নগদ কাল বাকি'র উদ্‌ঘোষণা, অবশ্য সব উদ্‌ঘোষণার মত এটিও প্রতিপালিত হ'ত অনুশীলনে তত নয় যত তার ব্যতিক্রমে; তবে সে তো আমাদেরই মত কতকগুলি রিক্ত জনের জন্য!

কালি আর ঝুলে আলিবাবার গহ্বরের মত নীলু সাহুর আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের অভ্যন্তর, দেওয়ালের গায়ে বাঁধা খদ্দেরদের বাকী হিসাব—খড়ি দিয়ে লিখে আবার সব মোছবার মোজেইক্।

একবার ঘটনাচক্রে প'ড়ে শেক্‌স্‌পিয়রের কমপ্লীট্ ওঅর্কস্ বাঁধা দিতে হয়েছিল সেখানে। ট্র্যাজেডির অধ্যাপক কলেজে শেক্‌স্‌পিয়রের মহানাটকগুলিকে যেন তিক্ত ও বিস্বাদ ক'রে দিয়েছিলেন। নীলু সাহুর আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে রেষারেষি ক'রে পুরো দুই সের রসগোল্লা পার ক'রে দেওয়ার পর অবশেষে দাম বাবদে ঐ গ্রন্থটি বাঁধা রাখতে হয়েছিল সেদিন। নিলু সাহুর দেওয়ালে বিজনবিহারীর নামে খড়িতে লেখা বাকী হিসাব, দেওয়াল বেয়ে নামতে নামতে মেজে অবধি এসে পৌঁছেছিল তখন। কাজেই নীলু সাহুর সে বন্ধন হ'তে শেক্‌স্‌পিয়র শেষ পর্যন্ত বোধহয় আর মুক্তি পাননি। কিন্তু এখন সেখানে শীততাপনিয়ন্ত্রিত এক সিনেমা-প্যালেস। ম্যাটীনিতে আছে আমেরিকান ফিল্‌ম্, সামনে তারই পোস্টার আঁটা। বিবসনা অভিনেত্রীটি একখানি কৌপীনের আবরুও রাখেনি।

ছবিতে অভিনেত্রীর গায়ের রঙ ঘনকৃষ্ণ হ'লে বিজনবিহারী দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রার্থনা করতেন—হে উলঙ্গিনী মহাভয়ঙ্করী, আমাদের একটু লজ্জা দাও, সব গ্রাস কর—আমাদের লজ্জাটুকু বাদ দিয়ে।

ছবির নাম: দি নাইট ইজ ডার্ক—রাত্রি অন্ধকার। ফর্ অ্যাডাল্টস্ ওনলি। দুইজন পলিতকেশ বৃদ্ধ প্রাচীর পত্রের সেই ছবির দিকে চেয়ে দেখছিলেন। আঁটো প্যান্ট বা পায়জামা পরা জনকয়েক বালক বালিকা আইস্‌ক্রীম চুষতে চুষতে অনিমেষে চেয়ে ছিল সেই বিজ্ঞাপনের দিকে, ক্লান্তি আসছিল না তাদের।

এ যুগ নপুংসক ক্লীবত্বের যুগ।

তাই যৌনচর্চার এইসব উত্তপ্ত বিজ্ঞাপন না দেখলে সৃষ্টি ক্রিয়া বুঝি স্তব্ধ হয়ে যেত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালীন পঞ্চবার্ষিক যোজনায় লালিত ও পরিবর্ধিত বণিক

নন্দনের মত স্ফীতদেহ এ অন্য এক শহর। বিজনবিহারী এখানে সম্পূর্ণ অজানা আগন্তুক।

কোথায় রাস্তার ধারের সেইসব 'ভুতিআরি' আর 'গউড়গোবিন্দ' ফুলের জঙ্গল ? কোথায় সেসব বাঁশ-ঝাড় যেখানে বিজনবিহারী প্রতিদিন মধ্যাহ্নে শুনতেন ঘুঘুর গুমরানি, 'কুন্তাটুআ'র বিলাপ ? সেখানে এখন আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে পাঁচতলা সাততলা ইমারতের ক্ষুধিত লৌহ কঙ্কাল, প্রাগৈতিহাসিক রক্তমুখ দেবতাদের মত। তাদের পায়ের তলায় শত শত কুলির ঝুপড়ি : টিন চট আর দরমার জঙ্গল।

সেদিন তাই এই অজানা অন্য শহরে বিজনবিহারী তাঁর চেনাজানা দিন আর মানুষগুলির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক গলির মোড়ে দূর অতীতের সেই বহুপরিচিত ফুলওয়ালাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে যেন অকূলে কূল পেলেন।

গত ত্রিশ বৎসরের সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ মড়ক-মহামারী পরিবর্তন বিবর্তনের মধ্যে এই ফুলওয়ালাটিই যেন কেবল অপরিবর্তিত থেকে গেছে, ভাঙ্গন ধরা নদীর পাড়ের কোন কালের বুড়ো শিরিষ গাছটার মত।

বিজনবিহারীকে সে চিনতে পারলে কিনা কে জানে। চশমার কাঁচের নীচে তার চোখ দুটো দেখাচ্ছিল মরা মাছের চোখের মত ফেকাশে প্রাণহীন। পাকা ও পাকানো গোঁফ জোড়াটিতে লেগে ছিল পুরানো পৃথিবীর স্পর্শ। ত্রিশ বৎসর আগে এইখানে যেন একখানি কাঠিতে বেল আর বকুলের মালা ঝুলিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় এসে দাঁড়াত সে।

—একটা বেলফুলের মালা দাও তো—না, দুটো দাও। অ্যাঁ, বারো আনা ? মানে পঁচাত্তর পয়সা ?

—মানুষের জীবন ছাড়া আর সবকিছুরই দাম বেড়েছে আজ, পঁচাত্তর পয়সার একটি পয়সাও কম নয়।

—খুচরো নেই ? আচ্ছা, এই টাকা নাও···চিনতে পার ? মনে পড়ে না ? ভাল ক'রে মনে কর···কিশোরী বাঈয়ের ঘর ছিল না এইখানে, এই গলিতে ?

ফুলওয়ালা বুড়োর রেখাকুঞ্চিত মুখ চেনা মানুষকে বহু বৎসর পরে হঠাৎ দেখতে পাওয়ার আনন্দে ঢেউ ওঠা জলের উপর সূর্যের আলোর মত ঝলমল ক'রে উঠল।

—নাও, ধরাও এই সিগারেট। ফুলওয়ালা বুড়োকে অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত করতে বিজনবিহারীর এক মুহূর্তও লাগেনি।

চৈত্রের মল্লিকার সুগন্ধেরও একটা রূপ আছে···নূতন উষার, শুচিতার, স্নিগ্ধতার, অপাপবিদ্ধ কৈশোরের রূপ।

প্রত্যেক সন্ধ্যায় অন্য শহরের সেই বুড়োর কাছ থেকে বেলফুলের মালা কেনা ক্রমে বিজনবিহারীর এক নিত্য কর্মে দাঁড়াল।

সেই অবকাশে এই অজানা শহরে ফুলওয়ালা বুড়ো ছাড়া আর যে দ্বিতীয় ব্যক্তিটির

সঙ্গে বিজনবিহারীর চাক্ষুষ পরিচয় ঘটল সে এক পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক। সেও ফুল কিনতে প্রতিদিন সেখানে আসত একটা স্কুটারে চড়ে।

ড্রেনপাইপ ট্রাউজার, টেরিলিন শার্ট, মাথার চুল আধা বাবরি, গলায় লাল সিল্কের রুমাল। অন্য শহরের কোনও এক বীটনিক্।

কিন্তু এক দণ্ড না দাঁড়ালে কি আলাপ জমে? বিজনবিহারী সেই বীটনিকের সঙ্গে আলাপ করার জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'তে স্কুটার ক্রুদ্ধ গর্জন ক'রে সেই সিটি হোটেলের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

—এই বাবুটি কে? তোমার বাঁধা খদ্দের দেখছি?—একদিন বিজনবিহারী শুধালেন।

ফুলওয়ালা বুড়ো উত্তর দিল—এ দুনিয়া টাকার দুনিয়া বাবু! পয়সা ছাড়া এখানে আর কে কাকে চিনছে?

বুড়োটি অন্য শহরের দার্শনিক।

—নাও, সিগারেট নাও। কী না যেন তোমার নাম?

—বনওআরী, বনওআরী! বনওআরীলাল নামটা তাহ'লে ভুলে গেলে, বাবু?

নিজের নামটা ব'লে ফুলওয়ালা বুড়ো অকারণে হেসে উঠল। কেন কে জানে!

—কিশোরী বাঈয়ের ঘরে আজকাল কারা থাকে?—বিজনবিহারী শুধোলেন।

বনওআরী ছিল সেদিন এই গলির সচল গেজেট, অথবা কী-বোর্ড। কার ঘরে কে এসেছে বা কে আসবে, কার ঘর আজ খালি—গলির মোড়ে বনওআরীলালের কাছে মিলত সে সব খবর।

সেজন্য কিন্তু বেল চাঁপা বা বকুলমালার উচিত মূল্যের চাইতে বেশী নেবার কোনও চেষ্টা বা অভিপ্রায় ছিলনা বনওআরীর।

বহুদিন আগাছায় ঢাকা প'ড়ে থাকা ভাঙ্গ ধসা কুয়োর মত সেইসব দিনের স্মৃতির ভিতরে ডুব দিয়ে হাতড়াচ্ছিল যেন বনওআরীলাল। বিজনবিহারী শুধোলেন আবার সেই অবান্তর প্রশ্ন নিতান্ত অকারণে—কিশোরী বাঈয়ের কী খবর আজকাল?

বনওআরী এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল—কিশোরী বাঈদের ব্যবসা এখন অচল। ঘরে ঘরে ঠাকুর বাড়ী…। বনওআরীলালের বেপরোয়া হাসিতে বিজনবিহারী অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন, যেন এ প্রশ্নটা করা উচিত হয়নি।

কিশোরী বাঈয়ের আখড়ায় বহুবার শোনা ভজন আর চউপদীর মূর্ছনা যেন হঠাৎ রণিয়ে উঠছিল: 'বন্ধু, মাগুণি এতিকিরে' (বঁধু, এইটুকু চাওয়া)…'জান খাও মেরে পরদেশিআ' ভৈরবী ঠুংরি।

বনওআরী বললে—মিউনিসিপালিটি-ওয়ালারা শহর নির্মল করার জন্য কবে থেকে এদের এখান থেকে তুলে দিয়েছে। একজন কিশোরী বাঈয়ের জায়গায় এখন যে শ' শ' কিশোরী বাঈ।

বনওআরী আবার যেমন অট্টহাস্য ক'রে উঠল তাতে একদা কুখ্যাত এই গলির

মোড়ে বিজনবিহারীকে কেউ দেখল নাকি এই আশঙ্কায় তিনি ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। অবচেতনে ঝুলের মত তখনও বুঝি ঝুলছিল তাঁর সে সব আশঙ্কা।

একটা দামী মোটর গাড়ী মসৃণ সাম্রান্তে গা দুলিয়ে সেই গলির মধ্যে ঢুকে গেল। বিজনবিহারী শুধোলেন—এ গলিতে আজকাল তাহলে আর কারা থাকে বনওআরী? কমলা রাধা ভুবনমোহিনীর দল সব গেল কোথায়?

বনওআরী জিভ কেটে উত্তর দিল—এ গলি কি আর সে গলি আছে? এ এখন এক রোড—এক নেতার নামে! কিশোরী বাঈয়ের ভিটেয় এখন উকিল বাড়ী, ভারী নামজাদা। ভুবনমোহিনীর চাতাল আর বকুলগাছ যেখানে ছিল সেখানে এখন নেতাদের আস্তানা, তার ওপাশে থাকে খবরকাগজওয়ালা একজন বড়বাবু। এসব এখন বড় বড় ভদ্দরলোকেদের মহল্লা।

কিশোরী বাঈয়ের দলের দেহ ছিল পণ্য, কিন্তু তাদের প্রাণ ছিল জীবিকার ঊর্ধ্বে; কিন্তু এই নতুন কিশোরী বাঈদের দেহের সঙ্গে আত্মাও আজ পণ্য। উত্তর ভারতের সেই শহরে বিজনবিহারী বহু অক্ষত দেহ দেখেছিলেন, কিন্তু অক্ষত আত্মার হদিস্ পাননি কোথাও।

যমুনার কথা মনে পড়ল।

রিট্‌জ্ হোটেলের রিসেপশনিস্ট···ঠোঁটে গোলাপী লিপস্টিক্। গালে রুজ্। পিঠের দিকে ব্লাউজের উল্টো ত্রিকোণটি বেশ গভীর ও রেখাঙ্কিত, গলায় ঝুটা মুক্তার মালা। বব্ করা চুল। রিট্‌জ্ হোটেলের রিসেপশনিস্ট কাউন্টারের কাছে যমুনাকে দেখায় ফুলদানীতে ক্যানা ফুলের গন্ধহীন ম্লান স্তবকের মত। শস্তা স্টেশনারির এই লোভনীয় বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে বিজনবিহারী সেদিন এখানে এসেছিলেন দরদী আত্মার সন্ধানে। কিন্তু পেয়েছিলেন এক মসৃণ লোভনীয় দেহের নীচে একটি কীটদষ্ট আত্মা।

—তুমি প্রেমে বিশ্বাস কর, যমুনা?

পালাম বিমান বন্দরে যাবার রাস্তার ধারে নির্জন কংকরময় প্রস্তর-দস্তর এক আদিম প্রান্তর। আকাশে কিশোরী শুক্লাতিথির লজ্জাবতী চাঁদ মেঘের রেশমী ওড়নার আড়াল থেকে এক একবার মুখ বের ক'রে চেয়েই আবার মুখ লুকোচ্ছিল যেন নিজেকে আরো আকর্ষক ক'রে তুলতে। যমুনা সেদিন সন্ধ্যায় পরেছিল মাস্টার্ড রঙের একখানা শাড়ী, কিশোরী জ্যোৎস্নার আলোর সঙ্গে মিলে হয়েছিল অদ্ভুত সিম্ফনি। যমুনাকে দেখাচ্ছিল অশরীরী স্বপ্ন-নায়িকার মত, কিন্তু তার দুটি চোখে ছিল যে সরীসৃপের ক্ষুধিত বহ্নিশিখা তা যেন সেই পরিবেশের সঙ্গে ছিল বেসুর বেখাপ্পা।

যমুনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিয়েছিল—আমি বিশ্বাস করি প্রয়োজনে।

বনওআরীলালের কথায় বিজনবিহারীর স্মৃতিচারণে বাধা পড়ল। বনওআরীলাল বিজ্ঞজনোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলছিল—কিশোরী বাঈয়ের দল আজ এ শহরে থাকলে তাদের পেট চালানো দায় হ'ত।—আবার সেই প্রাণখোলা হাসি।

বিজনবিহারী ও বনওআরীর মধ্যে সেইসব পুরোনোদিনের স্মৃতি-রোমন্থন হঠাৎ সেই স্কুটার বাহন বীটনিক খদ্দেরের স্কুটারের শব্দে বাধা পেয়ে থামল। স্কুটার-আরোহী বনওআরীর কাছ থেকে পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে একটি বেলফুলের মালা নিয়ে গমনোদ্যত, বিজনবিহারী তার সঙ্গে আলাপ করার জন্য বললেন—এই যে! তোমার আজ দেরি দেখে আমি ভাবছিলাম তুমি বুঝি আজ আর এলে না।

আরোহীর মুখে চোখে যে ভাব ফুটে উঠল তাতে ছিল সুস্পষ্ট এই কথা—অন্যের ব্যাপারে এ নাসিকা প্রবেশ কেন? হুঃ—স্কুটার একটা অবজ্ঞার ফুৎকার ছেড়ে গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। বনওআরীরও শেষ মালাটি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল, সে ক্লান্ত ভাবে একটা হাই তুলে তার পথে চ'লে গেল।

কিন্তু আজ সেই লোকটিকে যেখানেই হোক ধরে তার কাছ থেকে জানতে হবে বেলফুলের গন্ধ তাকে এনে দেয় কোন বিস্মৃত অথচ অবিস্মরণীয় অতীতের স্মৃতি যার আকর্ষণে সে প্রতিদিন ছুটে আসে বনওআরীর কাছে, বেলফুলের মালার জন্য। বিজনবিহারী স্কুটারের পিছন পিছন এক সাইকেল রিকশায় চ'ড়ে বসলেন।

ছোট শহরটি হঠাৎ যতই অচেনা হয়ে উঠুক বহু গলি উপগলিতে অভ্যস্ত বিজনবিহারীর দেরি হলনা সেই স্কুটারচড়নদারকে খুঁজে বার করতে—টেলিফোন এক্সচেঞ্জ গলির সেই 'বার'-এর ভিতরে।

'বার'-এর ভিতর থেকে ছায়ামূর্তির মত এক এক ক'রে বেরিয়ে আসা খদ্দেরদের ঢেঁকুর অথবা হ্রেষারব ব্যতীত অন্য কোনো শব্দ ছিলনা। গলি ক্রমে নির্জন হয়ে আসছিল।

'বার'-এর সামনে সেই স্কুটারটি দাঁড়িয়ে—একটা কাঠের ঘোড়ার মত। বিজনবিহারী পকেট বুকে লেখা নম্বরের সঙ্গে স্কুটারের নম্বর মিলিয়ে দেখলেন, আশমানী রঙের সেই সুপরিচিত স্কুটার। বিজনবিহারীকে ফাঁকি দেওয়া কি সহজ! স্কুটারের চড়নদার প'ড়ে থাকতে পারে জেম্‌স্ বণ্ডের গোয়েন্দা উপন্যাস সিরিজ, বিজনবিহারীও তাই ব'লে তাঁর বয়সকালে কম পড়েননি এডগার ওআলেস্ আর আগাথা ক্রিস্টি।

বারের ভিতরে খদ্দেরের ভিড় ছিলনা। একটা গোল টেবিলের চারিদিকে কারা তিন জন শোকসভা করার মত নীরবে মাথা নিচু ক'রে ব'সে ছিল। অ্যাশট্রের ভিতর থেকে পোড়া সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছিল।

কাউন্টারের মুখোমুখি স্কুটারের আরোহী সেই বীটনিক একলা ব'সে ছিল, সামনে একটা খালি গ্লাস নিয়ে। গ্লাসের ভিতরে তাকিয়ে সে কী ভাবছিল কে জানে। সন্ধ্যাবেলা বনওআরীলালের কাছে কেনা সেই বেলফুলের মালাটি টেরিলিনের হাওয়াই শার্টের বুক পকেটের ভিতর থেকে সামান্য বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল।

বিজনবিহারী তার কাছে এসে সৌজন্য সহকারে জিজ্ঞাসা করলেন—এখানে বসতে পারি?

বিজনবিহারীর দিকে কাঁচের চোখের মত দুই অভিব্যক্তিহীন চোখে সে কয় মুহূর্ত

চেয়ে রইল। তার পরে যে চেয়ারখানির উপর ছুছুন্দরমুখো জুতো পরা দুই পা মেলে সে বসেছিল—কোনো এক পরাজিত সেনাপতির মত—সেখানা পায়ে ঠেলে দিয়ে বলল—হাঁা, বসতে পারেন। কিন্তু আপনার বিল আপনার। কণ্ঠে তার ব্যবসায়ীসুলভ খাড়া খাড়া কথা।

বিজনবিহারী প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়। খালি আমার নয়, আপনারও। বয়,—আপনার কী দরকার? আমার একটা জিন হলেই চলবে, গিমলেট্।

নিস্পৃহ গলায় সে উত্তর দিল—বয় জানে আমার যা দরকার।

বিজনবিহারীর জন্য একটা গিমলেট আর তার জন্য একটা গ্লাসে প্রায় দুই পেগ পরিমাণ যে পানীয় বয় এনে রেখে দিয়ে গেল তা বোধহয় স্বদেশী। তার উৎকট গন্ধ এক অশ্লীলতার মত বিজনবিহারীকে চমকিয়ে দিল। সে কিন্তু এক ঢোঁকে গ্লাসটি নিঃশেষ ক'রে অম্লান বদনে বাঁ হাতের তেলো দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে একটা সিগারেট ধরাল।

বিজনবিহারী গিমলেটের গ্লাসটি মুখের কাছে তুলে ধ'রে বললেন—আপনি বেলফুলের বড় ভক্ত, আমি বেশ লক্ষ করে দেখেছি। কিন্তু বেলফুলের গন্ধ আপনাকে কি স্মরণ করিয়ে দেয় বলুন তো শুনি?

সে কোনো উত্তর দিলনা। পুনরায় এক প্রস্থ গিমলেট আর স্বদেশী ভদ্কার পরে বিজনবিহারী সেই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। আজ যে সুবিধা পাওয়া গেছে সে সুবিধা হয় তো আর কখনো পাওয়া না যেতে পারে। কাজেই এই মূল্যবান তথ্যটি আজ এইখানে আবিষ্কার করতেই হবে। অপ্রসন্ন কণ্ঠে সে উত্তর দিল—আমি বেলফুলের মালা কিনি কোনো স্মৃতি মনে করার জন্য নয়, আমি কিনি সেই 'বিচ্'টার জন্য। বেলফুল তার ভারী প্রিয়।

কিন্তু কে সেই মল্লিকাপ্রিয় 'বিচ্' বা কুক্কুরী? আর কেই বা এই নব্য সহজিয়া কুক্কুরীপাদ? বিজনবিহারী কিছু বুঝতে পারলেন না। সে কিন্তু নিজে থেকেই সে রহস্য উদ্ঘাটন করে বলল—এক্সচেঞ্জের অপারেটার মনীষা···মণি···আজ আসতে এত দেরি কেন করছে কে জানে! হয়তো চ'লে গেছে কোনো সেকেণ্ড শো সিনেমায়।

বিজনবিহারী একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ ক'রে ধীরে সুস্থে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেড়ে পেশাদার মনস্তাত্ত্বিকের মত জিজ্ঞাসা করলেন—কার জন্য আপনি বেলফুলের মালা কেনেন তা জেনে আমার লাভ নেই। যৌবনে ঐ রকম বিচ্দের দংশন আমাকেও কম ভোগ করতে হয়নি, তবু তাদের জন্য মল্লিকার মালা কিনতে হয়, অপেক্ষাও করতে হয়। যৌবনের সে একটা অকুপেশনাল ডিজীজ্, বৃত্তিজনিত ব্যাধি—ছাপাখানার কম্পোজিটারের যেমন লেড্-পয়জনিং। আমার প্রশ্ন কিন্তু—মল্লিকার সৌরভ আপনাকে কী স্মরণ করিয়ে দেয়? অতীতের কোন ঘটনা ও পরিবেশ?

সে আর এক প্রস্থ দেশী ভদ্কার জন্য ঘড়ঘড়ে মোটা গলায় অর্ডার দিল।

বিজনবিহারী কিন্তু প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ব'লে চললেন—উদাহরণস্বরূপ এই ধরুন মল্লিকার মৃদু সুগন্ধ আমায় মনে করিয়ে দেয় বৎসর ও কালের পারাবারের ও পারে এক পল্লীগ্রামে একটি স্কুল-বোর্ডিং-এর ঘর। ছায়াঢাকা বাদামী রঙের গ্রীষ্মের সকাল, তখনও স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেনি। ঘুম ঘুম চোখে সকালের প্রার্থনার জন্য ছেলেরা চলেছে সুদাম পণ্ডিতের দাওয়ায়, 'অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি মো জীবনস্বামী'র প্রথম লহর উঠছে। শঙ্কা সঙ্কটহীন পৃথিবীর একটি অপাপবিদ্ধ সকাল, দাওয়ার নীচে রাশি রাশি বেলফুলের মউ-মউ করা গন্ধের মধ্যে দিনটি যেন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে, আজও কখনো মুহূর্তের জন্য হঠাৎ তেমনি জেগে ওঠে···এক মুঠো বেলফুলের মধ্যে। আর আপনার?

সেই লোকটি অকারণ রুক্ষতায় ফেটে প'ড়ে ব'লে উঠল—আমরা সবাই আজ চাই সব ভুলে যেতে। অতীতের রোমন্থনের জন্য তোমার মত ইডিয়টরা বেলফুলের মালা কিনতে পারে, কিন্তু আমি কিনি কেবল সেই বিচ্‌টার জন্য।

তারপর একটা অশ্লীল উদ্গার তুলে সে টেলিফোন-বুথের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল, বোধহয় মনীষাকে টেলিফোন করতে। চেয়ার থেকে টলতে টলতে উঠে যাওয়ার সময় মল্লিকার মালাটি তার পকেট থেকে বেরিয়ে প'ড়ে গেল। কিন্তু এত যত্নে কেনা মালাটি হাতে করে তুলে নেওয়ার তার ধৈর্য অথবা অভিলাষ ছিলনা। তার জুতোর তলায় ফুলের মালাটা পিষে গিয়ে তেমনি প'ড়ে রইল।

বিজনবিহারী কাউন্টারে বিল চুকিয়ে বাইরে এলেন। স্কুটারটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে একটা কাঠের ঘোড়ার মত।

অন্য শহরের সেই গলিপথ নিয়ন-আলোকে দেখাচ্ছিল ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়া কোনও রোগীর বিমর্ষ মুখের মত। এ নিদ্রা বিশ্রামের প্রশান্তি নয়, দুই যন্ত্রণার মাঝে একটি বিরতি মাত্র।

বামাচরণ মিত্র (1915—1975)

ওড়িয়া ছোটগল্পের একজন প্রথম সারির লেখক বামাচরণ কটক জেলার পুরুষোত্তমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের কথাকার তিনি। তাঁর লেখায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিচিত্র সমস্যা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিত্রিত হয়েছে। উচ্চ সরকারী পদে কাজ করেছেন কিছুকাল পরে ভুবনেশ্বরে আইন ব্যবসায় রত ছিলেন। যুগ্মভাবে সুরেন্দ্র মহান্তির নীল শৈলের বঙ্গানুবাদ করেছেন, যা বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিশিষ্ট গল্পগ্রন্থ: 'নরছঞ্চান'. 'বট মহাপুরুষ', 'পাষাণর প্রাণ'।

ধর্মক্ষেত্রে

ফাল্গুন মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীর সকাল। পূব দিক ক্রমে সিঁদুরে হয়ে উঠছে। এত সকালেও কোথা থেকে একটি কোকিল কুশভদ্রা নদীব বাঁধের উপর আম বাগানে একলা ব'সে আকুল হয়ে ডেকে চলেছে।

রাম পধানের নাতি, নবঘনর ছেলে শ্যামঘন অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে নদীর পাড় বেয়ে নেমে চলল যেখানে জলের ধারাটি বয়ে চলেছে দু'পাশের বালুশয্যার মাঝ দিয়ে। আট বৎসর পরে সে গাঁয়ে ফিরেছে ডাক্তার হয়ে। আজ সকালেই কেন জানি মনটা তার হঠাৎ আনন্দে ভ'রে গেছে। সে আনন্দ যেন কেবল খুশী হওয়া নয়, তার চেয়ে আরো কিছু বেশী। যে দিকেই চায় সব সুন্দর মনে হয়, এমন কি খিড়কির পচা পুকুরটি আর শুকুটার মায়ের শুকনো পাতার গাদাটিও; আবার সে আনন্দের মধ্যে কী একটা অজানা বেদনা যেন মিশে গিয়ে তাকে রসঘন ক'রে তুলেছে। অথচ কীসের জন্য এমনটা লাগছে তার কিছু কারণ খুঁজে পেল না সে। ঘরের ভিতর রইতে পারল না, রাত পোহাতেই বেরিয়ে পড়ল কুশভদ্রা নদীর দিকে, ছেলেবেলা থেকে দেখে দেখেও যার নানারূপের সে অন্ত পায় নি. তৃপ্তি পায় নি। কুশভদ্রা ছিল যেন তার বন্ধু, গুরু, পথের দিশারী। বহুদিন পরে আজ কুশভদ্রাকে দেখে তার বেদনা-আনন্দ আরো তীব্র আরো ব্যাপ্ত হয়ে উঠল।

পনের বছর আগে এমনি একটি দিনে নদীর ওপারের গাঁ আহম্মদপুরের মুসলমান আর এপারের গাঁ কুশুপুরের হিন্দুদের মধ্যে হোলিখেলা নিয়ে দাঙ্গা হয়ে তার বাবা নবঘন আর রহিম 'অজা' (জাদু)-র ছেলে আবদুল কাকা দু'জন দু'জনকে মেরে এই

নদীর বালুচরে জড়াজড়ি ক'রে চিরদিনের মত শুয়ে পড়েছিলেন। সে দাঙ্গার কারণ ছিল আবার শ্যামঘন নিজে। তার তখন আট বছর বয়স। সে তার রহিম দাদুর দাড়িতে আবির লাগিয়ে দিয়েছিল ব'লে দুই গাঁয়ের মধ্যে মারিমারি কাটাকাটি লেগে গিয়েছিল, অথচ পধান বংশ ও খলিকা বংশের মধ্যে অভেদ্য প্রীতি ছিল বহু যুগের—এখনও আছে ; যদিও পরস্পরের গাঁয়ের লোকেদের জন্য তার বাহ্য প্রকাশ অনেক ক'মে গেছে। কিন্তু তা যে আজ আবার এক নূতন ও অভিনব পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার সময় এসেছে তা কে জানত।

শ্যামঘন এপারে জলে নামতে গিয়ে দেখল ওপারে একটি যুবতী তরতর ক'রে জল থেকে উঠে যাচ্ছে। হঠাৎ শ্যামঘনকে দেখে সে এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। আর সেই এক মুহূর্তের মধ্যে সব উলট-পালট হয়ে গেল দু'জনের অজান্তে। ক্ষুদ্রবীজের ভিতরে যেমন বিরাট বটবৃক্ষ থাকে তেমনি সেই একটি মুহূর্তের ভিতর রয়ে গেল অনেক কথা।

যুবতীটির মুখে কে যেন এক মুঠো আবির ছড়িয়ে দিল। ক্ষণিকের জন্য সে বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে শ্যামঘনর দিকে চেয়ে রইল, যেন দুটি নীল সালুক ফুটে উঠল। কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ। ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশের চূর্ণকুন্তলগুলি মুখের উপর প'ড়ে মনে হচ্ছিল কুশভদ্রার গাঢ় নীল স্রোত সোনালী বালির উপর বয়ে যেতে যেতে ছোট ছোট ঘূর্ণি সৃষ্টি ক'রে গেছে। সিক্ত বসনের নিচ থেকে গুরুনিতম্ব ঘনবক্ষ ও সুপুষ্ট নিটোল জঘনতট শ্যামঘনর প্রত্যেক শিরায় যেন আগুনের স্রোত ছুটিয়ে দিল। যে আনন্দে অদূরের পলাশবন জ্বলছে, সেই আগুন যেন তার শিরায় ছড়িয়ে পড়ল। শ্যামঘন এত রূপ আগে কখনও দেখেনি কিম্বা দেখলেও বুঝতে পারে নি। তার মনে হল শ্রীরাধা যমুনায় স্নান ক'রে শ্যামকে দেখে ফেলার ভয়ে ত্বরা ক'রে ঘরে ফিরে চলেছেন।

যুবতীর অঙ্গেও সেই আগুন লেগেছিল বুঝি। অপাঙ্গ দৃষ্টিতে শ্যামঘনর দিকে একবার চেয়েই সে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। শ্যামঘনর সুন্দর শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, উদাস চাহনি দেখে তার মনে হল ঠিক যেন এঁরই জন্য সে আপনার অজান্তে অপেক্ষা ক'রে ছিল এতদিন। নয়তো যে বড় হয়ে ইস্তক আর নদীতে স্নান করতে আসে নি সে আজ সকালে জেদ ধ'রে ঠাকুরমার কাছ থেকে অনুমতি আদায় ক'রে নদীতে আসবে কেন? এঁকে দেখামাত্র কেন জানি ঠাকুরদার প্রিয় গানটি বার বার মনে পড়ে—'বলমা রে চুনরিআ ময়্যকো লাল রঙ্গা দে' (হে প্রিয়, আমার বুকের বসন লাল রাঙিয়ে দাও)। কিন্তু মুখ থেকে বেরুল ভয়ার্ত স্বর—ইয়া আল্লা! ভয় তার শ্যামঘনকে নয়। মুহূর্তের মধ্যে জীবনে তার যে উলট-পালট হয়ে গেল তাকেই। মন তার অজানা আনন্দে ভ'রে গেল তাকেই। মন তার এক অজানা আনন্দে ভ'রে গেল সত্যি, কিন্তু দেহ তার ভয়ে কেঁপে উঠল। তার 'ইয়া আল্লা'য় আনন্দ ছিল, ভয়ও প্রকাশ পেল।

'ইয়া আল্লা' শুনে শ্যামঘন চমকে উঠল। এ তবে আবদুল কাকার মেয়ে

হাসনুবানু—যাকে ছেলেবেলায় এই কুশভদ্রার জলে ডুবে যাওয়া থেকে আপন জীবন বিপন্ন ক'রে রক্ষা করেছিল! তবে কি কুশভদ্রা সত্যি হাসনুকে টেনে নিচ্ছিল, না একটা ষড়যন্ত্র করছিল কেবল? শ্যামঘন বড় বড় চোখ ক'রে কুশভদ্রার দিকে চাইল। তার মনে হল বয়ে যেতে যেতে কুশভদ্রা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। শ্যামঘন জলে একটা চাপড় মেরে আপন মনে বলে উঠল—দুষ্টু! এ কী করলি? শ্যামঘনর মুখে আনন্দ ভয় বিস্ময় হতাশা একসঙ্গে খেলে গেল। তার মুখ থেকে বেরুল—হায় রাধাবল্লভ, এ কী করলে!

রাধাবল্লভ নাম শুনে হাসনু চমকে উঠল। সে জানে যে পধান বংশের লোক কথায় কথায় তাদের কুলদেবতা রাধাবল্লভের নাম নেয়। তবে কি ইনি শ্যামঘন, যিনি আমায় এই নদীতে ডুবে যাওয়ার থেকে বাঁচিয়েছিলেন? এ কথা ভাবামাত্র হাসনুর প্রতি অঙ্গে পুলক জেগে উঠল, কিন্তু ভয়ে সে প্রায় অজ্ঞান। কোনোমতে সে নিজেকে সামলে নিল, কিন্তু তার মুখ থেকেও বেরুল—ইয়া আল্লা, ময় অব্ কেয়া করুঁ!

দুজনেই বুঝল তারা প্রেমে পড়েছে, তার পরিণাম চিন্তা ক'রে দুজনেই শঙ্কিত হল। দু'জনে ভিন্ন ধর্মের, এমন ভিন্ন যে দুই ধর্মের লোকের মধ্যে শত শত বৎসরের গ্লানি ও শত্রুতা শেষে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। তবু সে শত্রুতা যায় নি। সামান্য সামান্য কারণে দু'জন দু'জনকে মারছে. কাটছে, নানা বীভৎস কাণ্ড করছে। মাত্র কিছুদিন আগে মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো নিয়ে কত খুনখারাবি হয়ে গেছে, কত নিরীহ লোকের ঘর পুড়ে ছাই হয়েছে। আবার এ বছর কুশুপুরের লোক দোল পূর্ণিমায় আহমদপুরের মস্‌জিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে গোবিন্দ-পুরের ঠাকুর মেলনে যাবে এমনি মতলব আঁটছে। সে খবর পেয়ে আহমদপুরের মুসলমানরাও তৈরী হচ্ছে। গোবিন্দপুর ও কুশুপুরের মধ্যে ঠাকুর নিয়ে রেষারেষির ফলে মারপিট হয়ে বছর ত্রিশেক হল শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর গোবিন্দপুর মেলনে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কেবল তাই নয় দুই গাঁয়ের মধ্যে ঝগড়া এতদূর গিয়েছে যে এ গাঁয়ের লোক দৈবাত ও গাঁয়ের লোককে নিজের গাঁয়ের কাছাকাছি একলা পেলেই আচ্ছা ক'রে পিটিয়ে ছেড়ে দেয়। এখন পর্যন্ত শ'খানেক ফৌজদারী মামলা আদালতে ঝুলছে। কিন্তু এই বছর দুই গাঁয়ের লোক ব'সে নিষ্পত্তি করেছে যে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ গোবিন্দপুর মেলনে যাবেন এবং আহমদপুর গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাবেন। বুড়ো বুড়ো মাতব্বররাও বলেছেন, ঠাকুর আগে যেমন গোবিন্দপুর মেলনে যেতেন তেমনি যাবেন, নিজেদের মধ্যে ভেদভাব ভুলে ঠাকুরের সম্মিলিত সেবা আবার ফিরিয়ে আনা উচিত।

কুশুপুরের হিন্দুদের এ বছর ভক্তিভাব ও অভেদভাব ফিরে আসছে আর এদিকে বুঝি শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউ শ্যামঘন আর হাসনুর মধ্যে এক কূট লাগিয়ে দিলেন! দু'জনে দু'জনের পরিচয় পাবার আগেই প্রেমে পড়ল। এ প্রেম যে কেবল কুশুপুর ও আহমদপুরের মধ্যে জ্বলতে থাকা আগুনকে উস্কে দেবে না, সারা ভারতে আগুন

জ্বেলে দেবে না তা কে বলবে। দুই গাঁয়ের লোক এমন ওৎ পেতে রয়েছে যে এ গাঁয়ে কিচ্ছুটি হ'লে ও গাঁয়ে তুরন্ত তার খবর পৌঁছে যায়, একথা কি আর চাপা থাকবে।

হাসনু আবার একবার বলল—ইয়া আল্লা!

শ্যামঘনও আবার ব'লে উঠল—রাধাবল্লভ, এ কী করলে!

কাঁপতে কাঁপতে হাসনু বাড়ীর দিকে দৌড়াতে লাগল; কিন্তু তার মনে হ'ল সে যেন বাড়ীর দিকে না গিয়ে যাচ্ছে শ্যামঘনর দিকে। অসহায়ভাবে চারিদিকে চেয়ে সে আবার ছুটতে লাগল। শ্যামঘন জলে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল হাসনুর দিকে। একবার মাত্র সে চিৎকার ক'রে ডাকল—হাসনু! তার চোখ থেকে জল ঝ'রে কুশভদ্রার স্রোতে টপ টপ করে পড়তে লাগল। কুশভদ্রা যেন খিলখিল ক'রে হেসে সে অশ্রু বয়ে নিয়ে গেল মহাসমুদ্রে।

হাসনু চ'লে যাবার পর শ্যামঘন একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ভাবতে লাগল আগের ও ও পরের কথা। নিজে নিজেকে বলল—এ সব নিছক রোমান্টিসিজম্। কুশভদ্রাকে জীবন্ত কল্পনা ক'রে তার সঙ্গে কথা বলা, রাধাবল্লভের পাথরের মূর্তিকে ভগবান্ মনে ক'রে তাঁকেই এসব কিছুর জন্য দায়ী ক'রে আনন্দ বা বেদনা পাওয়া—এসব মিথ্যে, স্রেফ রোমান্টিসিজম্, তাছাড়া আর কী? আজকাল বিজ্ঞানের যুগে এসব হাস্যকর, কারণ তার উপরে তো কারও ক্রিয়াকলাপ নির্ভর করে না বা করা উচিত নয়। বৈজ্ঞানিকের মত চিন্তা করা উচিত আমার। যাকে আমি প্রেম বলছি তা কেবল লালসা, দেহের লালসা। হাসনুর দেহই তো আমায় আকৃষ্ট করেছে? এ লালসার স্রোতে আমার কি ভেসে যাওয়া উচিত? হাসনু মুসলমান, আমি হিন্দু। আমি যদি হাসনুকে বিবাহ করি তবে সামাজিক বিশৃঙ্খলার কথা ছেড়ে দিলেও আমার বিবাহিত জীবন কি বিষময় হয়ে উঠবে না? তার রীতিনীতি, খাদ্য, চালচলন, সব কেবল আলাদ নয় আমার ঠিক উলটো। তায় আবার হিন্দু মুসলমান কলহের সময়ে আমাদের প্রেম কি টিকে থাকতে পারবে? না, আগে আমি নিজেকে যাচাই ক'রে দেখব: এ উন্মাদনা আসছে লালসা থেকে না প্রেম থেকে, তারপর আর সব কথা। জ্ঞানী লোকেদের মনকেও ইন্দ্রিয় বিপর্যস্ত ক'রে থাকে। এর বিপক্ষে তার বুদ্ধি অনেক যুক্তি দেখাল বটে কিন্তু তার মন একটি মাত্র প্রশ্নে সব যুক্তিকে নীরব ক'রে দিল: তুমি যে এর বিরুদ্ধে এত চিন্তা করছ তাতেই কি ব'লে দিচ্ছে না যে এ কেবল যৌবনের আবেগ নয়, তার সঙ্গে আদিম মৌলিক বেদনা ও আনন্দের জোয়ারও বইতে শুরু করেছে।

সারা বিশ্বে নাকি এই বেদনা-আনন্দ নিথর হয়ে বিছিয়ে রয়েছে। সেই অসীম বেদনা যখন নানাভাবে অসীমের মধ্যে প্রকাশ পায় তখন নাকি নানা প্রকার ঘটনা ঘটে। এ কথা বৈজ্ঞানিকের শেষ সিদ্ধান্ত, না নিছক মিথ্যে রোমান্টিসিজম্ তা কে বলবে? এ কি আকুলতা ভুবনে! এ কি চঞ্চলতা পবনে পবনে! টলস্টয় যেমন বলেছেন—ফলটি গাছ থেকে পড়ার কারণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হ'তে পারে; আবার,

গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটি লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে ফলটি নিচে ফেলে দেওয়ার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার দরুনও হ'চ্চে পারে ; অথবা দুই কারণেই হ'তে পারে। কে জানে ঘটনা কীসের জন্য ঘটে ? সে যাই হোক, সেই মুহূর্তে যে সামান্য ঘটনাটি ঘটে গেল তা দেখতে দেখতে এক বিরাট প্রবাহে পরিণত হ'ল। শ্যামঘন ও হাসনু ভেসে গেল সেই প্রবাহে আর তার সঙ্গে ভাসল কুশুপুর ও আহমদপুরের হিন্দু মুসলমানেরাও, নানাভাবে।

* * *

টলতে টলতে বাড়ীর আঙ্গিনায় ঢুকে বারান্দায় আছড়ে পড়ল হাসনু। রহিমের স্ত্রী জেবউন্নিশা আঙ্গিনা নিকোচ্ছিলেন, নাতনীকে এমনি ক'রে এসে আছড়ে পড়তে দেখে চীৎকার ক'রে ডাক পাড়লেন—আরে ও মিঞা, আরে জলদি আও না ! দেখো দেখো হাসনু কেয়া হো গিয়া। হায় আল্লা! ময় মনা করতি থি নদী যানে কো······আরে, কুশুপুরকা কোই হিন্দু তুমকো কুছ্ কহিস্ কেয়া ? কুছ্ বেইজ্জত কিয়া কেয়া ?······আরে ও মিঞা !

রহিম বেড়া বাঁধা ফেলে দৌড়ে এলেন। হাসনুকে এমনি অবস্থায় দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। জেবউন্নিশা তাঁর গায়ে ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন—আরে, উল্লুকা মাফিক্ কেয়া খাড়া হুয়া হ্যায় ! আরে কুছ্ ভি তো করো ! হায় খুদা ! আরে শ্যামঘন্ আয়া হ্যায় ডাগদর হোকে, উস্‌কো বোলাও জলদি।

স্ত্রীর কথায় রহিমের হুঁশ হ'ল। তিনি হঠাৎ চঞ্চল হয়ে মাথায় গামছাটা বেঁধে নিয়ে বললেন—অব্ হি ষাতা হুঁ। তুম উস্‌কে সর্‌মে পানি ডালো। বলেই রহিম হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটলেন কুশুপুর, শ্যামঘনকে আর বন্ধু রাম পধানকে ডেকে আনতে। কিন্তু তাঁকে কুশুপুর পর্যন্ত যেতে হ'ল না। নদীর মধ্যে শ্যামঘন তেমনি স্থানুর মত দাঁড়িয়ে আছে। রহিম তাকে দেখে তাড়াতাড়ি সব কথা ব'লে তার হাত ধ'রে টানতে লাগলেন। শ্যামঘন সব বুঝতে পারল না, কেবল এইটুকু বুঝল যে হাসনু বেহুঁশ হয়ে প'ড়ে গেছে। কিছুক্ষণ সে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে রহিম 'অজা'র দিকে চেয়ে রইল। মনে মনে কেবল বলে—রাধাবল্লভ, এ কী করলে! আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না, ঘটনাস্রোতের এমনি ঊর্ধ্বশ্বাস গতিতে আমি যে কিছু ভেবে দেখবার ফুরসত পাচ্ছি না।

রহিম অধীর ভাবে বললেন—আরে নাতি ঐসা বল্ বল্ (ফ্যাল ফ্যাল) কর্‌কে তাকাতা হ্যায় কেয়া ম ? আরে জলদি আও !

শ্যামঘন বলল—'অজা',···আমি···হাসনু···না না······

রহিম চীৎকার ক'রে ওড়িয়াতে বললেন—আরে, এ কি সরম্ করবার সময় ? হাসনু তো তোর বহিন্ আছে···

শ্যামঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আচ্ছা 'অজা', তুমি যাও, আমার ওষুধের বাক্স আর স্টেথোটা নিয়ে এসো। আমি এমনি ভিজে কাপড়েই যাচ্ছি।

রহিম আবার ছুটলেন কুণ্ডপুর। শ্যামঘনও দৌড়তে দৌড়তে রহিমের বাড়ী গিয়ে বাহির থেকে ডাক দিল।

জেবউন্নিশা ঘরের ভিতর থেকে কাঁদতে কাঁদতে ডাকলেন—আরে শ্যাম্ আইস্······আও বেটা, যুগ যুগ জিয়ো বেটা, অন্দর আও।

শ্যামঘন ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখল এক অপূর্ব দৃশ্য। হাসনু একখানি সুন্দর সাদা শাড়ী প'রে মাথায় কালো কাপড়ের ওড়না দিয়ে পশ্চিম দিকে মুখ ক'রে দুই হাত উপরে তুলে ফতিহা পড়ছে—

'আউ জো বিল্লহে মিনশ্ শৈতানীর রজীম্
বিসমিল্লাহির্ রহমানির্ রহিম্······'

চোখ থেকে তার ঝর ঝর ক'রে জল পড়ছে। হাসনু বলছে বটে—আমায় শয়তানের কাছ থেকে বাঁচাও আল্লা, তোমারি নামে আমি সব কাজ আরম্ভ করছি, কিন্তু ফতিহার সঙ্গে একটি গান গুলিয়ে গিয়ে মিশে যাচ্ছে তার দাদুর প্রিয় গান—মেরে অঙ্গনমে আয়ে ঘনশ্যাম, ময় হো গই বাবরি······আমার আঙ্গিনায় ঘনশ্যাম হঠাৎ এসেছেন, আমি কি পাগল হয়ে যাব! শ্যামঘনর ভারী ইচ্ছে হ'ল তেমনি ক'রে ব'সে ফতিহা পড়ে। রহিম ও রাম পধান ততক্ষণে এসে পৌঁছেছেন। রাম অজার গলা শুনে হাসনু চমকে ওঠে চেয়ে দেখল তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রিয়। সমস্ত দেহ তার কেঁপে উঠল। সে আর সামলাতে না পেরে হঠাৎ লুটিয়ে পড়ল সেইখানেই। শ্যামঘন এবার আর চোখের জল রাখতে পারল না।

জেবউন্নিশা আবার কেঁদে উঠলেন। রাম পধান ম্লান হাসি হেসে বললেন—ভাউজ-অ (ভাজ), হাসনুর কিছু হয়নি।

জেবউন্নিশা বললেন—নেহি জী, ও বলছিল স্নান করতে করতে ও তার আব্বাকে দেখতে পেল, আবদুল নাকি ওকে ডাকল।

রহিম আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলেন। রাম পধান দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন—ও সব কিছু না। আমরা বাইরে যাচ্ছি, তুমি ওকে গরম দুধ খেতে দাও।

শ্যামঘনকে বাড়ী যেতে বলে রাম পধান রহিমের হাত ধ'রে বাইরে এনে বললেন—বুঝলে সাঙাত, বড় আশ্চর্য!

রহিম আকুলভাবে শুধানের—সাঙাত, কী হয়েছে বল, লুকিও না। হাসনু বাঁচবে তো?

রাম পধান তখন নিজেও অধীর হয়ে পড়েছেন নানা কথা ভেবে। রহিমকে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে বললেন—বুঝলে সাঙাত, হাসনু আর শ্যাম প্রেমে পড়েছে। দুজনের মধ্যেই আমি তার সব লক্ষণ দেখতে পেলাম: স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গ বেপথু বৈবর্ণ্য অশ্রু মূর্ছা।

রহিম বড় বড় চোখ করে গালে হাত দিয়ে বললেন—তোবা তোবা। শালে বড়ি নটখটকি বাত কিয়া। অভি উপায় কী সাঙাত। এদের বাপেরা কাটাকাটি

ক'রে মরেছিল, আর এরা দু'জন সিরাতুল্ লজীন্ অন্ অমত্ অলৈহিম্···খোদা, তুমিই তো শেষ বিচার করবে, তুমিই পথ দেখাও।

রাম পধান রহিমের কাঁধে হাত রেখে বললেন—হাঁ সাঙাত, তিনি ছাড়া আর কে আছে। তাঁর কী উদ্দেশ্য আছে এতে কে জানে······ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া······সব তাঁরই লীলা।

দু'জনে নীরবে মাথা নিচু ক'রে ধীরে ধীরে চ'লে গেলেন। জেবউন্নিশা জল এনে হাসনুর মুখে ছিটে দিতে লাগলেন। হাসনু আস্তে আস্তে চোখ খুলে কাকে যেন অসহায় ভাবে খুঁজল। তারপর হঠাৎ তার ঠাকুরমাকে জড়িয়ে ধ'রে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলল—অম্মিজান, ময় মর গই। তারপরে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল—নেহি ম, মেরা কুছ হুয়া নেহি। আল্লা সব ঠিক কর দেঙ্গে। প্রকৃতিস্থ হয়ে সে আবার ফতিহা পড়তে লাগল—

"আল্ হমদ্‌লিল্লা হে রদ বিল্ অলমীন্
অর্ রহমানির্ রহিম্ মাল্‌কে য়োমিদ দীন্।"

হে আল্লা, তুমি দয়ার সাগর, আমি তোমারই আরাধনা করছি, তোমারি সাহায্য চাইছি।

শ্যামঘন গাঁয়ে ফিরে বাড়ী না গিয়ে তেমনি ভিজে কাপড়ে সোজা রাধাবল্লভের মন্দিরে গেল। তখন রাধাবল্লভ হোরি খেলায় বিজে[১] করেছেন। হোলির গান চলেছে—

'নব বৃন্দাবনে নব নাগর ত্রিভঙ্গ
বোলন্তি (মাখান) সভিঙ্গ (সবার) অঙ্গে পীরতির রঙ্গ।'

শ্যামঘন নাস্তিক, কিন্তু আজ সে সোজাসুজি রাধাবল্লভের মুখের পানে চেয়ে শুধোলে—এসব কী হচ্ছে শুনি? কী কৈফিয়ৎ আছে তোমার? আমি কি তবে মুসলমান হব? তার মনে হল রাধাবল্লভ একটুখানি হাসলেন, আর কী সুন্দর সে হাসি! সব ধর্ম রীতি নীতি মান অভিমান অহঙ্কার যেন তুচ্ছ মনে হ'ল সেই হাসিটুকুর কাছে।

* * *

সেদিন মাঝরাতে কুশভদ্রার এদিককার পাড়ে রাম পধানের বাড়ীর কাছে একটি প্রদীপ জ্বলল। কিছুক্ষণ পরে ওদিকের পাড়ে রহিমের বাড়ীর কাছে আর একটি প্রদীপ জ্বলে উঠল। শ্যামঘনর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। সে বিশ্বাস করতে পারল না একি কুহক না সত্য। সে পাগলের মত দীপ জ্বেলেছিল এই এক ক্ষীণ আশায় যে হাসনু যদি তার ঘরের বাহিরে এসে থাকে বা জানালার কাছে এইদিকে চেয়ে শুয়ে থাকে তবে প্রদীপের আলো দেখে হয়তো বুঝবে এ শ্যামঘনর সঙ্কেত। কিন্তু এ যে

১ বিজে—(রাজা বা ঠাকুরের) যাত্রা, আগমন বা উপস্থিতি।

অভাবনীয় ব্যাপার ! শ্যামঘন আরতির ঢঙে তার প্রদীপটি নাড়তে লাগল। ওপারের প্রদীপও তেমনি নড়তে লাগল।

শ্যামঘনর শ্বাসরোধ হ'ল। সে প্রদীপ ফেলে দিয়ে ছুটল ওপারে। দৌড়াতে দৌড়াতে সে ভাবতে লাগল : কী আশ্চর্য, পৃথিবী তার পাহাড়-সমুদ্র ঘর-বাড়ী নদী-নালা গাছ-পালা নিয়ে মহাশূন্যে ঘুরে চলেছে—সে এক ঘটনা আর তা আর এক ঘটনার সামান্য অংশ মাত্র। আবার সে ঘটনার ভিতরে ঘ'টে যাচ্ছে সমস্ত মানব সমাজের ক্ষেত্রে কত ঘটনা। তার ভিতরে ঘটছে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা আর তার ভিতরে আবার অসংখ্য ব্যক্তিগত ঘটনা। সমস্ত বিশ্বে যত ঘটনা ঘটেছে বা ঘটছে তার সঙ্গে আমার এই ঘটনার কি কোনো সম্বন্ধ নেই ? হয়তো এই মুহূর্তে কোথাও যুদ্ধ লেগেছে কিংবা কোথাও হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হচ্ছে, তার সঙ্গে কি এর কোনো সম্পর্ক নেই ?

কুশভদ্রার ক্ষীণ ধারা পার হবার পর কিন্তু শ্যামঘন ভাবল ফিরে যায়। তার মনে হল সে অতি দুর্বল, ঘটনাস্রোতে ভেসে যাচ্ছে অসহায়ভাবে নিজের সমাজ ও ধর্মের দিকে না চেয়ে।

—যাও বেট যাও...ইস্‌কো দিল্‌কা কম্‌জোরি মত্ সম্‌ঝো, উধর শ্রীরাধা তড়প্ রহি হ্যায়।

শ্যামঘন চমকে উঠল। খুব কাছে এক ভবঘুরে ফকীর শুয়ে আছে, সে দেখতে পায়নি। ফকীর উঠে ব'সে গাইতে লাগল—

'কেয়া কঁরু সজনী ন আয়ে শ্যাম
তড়পত বিতে মেরি উন্ বিন রাতিয়া'

—যাও, যাও, ম্যয় সব্ দেখা, সব্ সমঝ্ লিয়া···বেটা, সমাজ ধরম্ সব ঝুটা···

শ্যামঘন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোথা থেকে কোথায় ঘটনা সব ক্ষিপ্র গতিতে এসে মিলে মিশে যাচ্ছে ইন্দ্রজালের মত। সে কোনো কূলকিনারা পেল না। কিছু না বলে সে আবার দৌড়াতে লাগল। কুশভদ্রার ওপারে পোঁছে দেখে হাসনু পাড় বেয়ে নিচে নামছে। শ্যামঘন অবাক হয়ে হাসনুর হাতটা ধ'রে ফেলে বলল— হাসনু, আমায় আগে বল তুমি কেমন ক'রে জানলে যে আমিই প্রদীপ জ্বেলেছি···

হাসনু মাথা নিচু ক'রে বলল—আমার কেন কী জানি মনে হল তুমি নিশ্চয় আজ রাত্রে আসবে। কে যেন ব'লে দিল এ কথা। আমি আমাদের জানালা দিয়ে তাকালাম তোমাদের বাড়ীর দিকে সেইজন্য···দেখলাম···বুঝতে পারলাম···

—আশ্চর্য ! আমি কিছু বুঝতে পারছি না হাসনু ! এ সব কী, কেন ঘটছে !

—রাম-অ অজা একদিন আমার অজাকে বলছিলেন, সাধারণ মানুষ তার ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর ক'রে বছরের পর বছর। জীবনের পর জীবন নানা অবস্থায় প'ড়ে অনেক মার খেয়ে যে জ্ঞান পায়, প্রেম হলে মানুষ এক লহমার মধ্যে সেই জ্ঞান পেয়ে যায়, তার আর এত ঘটনার জালে জড়িয়ে পড়বার দরকার হয়না। শ' শ' ঘটনা একটি সামান্য ঘটনায় ঘটে যায়। আমি সে কথা শুনেছিলাম কেবল, তোমার

প্রেমে প'ড়ে সব বুঝতে পারছি এখন। আমরা দু'জনে যদি দু'জনের দেহকে কেবল চাইতাম, তবে কত চক্রান্ত করতে হ'ত দু'জনে মিলবার জন্য। কিন্তু দেখ কেউ কারো সঙ্গে কথা না বলেও কেমন ক'রে জানতে পারলাম।

—কিন্তু এ কী হল হাসনু! এ প্রেম যে দুজনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে। কেবল আমাদের নয়, এই দুই গ্রামকেও। সারা ভারতেও যে এ আগুন জ্বালিয়ে দেবে না এখনকার এই অবস্থায়, সে কথা কে বলবে···

—তুমি যদি আমার দেহকে ভালবেসে থাক, তবে এ কথা এইখানেই থাক্।

—দেহের লালসা যে আমার নেই তাতো আমি বলতে পারছি না।

—থাকলেই বা ক্ষতি কী। গঙ্গা নদীতে তো কত ময়লা জল পড়ে, সে সব তো পবিত্র হয়ে যায়। দেহ তো কেবল একমাত্র সত্য নয়, তার নিচে আরো আরো সত্য আছে। তা না হ'লে ছেলেবেলায় কেন তুমি আমাকে বাঁচাতে? কেন তোমায় দেখা মাত্র···

—কে জানে! যা জানা যাবে না তার বিষয়ে যাই বলা যাক তা সত্য হবে, আর প্রমাণও জুটে যাবে।

—এ সব বুদ্ধির কথা। বুদ্ধিতে কি সব বোঝা যায়? অন্যকে বোঝার জন্য মনের ভিতরে যদি আকুলি বিকুলি না হয় তবে খালি বুদ্ধিতে সব বোঝা যাবে না বোধ হয়।

—কিন্তু হাসনু! এর পরে আমাদের বিয়ে হওয়া উচিত। আর বিয়ের পর যদি পদে পদে অমিল হয়?

—কেন?

পাকিস্তান হওয়ার পরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অবিশ্বাস বেড়ে গেছে। সামান্য সামান্য কথায় মারামারি কাটাকাটি হচ্ছে। এ অবস্থায় আমরা কি সম্পূর্ণ ভালবাসতে পারব? তোমার মন তো নিশ্চয়ই মুসলমানের দিকে টানবে. আর আমার মন হিন্দুর দিকে। তা ছাড়া—

হাসনু অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়ে বলল—কেন? আমাদের দু'জনের মন কেন ন্যায়ের দিকে না টানবে? মসজিদের সামনে বাজনা না বাজানোর কথা কোরান শরিফে নেই। কী জন্য আমাদের এই দেশে এ কথা আছে তা সবাই জানে। আইন যদি বলে, মন যদি বলে, রাস্তায় বাজনা বাজিয়ে যাওয়ার সকলেরই অধিকার আছে, তবে আমি মুসলমান বলে তা না মানব কেন? আর হিন্দুরা যদি মুসলমানদের অপমান করার জন্য মসজিদের সামনে বেশী ক'রে বাজনা বাজায়, তবে তুমি হিন্দু বলেই তাকে মানা না করবে কেন?

শ্যামঘন অবাক হয়ে চেয়ে রইল হাসনুর দিকে। হাসনু হেসে বললে—তুমি ভাবছ নিশ্চয় যে আমি তো মূর্খ, এত কথা জানলাম কী করে?

হ্যাঁ, তুমি আমার মনের কথা বলে আরো অবাক ক'রে দিলে।

—এ সব তো আমি 'অজা'দের কাছে শুনেছি। তাঁরা যখন আমাদের বাড়ীতে

শাস্ত্রচর্চা করেন আমি মন দিয়ে সব শুনি। তাই থেকে কিছু বুঝেছিলাম, অনেক বুঝিনি। আজ কিন্তু বুঝতে পারছি সব। বুঝতে পারছি সব ধর্ম এক. মানুষে মানুষে ভেদ আমাদের ভয় থেকে এসেছে, তবু প্রেমেরই জয় সব সময় হয়েছে। আজ তো আমি শ্রীকৃষ্ণকে আমার মনের মধ্যে বুঝতে পারছি, কী প্রেমিক তিনি। এতদিন তো তাঁকে আমি বুঝতে পারতাম না······

—হাঁ হাসনু, আজ আমিও বুঝতে পারছি আল্লাও আমার। সত্যি হাসনু, এ পৃথিবীর ইতিহাস হত্যার ইতিহাস নয়—ঘৃণা আর ভয় থেকে যার জন্ম, এর ইতিহাস ঐক্যের—যার সৃষ্টি প্রেম থেকে। লড়াইবাজেরা মানুষকে গড়েনি, বুদ্ধ যীশু মহম্মদ চৈতন্য জরথুস্ত্রের মত প্রেমিকেরা গড়েছেন। একথা এখন যে বেশ বুঝতে পারছি তাই কেবল নয়, বুঝতে পেরে মনে মনে একটা আবেগ অনুভব করছি। কিন্তু মনের এ অবস্থা তো থাকবে না, নানা বিভেদকারী যুক্তি এ অবস্থা থেকে মনকে নিচে নামিয়ে দেবে—অহঙ্কার স্পর্ধা ইত্যাদি। মনে পড়ে যাবে মুসলমানেরা আমাদের জগন্নাথকে চামড়ার দড়িতে বেঁধে বড়দাণ্ডের রাস্তা দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল একদিন। তখন ?

—জগন্নাথকে খালি তোমাদের বলছ কেন বল তো ? ওসব যে করে সে অসভ্য, সে হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক। হিন্দুদের মধ্যে এ পাড়া ও পাড়ায় কাজিয়া লেগে যখন দুর্গার মাথা ভেঙ্গে মাটিতে ফেলে দেয় সেও তো সেই অসভ্যতা। যারা এমন করে বা করেছিল তারা চলে যায়, চলে গেছে, কিন্তু জগন্নাথের প্রতি ভক্তি তেমনি আছে, মানুষ তা থেকে টলেনি।

—প্রেম সত্যি মহান। আমার এখন মনে হচ্ছে দুনিয়ায় সবাই ভাল। সকলের পায়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। আমাদের যদি ভয় বা হিংসা না থাকত, তবে এই নানারকম বিভিন্নতা মানুষের মধ্যে দেখে বরং ভাল লাগত।

—সকলেই ভাল তো। সবের গোড়ার কথাটি যদি ভাল না হ'ত তবে তো মানুষের কবে থেকেই বিনাশ হয়ে যেত।

—কিন্তু তুমি জান হাসনু, পরশু দিন ফাল্গুন পূর্ণিমায় আমাদের দুই গাঁয়ের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লাগানোর সব বন্দোবস্ত হচ্ছে।

—হোক, তা বন্ধ করবার জন্য আমরা প্রাণ দেব। আমরা দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে তাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়াব।

—আমি পারব নিশ্চয়।

—নিশ্চয় পারবে। তুমি যদি না পার আমি তোমায় সাহস দেব। আর আমি না পারলে তুমি সাহস দেবে আমায়।

—হাসনু, তুমি এত জ্ঞানের কথা জানলে কী ক'রে ?

—বললাম যে···

হঠাৎ বেনার ঝোপের পিছন থেকে শোনা গেল—প্রেমের জোরে বাবা, প্রেমের জোরে !

শ্যামঘন ও হাসনু চমকে উঠে ছুটে পালাতে যাচ্ছিল, বেনা ঝোপের আড়াল থেকে রাম পধান ও রহিম তাদের হাত ধ'রে থামিয়ে হাসতে হাসতে বললেন—ভেবেছিলে আমরা কিছু জানি না!

রাম পধান শ্যামঘনর দিকে চেয়ে বললেন—হাসনু এত সব জানল তো প্রেমে পড়েই। ঘোর বনে এক হাতী ছিল। সে মুনিদের ঘরদোর ভেঙ্গে ফেলে ভারী উৎপাত করত। কিন্তু মুনিরা ভগবানের কথা যা সব চর্চা করতেন সে সব তার কানে যেত। একদিন এক কুমীর চালাকি ক'রে হাতীকে জলের ভিতর নিয়ে গিয়ে সেইখানে তাকে ধরল খাবে বলে। ঘোর আতঙ্কে হাতীর—

'শরীরে জ্ঞান উপজিল
পূর্বকথা স্মরণে আসিল
হাতী যে ভাবিলা মনে
যে কালে ছিনু ঘোর বনে
আমি মারিব বলিয়া
মুনিগণ একত্র হইয়া
সবে করেন কহাকহি
আতঙ্ক কালে ভাবগ্রাহী'

মহা আতঙ্কে পড়ায় তার শোনা কথা সব জ্ঞান হয়ে উঠল। আতঙ্কে অথবা প্রেমে পড়লে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হন, মানুষের বুদ্ধি খুলে যায়।

রহিম বললেন—সাঙাত, আমরা যে সব কথা বলি এরা তা কাজে খাটিয়েছে। এ শালে লোকদের ফাগুন বদরে সাদি করা দেঙ্গে, রাজি?

রাম পধান রহিমের হাত ধ'রে বললেন—রাজি। তার পরে কুরুক্ষেত্রের জন্য আমরা তৈয়ী হয়ে যাব। আল্লা আর রাধাবল্লভ এদের মঙ্গল করুন।

শ্যামঘন ও হাসনু কেঁদে ফেলল।

ভাঙ্গা খেলনা

কিশোরীচরণ দাস (1924—)

কটকে কিশোরীচরণের জন্ম। ওড়িয়া ছোটগল্পের প্রথম সারির লেখক। তাঁর গল্প সংকলন 'ঠাকুর ঘর' সাহিত্য অকাদেমী কর্তৃক পুরস্কৃত হ'য়েছে। শিশু-মন ব্যাখ্যার এক অসাধারণ লেখক কিশোরীচরণ। ভারত সরকারের প্রশাসন বিভাগের উচ্চপদে কর্মনিযুক্ত রয়েছেন। তাঁর গ্রন্থ 'ভাঙ্গা খেলনা' নানা ভাষায় অনূদিত হ'য়েছে।

বাগানের খানিকটায় রোদ। যেখানে এক সার গাঁদা ফুল ফুটে রয়েছে সেইখানে রোদ শেষ হয়েছে। ফুল কতক রোদে, কতক ছায়ায়। কতক রোদ পোহাচ্ছে, আর কতক বেচারা ফুল শীতে কাঁপছে বুঝি বা। এ দিকের ফুলে প্রজাপতি বসেছে—ওদিকে যাবে না? ঐ যে গেছে—গেছে। দূর্, আবার ফিরে এল। দুষ্টু! এদিকের ফুলরা হাসছে। এক এক ক'রে সবাই পাপড়ি মেলে হাসছে। ওদিকের ফুল হাসছে না। ঠাণ্ডায় জড়সড় হয়ে চেয়ে আছে নিচুপানে। হাত দিলে হাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, ফুল গরম হবে না।

(পায়ের তলায় চীনাবাদামের খোলাটা চেপটে গেল। গীতা সেটা পায়ে ঠেলে দিয়ে ফেলে দিল নিচে, আধমরা সেঁউতি গাছের গোড়ায়। দশ বছরের মেয়ে। বড়দিনের ছুটির দুপুর, বাড়ীর পিছনের দিকে সিঁড়ির ধাপে বসে চেয়ে আছে রোদের দিকে চিন্তার ছবি বয়ে চলেছে মনের মধ্যে)।

আমাদের স্কুলে বড় ফুল আছে। গোল গোল ফুল, হলদে পাপড়ি। সান্ ফ্লাওয়ার। কুলিআ বলে সূর্যমুখী। তারা নাকি সূর্যের দিকে মুখ ক'রে থাকে। কুলিআটা মিথ্যুক।

সান্ ফ্লাওয়ার সুন্দর নয়। খালি বড় বড় মুখ। মিসেস্ ঘোষালের মত। হো হো করে হাসেন। বড় বড় দাঁতগুলো দেখা যায়। তাঁর লম্বা কোটের বোতামগুলো এত বড় বড়। মোটা ফরসা হাত দিয়ে টেবিল চাপড়ান—স্টপ টকিং।

মাষ্টার মশায় আসেন নি। মা ঘুমোচ্ছে, মা-র মুখ সুন্দর। কিন্তু মা খালি

রাগ করে আজকাল। হাসলে মা-র মুখ সুন্দর দেখায়, রাগলে বিচ্ছিরি লাগে। মিছিমিছি রাগ করে আমার উপর। কাল রাজু আমার ছবির বই ছিঁড়ে দিল, আমার রঙ্গিন পেনসিল ভেঙ্গে দিল, আর আমি মারলে দোষ হ'ল আমার। মা আমায় মারল, রাজুকেও মারল। চিৎকার ক'রে ক'রে বলল—তোরা মরতিস্ তো···কি কুলাঙ্গার ছেলেমেয়ে···মা খালি খালি রাগ করছে, মিছিমিছি রাগ করছে।

মা কুলিআর উপরেও রাগছে। রাগ ক'রে সেদিন দুধের গ্লাসটা এমন ঠেলে দিল যে ভেঙ্গে গেল। আর আমরা যদি ভাঙ্গতাম!

রোদ গেছে ঐ ক্যানা ফুলের গাছ অবধি। খালি লম্বা লম্বা বড় বড় পাতা। ফুল ব'লে কিছু নেই। আমাদের স্কুলে কত ফুল ফুটেছে—লাল, হলদের উপর লাল লাল ছিট ছিট। শোভা সেদিন বকুনি খেল ফুল ছিঁড়েছিল ব'লে। মা আমাদের বাগান মোটে দেখে না আজকাল, খালি মালীর উপর রাগ করে।

শীত করছে। পপি কুকুরটা বোকা, ঘাসের উপর শুয়ে আছে। শীত করছে না ওর? ওদের বাড়ীর ঐ বিচ্ছিরি কালো কুকুরটা এলে ছুটে পালাবে পাজীটা।

ঐ যে রে একটা প্রজাপতি! কি সুন্দর নকশাওলা প্রজাপতি, হলদে গায়ের উপর কালো কালো দাগ দাগ। নকশাওলা পাকা কলা। নকশাওলা ক্যানা ফুল। যাই ধরি গিয়ে। ঐ যা, উড়ে গেল। গেল ওদের বাড়ীতে। পাখা দুটো খালি নাড়ছে। একবার উপরে একবার নিচে। পপিও তার ল্যাজ নাড়ছে অমনি। এক—দুই—তিন—চার। ওদের বাড়ীর দিকে গেল। কোথায় গেল? ঐ ওদের বাড়ীর বাবা এলেন ওঁদের ছোট খোকাকে কোলে ক'রে। এত শিগগির আপিস থেকে ফিরে এসেছেন। আর আমাদের বাবা আসবেন সেই এক পহর রাত ক'রে।

ওঁদের খোকাকে আদর করছেন, পাখী দেখাচ্ছেন। ওর নাম কী যেন—টুনু? আমাদের অমনি একটা খোকা থাকত যদি! রাজু-বিজুর মজা বেরিয়ে যেত। মা তাকে আদর করত, রাগত না।

আমাদের বাবা আমাদের আদর করেন, তা রাজু বিজুকে বেশী আদর করেন। আমি বড় হয়ে গেছি কিনা। বাসন্তী বলে তার বাবা নাকি তাকে যেতে আসতে আদর করেন। সকালে একবার, সন্ধ্যায় একবার, আর মাঝে যত ইচ্ছা তত—অহঙ্কেরে একটা।

কিন্তু বাবা আজকাল তো কাউকে আদর করেন না। ফিরবেন সেই রাত হ'লে। গুম হয়ে ব'সে থাকবেন খাটের উপর। কোনো কথা বলতে গেলে—আঃ, বিরক্ত করো না মানুষকে—যাও না, খেল গিয়ে। মা জিজ্ঞেস করবে—খাবার আনি? কিছু দরকার নেই—আস্তে ক'রে বলবেন। হাসবেন না, কিছু না।

কী হয়েছে বাবার? আগে তো এমনি ছিলেন না। আমরা যখন পুরীতে থাকতাম—কত দিন হয়ে গেল—বাবা বেলা থাকতে আপিস থেকে ফিরতেন। মা নিজে রান্নাঘরে গিয়ে লচি আলু ভাজা তৈরি করত। নাকে চোখে ধোঁয়া

ঢুকত। বাবা একেবারে এসে আমায় কোলে টেনে নিয়ে আদর করতেন। বাবা খালি হাসতেন :

বাবা কি বুড়ো হয়ে গেছেন? কই দাঁত পড়েনি তো, চুলও পাকেনি। রমা অপা (দিদি)-র জেজে (ঠাকুরদাদা) কত বুড়ো, চুল সব সাদা হয়ে গেছে। কত হাসেন তিনি। আমাদের সব কাছে ডেকে লজঞ্চুস দেন—গান শেখান—।

বাবা কত গান শেখাতেন আগে। ভজন, সিনেমার গান, হিন্দী, ওড়িয়া—। 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম', 'দেহী হমে আজাদি বিনা'—।

(গীতা গুন গুন ক'রে গান শুরু করল। পায়ের পাতাটা উপর নিচে নাড়তে লাগল। তারপর হঠাৎ থামল। তার ছোট মুখখানি গম্ভীর হয়ে নরম কাঁদো কাঁদো হয়ে এল। আর একটু হলেই কেঁদে ফেলবে যেন)।

বাবা কাঁদছিলেন। বাবা আর গান গাইবেন না। বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন।

সেদিন মাঝরাত। কী স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙ্গে যেতে দেখি আলো জ্বলছে, বাবা চেয়ে আছেন উপর পানে। অন্য কারু মত, আমাদের বাবার মত নয়। কাঁদছিলেন না, আমার মনে হ'ল যেন কাঁদবেন। ভয় করতে লাগল 'বাবা' ব'লে ডেকে উঠতেই চমকে উঠে আমার দিকে চেয়ে বললেন—শুয়ে পড়, কেন চেঁচাচ্ছ? সে বাবা আমাদের বাবা নয়। বাবার কী হয়েছে।

টিং টিং টিং। মাস্টার মশাই এলেন? না—রুটিআলা। মা উঠবে।

ভ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—। বিজু ঘুম ভেঙ্গে উঠে কাঁদছে। মা উঠবে। রাগবে আমার উপর।

—গীতা—এই গীতা—গেল কোথায় সে—পড়া নেই শোনা নেই কোথায় গিয়ে ব'সে আছে পাড়াবেড়ানী কে জানে।

—যাই মা।

(২)

'চকা চকা ভউঁরি
মামু ঘর চউঁরি
মামু মোতে মাইলে (মামা আমায় মারলেন,
কেতে কথা কইলে (কত কথা বললেন)—

—এই বিজু, হাত ছাড়্ না। তাড়াতাড়ি হাঁট।—পুনি, তুই আমার হাত ধর্।—আচ্ছা, আয় ইস্কুল ইস্কুল খেলি। বল্—

'রিং আ রিং ও রোজেস্
পকেট ফুল্ অব্ পোজিস্—'

(গীতাকে নিয়ে রাজু-বিজু আর পাড়ার মেয়ে পুনি নতুন গান আরম্ভ ক'রে দিল। আর সবাইয়ের সঙ্গে ছোট্ট বিজু গাইতে থাকে 'লিঙ্গা লিঙ্গা লোজেস্—।' সকালের ঠাণ্ডা যায়নি। অদিনের অদরকারী মেঘ কেটে গিয়ে রোদ উঠেছে এতক্ষণে।)

—অল্ ফল্ ডাউন্ ।

ধপ ক'রে ব'সে পড়ল সবাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম। গীতা তাকাল সামনের দিকে। ডান দিকে পধানদের খিড়কির গায়ে জলের নালা। সামনে ঘাসে ভরা মাঠ।

এখানে ওখানে পাথর আর ঝোপ ঝোপ গাছ। তার ওপাশে উইঢিপি আর কত দূরে বাবার আপিসের লাল বাড়ী। রোদ উঠে কার গায়ের কোথায় এসে ছুঁচ্চে।

নালার কাছে ওগুলো পাথর নয়, এক একটা হীরে। ওগুলো নিয়ে এসে গোল গোল ক'রে কেটে নিলে কত বড় মালা হয়ে যাবে। মাষ্টার মশাই বলেন হীরে সব চাইতে দামী জিনিষ। সব চাইতে উজ্জ্বল, অন্ধকারে আলো বেরোয়। মা খুশী হবে। বলবে—দেখেছ, গীতা আমায় প্রেজেন্ট দিয়েছে।

কে আসছে পধানদের বাড়ী থেকে। বাবুআ আর তার বাবা। বাবুআ সবুজ সোয়েটার পরেছে। হাতে একটা লাঠি। মোটা ছেলে, আদুরে ছেলে। সব খেলা ভেঙ্গে দেবে এখুনি। বলবে—খেলব 'চোখ নেই কান নেই, লেগে গেলে দোষ নেই।' সবাইকে মারবে, কেউ কাঁদলে বাবার কাছে আদুরেপনা করবে। মেনীমুখো ছেলে সব সময় বাবার কোঁচা ধ'রে বেড়াবে। ক্লাসে তো ফেল হয়, এদিকে সর্দারির অন্ত নেই।

ওর কাছে ওর বাবা। ফরসা রোগা কী সুন্দর দেখতে। সব সময় মুচকে মুচকে হাসেন। 'নুআবোউ, খিদে পেয়েছে খাবার কি আছে' বলে ভিতরে চলে আসেন। মা হাসে, আলমারি থেকে কিছু বের ক'রে আনে, নয়তো রান্নাঘরে গিয়ে কিছু তৈরি করতে বসে খেতে দেবে ব'লে।

বনুকাকা ফরসা সুন্দর, বাবুআটা মোটা বিচ্ছিরি। ওর মা-ও তেমনি, কিন্তু মোটা নয়। 'কাকী' বললে মানা করেন, বলেন—বল মাসী। কোথাও যান না। খালি আয়নার কাছে বসে মাথার চুল আঁচড়ান। আর নাকি তিন বেলা স্নান করেন।

—কি রে গীতা, মা আছে?

লাঠি ঠুকে বাবুআ চেঁচাচ্ছে—অ্যাটেনশন্।

—হ্যাঁ যাচ্ছি।—বাবুআর কি স্কুল নেই বনুকাকা?

—নো নো নো, বাবা স্কুল বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। বাবা, দেখ না, গীতা আমায় রাগাচ্ছে।

মুচকি হেসে দু'জনকে একটু একটু চাপড়ে দিয়ে বনুকাকা ভিতরে চ'লে গেলেন। এদিকে বাবুআর নেতৃত্বে খেলা হচ্ছে। খেলা নয়, দৌড়াদৌড়ি, চোর চোর। গীতা একলা পড়ে গেল, নিজেকে একলা ক'রে দিল বললে ভুল হবে না।

মা আর বনুকাকা খিড়কির দিকে গেছেন। বনুকাকার হাসি শোনা যাচ্ছে। কত হাসেন উনি। খিড়কির বাগানে ফুল ফুটেছে, টোমাটো হয়েছে, চিকন কালো কালো বেগুন হয়েছে, বাবা ভালবাসেন, কিন্তু সেদিন তরকারি খারাপ হয়েছিল, মা বেগুন ভাজবে বলাতে বললেন—থাক দরকার নেই। রেগে বলেন নি, অমনি বললেন। মা চুপ ক'রে গেল।

বাবা কোথায়? সেই সকালে নাকি বেরিয়েছেন। আপিসের কাজ। ছুটিতে এত কাজ কীসের?

বাবা নেই, ভালই হয়েছে। বাবা থাকলে বনুকাকা খালি বাইরের ঘরে ব'সে একথা ওকথা বলবেন—কীসব আপিসের কথা, খবরকাগজের কথা, হাসি না কিছু না। মুখটা ভারী ক'রে একটা দুটো কথা—সে কি আর গল্প? আমাদের হেডমাষ্টারের রুমে মিটিং-এর মতন। আমি দেখেছি সেদিন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে কী একখানা কাগজ নিয়ে ব'সে আছেন সবাই। আমাদের বারণ হয়ে যায়, কেউ সেদিকে আসবে না, গোলমাল করবে না, মিটিং হচ্ছে।

বাবা থাকলে মা খালি চা-জলখাবার দিয়ে চ'লে যায়। বাবা হাসেন না, বনুকাকা হাসেন না, মা হাসে না। বাবা এক একবার মাকে বলেন—বসো না এখানে। না, আমার কত কাজ প'ড়ে আছে—ব'লে মা চলে যায়।

একদিন বনুকাকা কী একটা ব'লে নিজে নিজেই হাসলেন। মা-ও হাসল তাঁর সঙ্গে। বাবা দু'জনের দিকে তাকালেন আর জোর ক'রে হাসলেন একটু। বাবার কী হয়েছে কে জানে।

বাবা নেই, ভাল হয়েছে। বাইরের ঘরের অন্ধকারে মিটিং হচ্ছে না। পিছনের বাগানে রোদে গল্প হচ্ছে। বনুকাকা হাসছেন, মা হাসছে।

মা আজ খুশী থাকবে। বেশী রাগবে না। মাথার চুল আঁচড়ে ভাল ক'রে রিবন বাঁধবে। এক এক সময় হাত বন্ধ ক'রে কোন দিকে চেয়ে থাকবে। এক ঘণ্টা লাগবে চুল বাঁধতে। সবতাতে কেমন কুঁড়েমি করতে থাকবে মা।

মা সকালে রেগে বলেছিল আজ চিঁড়েভাজা আর কলা খেতে হবে, এত ভালমন্দ খাবার পয়সা কোথায়? কিন্তু আজ বোধহয় অন্য জলখাবার হবে, মোহনভোগ নয়তো আলুর পকৌড়ি। বনুকাকা এসেছেন।

গীতা বাইরের বারান্দার একটা কোণ ঘেঁষে এল, সেখান থেকে পিছনের বাগানের এক ফালি দেখা যায়।

মা লঙ্কাগাছ থেকে লঙ্কা তুলছে। বনুকাকা দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে। হাসছেন, মা মুখ তুলে কী যেন বলল। বনুকাকা আরো হাসছেন। মা হাসতে হাসতে পিছনের দিকে চ'লে গেল।

পিছন দিকে কাদের বাড়ী থেকে দুটো হাঁস কঁ্যা কঁ্যা করতে করতে দৌড়ে আসছে। ঠোঁটগুলো হলদে পায়ের আঙুলে জাল বাঁধা। পিছন পিছন একটা বুড়ী দৌড়চ্ছে।

দুটো হাঁস, একসঙ্গে পালিয়ে আসছে। একসঙ্গে কঁ্যা কঁ্যা করছে। ভাইবোন। না, বাবা মা। বাবা মা,—উঁহু। তাহ'লে—বনুকাকা মা? না না—ছি।

মা'র মুখে রোদ পড়েছে। কানফুল ঝক ঝক করছে। মাথায় সিঁদুর জ্বল জ্বল করছে। মা হাসছে। আর বাবা এখন কাছে থাকলে—।

বাগানে বেগুন হয়েছে। কালো কুচকুচে বেগুন। ভাজলে কী চমৎকার লাগে,

মা জিগ্যেস করাতে বাবা সেদিন না করলেন। কিন্তু বনুকাকাকে ডেকে দিলে বনুকাকা খুশী হবেন। মা খুশী হবে। মা ওঁকে কি খেতে দেবে আজ ?

বনুকাকা কী বলছেন ?—আমি নিশ্চয় আসব তোমার জন্মদিনে। আসব না এ কি হ'তে পারে ?

মা হাসছে, মাথা নাড়ছে।—আহা, সত্যি যেন আমি ডাকলেই ছুটে আস রোজ রোজ ?

—তাই না ?—ব'লে বনুকাকা চাইছেন মা'র দিকে। মা হাসছে।

বাবা এমনি ক'রে বলতে পারেন না, বাবার কী হয়েছে। বাবার শরীর খারাপ। ওষুধ খেয়ে ভাল হয়ে যাচ্ছেন না কেন ?

…কুয়াশার ভিতর মোটর গাড়ি চলেছে। টেলিগ্রাফের তারে কাক ব'সে আছে। ছোট খোকা বিজু ঢাকাঢুকি দিয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে মা-র কোলে। মা তিলের নাড়ু একটা বাবার মুখে পুরে দিল। বাবা না না ক'রে অর্ধেক খেলেন আর অর্ধেক মা'র মুখে পুরে দিলেন। দু'জনেই হাসছিলেন। তিলের নাড়ু ঝুর ঝুর ক'রে ঝ'রে চারদিকে ছড়িয়েছে। মা যেন বিরক্ত এমনি ভান ক'রে বলছেন—ড্রাইভারের সামনে আয়না আছে জানো ?…এই সেদিনকার কথা। আমরা যাচ্ছিলাম স্টেশনে বনুকাকাকে আনতে। বনুকাকা নতুন এখানে আসছিলেন সেদিন।

যদি বনুকাকা না আসতেন…

বাবুআ চেঁচাচ্ছে। রাজু ভ্যাঁ ভ্যাঁ করছে। মা এখুনি চ'লে আসবে। বনুকাকা চলে আসবেন। মা রাগবে।

(গীতা দৌড়ে গেল ছোটদের কাছে।—বাবুআ, চেঁচাস্ না।—রাজু, কাঁদিস্ না। বলতে বলতেই বাবুআ গীতাকে ঘুষি মারতে আরম্ভ করল। গীতা তার হাত দুটো ধরে এক ঘা মারতেই মা আর বনুকাকা এসে গেলেন। মা তাকিয়ে আছে তার দিকে কটমট ক'রে। বনুকাকা হাসছেন)।

—তুই কেন মারলি ওকে ?

—মা, আমি মারিনি। ও রাজুকে মারল, আমি ছাড়িয়ে দিলাম।

—ও মিছে কথা বলছে, বাবা। ও আমায় মারল। রাজুকে জিগ্যেস কর।

(রাজু মাথা নেড়ে সায় দিল। মা গীতার কান ধরল)।

—মা, আমি কিছু করিনি। ওরা চিৎকার করছিল, আমি ছাড়িয়ে দিলাম তুমি রাগবে ব'লে।

—চুপ্। ভারী মায়ের জন্য ভাবেন। দু'মিনিট মানুষের শান্তি নেই।—এই গীতা হচ্ছে সব নাটের গুরু গোবর্ধন।

(গীতা না চেঁচিয়ে কাঁদছে। ঝর ঝর ক'রে চোখের জল পড়ছে। তারি মধ্যে তাকিয়ে আছে মা আর বনুকাকার দিকে)।

আমি কিছু করিনি। মা যাতে রাগ না করে বলে ঝগড়া ভাঙ্গতে গিয়েছিলাম, পাছে মা আসে, রাগ করে, তার খুশি ভেঙ্গে যায়—

মা আমায় বুঝছে না। বনুকাকা হাসছেন। তাঁর হাসি দেখে রাগ হচ্ছে। ট্রেন চলে যাচ্ছে। মোটা মোটা চাকা। কালো কালো ধোঁয়া। ওরি নীচে বনুকাকা শুয়ে পড়েছেন। আর হাসবেন তখন?

(৬)

(বিকাল হয়ে গেছে। গীতা স্কুল থেকে হেঁটে আসতে আসতে মাঝে মাঝে কয়েক পা দৌড়ে যাচ্ছে। ছোকরা চাকর কুলিআ পিছন পিছন আসছে বইখাতা বয়ে।)

আজ নীরাদিদি বললেন—'গীতা ইজ এ গুড গার্ল, গীতা ইজ এ গুড গার্ল।' অঙ্কে দশের মধ্যে দশ, ইংরাজীতে দশের মধ্যে আট আর ড্রইং-এ ফার্স্ট। নীরাদিদি বললেন—এমনি ভাল করলে তুমি তো ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে যাবে। সুমিত্রা আমার দিকে কটমট ক'রে তাকাচ্ছিল। রাগ ছিল বোধহয় আমি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে যাব ব'লে।

মা আজ কত খুশী হবে। আদর করবে, আজ মার জন্মদিন। খুশী হয়ে নিশ্চয় পুরস্কার দেবে। রিবন্, কেক, নয়তো এক গোছা পেনসিল।

আজ মার জন্য প্রেজেন্ট কিনেছি, এক টাকার প্রেজেন্ট। কতদিন ধ'রে জমিয়ে জমিয়ে এক টাকা করেছি। এমন প্রেজেন্ট আর কেউ বোধ হয় আনতে পারবে না। রাজুটা কী দেবে? রবার একটা, নয়তো রাংতা একটুখানি দিয়ে বলবে—এই আমার প্রেজেন্ট। একদিন পরেই আবার চেয়ে নেবে. না দিলে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে থাকবে। রাজুর বুদ্ধি হয়নি।

আমার চেয়ে ভাল প্রেজেন্ট কি অন্য কেউ আনবে? বাবা কী আনবেন? নিশ্চয় কিছু ভালো জিনিষ হবে। মা দুজনের জিনিষ তাকের উপর সাজিয়ে সবাইকে বলবে—এই দেখ বাপ আর মেয়ের প্রেজেন্ট।

আর বনুকাকা? তিনি কী আনবেন? তিনি কেন কিছু আনবেন? তিনি মা'র কে যে—

না, আনুন না। কী হয়েছে তাতে? মা খুশী হবে।

মা কি তাঁর দেওয়া জিনিষ পেয়ে বেশী খুশী হবে?

……লম্বা লম্বা তাল গাছ! মাথায় এক রাশ খাড়া খাড়া চুল। গা'টা হাড়ের মত, সব যেন চাঁচা হয়ে গেছে। খালি মাথাটা বাকী আছে। এ কী—মাথার ভিতর থেকে লাল কি উঁকি মারছে! সিঁদুর লাগিয়েছে? উঁহু, মাথা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। না না, মাথায় কে খানিকটা আবির মাখিয়ে দিয়েছে। হোলি খেলছিল ও।

এস-ডি-ও'র বাংলো এল। আর একটু গেলেই আমাদের বাড়ী।

……নানীটা হিংসুটী। হিংসেয় জ্বলে যাচ্ছে। অলক্ষুণী। কেন দেখা হ'ল ওর সঙ্গে? কেন ওকে বললাম প্রেজেন্টের কথা? আমায় দেখাতে বলল। আমি দেখলাম না তাই বলল—আমাদের বাড়ীতে এ সব চলে না, বাবা রাগ করেন

বলেন ও সব চালিয়াতা ঢং। হুঁ, গেঁয়ো, অলক্ষুণী। নিজে তো যা ভালো মেয়ে! সূর্যমণি ওদের ক্লাসে পড়ে, বলছিল—ও ক্লাসে মার খায় আর মার খেলে হুয়া হুয়া ক'রে কাঁদে শেয়ালের মত! বাড়ীতেও মার খায় হয়তো, ওর মা কি ওকে মারে না?

আমার মা কি বেশী মারে? না—এখনই না এমনি মারছে, নয়তো আমার চেয়ে রাজু বেশী মার খায়।

আজ মার জন্মদিন। আজ মা'র মনটা নিশ্চয় খুশী আছে। আমার প্রেজেন্ট পেয়ে আরো খুশী হবে মা। জন্মদিনে মন ভালো থাকলে এক বছর অবধি মন ভাল থাকে, না? তাহ'লে মা আর রাগবে না—আজ থেকে……

ঐ আমাদের বাড়ী এসে গেল। এই যে মাইল-পোস্ট। তারপর উইঢিপি, রানী উইঘর বানিয়েছে। তারপর ফুটবল ফিল্ড্-এর দেয়াল। নার্গিস নাকে নোলক পরেছে। মা বলছিল ঠাকুমার অমনি নোলক ছিল। তারপর—তারপর আমাদের বাড়ী।

বাড়ীতে আলো জ্বলেছে। বাইরে কেউ নেই। মা বোধ হয় ভিতরে। বাবা আপিস থেকে ফেরেন নি বোধহয়। রাজু-বিজু কী করছে, বেড়াতে গেছে? ওদের বেশ মজা! আসছে বছর স্কুলে গেলে রাজুর মজা ফুরিয়ে যাবে।

অন্ধকার হয়ে গেছে। সিনেমার ছবি দেখা যাচ্ছে না। মাঠের দেয়ালের কাছে জলের সরু ধারা একটা, কালো কালো দেখাচ্ছে। কাছে যাব? না—ওর ভিতর সেদিন ছিল একটা কালো পোকা। পোকাটা আছে বোধ হয় এখন। অন্ধকারের মধ্যে ব'সে আছে, ঘাসের ভিতর চুপচাপ ক'রে। রাক্ষসী বুড়ী, অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে ব'সে আছে একলা, কাছে গেলে টপ্ ক'রে গিলে খাবে।

শীত করছে। গায়ে হাতে কেমন একটু একটু ফুলে ফুলে উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। শীতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে? ভয় করলে তো গায়ে কাঁটা দেয়!

প্রেজেন্ট কই? প্রেজেন্ট হাতে আছে তো? (গীতা মুঠো ক'রে ধরল তার হাতের কাগজের মোড়কটা। তার হাঁটা আস্তে হয়ে গেল বাড়ীর ফটকের কাছে এসে।)

ঘরে আলো জ্বলছে, বাইরেটা অন্ধকার, কেউ নেই। ফুলেরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে।

পূঝারী* দরজা খুলে দিয়েছে। মা কই? মা গেছেন মিশ্র বাবুদের বাড়ী। ছেলেরা খেলতে গেছে। বাবু আপিস থেকে ফেরেন নি।

মা নেই, কেউ নেই। মার কি মনে নেই আজ ওর জন্মদিন?

না, মা এখুনি ফিরে আসবে। আমি মাকে বলব আমি ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছি। মা আসার আগে আমি আমার প্রেজেন্ট গুছিয়ে রাখব মাঝের ঘরে, আলোর নীচে। মা খুশী হবে। কেউ নেই, ভালোই হয়েছে।

---

*পূঝারী—ঠাকুর, পাচক ব্রাহ্মণ।

আচ্ছা, আগে ওটা বাইরের ঘরে নিয়ে যাই, সেইখানে ওটা খুলে ঠিকঠাক ক'রে তারপর মাঝের ঘরে নিয়ে যাব।

(বাইরের ঘরে যেতে যেতে গীতা দাঁড়িয়ে পড়ল পিছনের বাগানের দিকের দরজার কাছে। দরজা খোলা।)

চারদিক অন্ধকার। গাছের কাছে বেশী অন্ধকার। অন্ধকারে কথা শোনা যাচ্ছে। কথা নয়—বাতাস, বাতাসে গাছ কথা বলছে। কত দূ'রে কাদের বাড়ীতে আলো জ্বলছে। চৌধুরীদের বাড়ীর দোতলায় আলো জ্বলছে। আলো বাতাসে কাঁপছে না কেন?

বাইরের ঘরের আলো জ্বলছে। দেয়ালে ফোটো টাঙ্গানো—মা আমায় কোলে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। মা হাসছে না।

বাতাসে অন্ধকার কাঁপছে, কথা বলছে; কিন্তু আলোয় কিছু হচ্ছে না। মা আলোতে রয়েছে একলা, কাঠের মত চুপটি ক'রে, সেখানে বাতাস যাচ্ছে না। বাতাস সেখানে এলে মাথার চুল ফুর-ফুর ক'রে উড়ত। মার ঠোঁট কেঁপে উঠত। মা হাসত, কথা বলত, রাগত—।

মা যদি সত্যি এই ফোটোর মত হয়, রাগ করাও বন্ধ করে দেয়—।

ঐ ওদিকে পুলিস-লাইনের মাঠের উপর চাঁদ। খানিকটা কেটে বাদ দেওয়া। ছুরি দিয়ে কাটার মত নয়, কেউ যেন ছিঁড়ে নিয়েছে। তার চারিদিকে গোল ক'রে ছাই ছাই মত আলো—কুয়াশা।

চাঁদ মামা। ওকে মামা বলে কেন? মার ভাই, মার চার ভাই, আর ও পাঁচ। সত্যি মামা? মামার মুখ গোল, মামার মুখ ফরসা। মার মুখ গোল। ফরসা মামা হাসছে—না তো। একলা মুখ শুকিয়ে বসে আছে। কাছে একটাও তারা নেই। কেউ নেই! একলা। মার মত।

(৪)

(কিছুক্ষণ পরে। গীতা বাইরের ঘরে। তার এলোমেলো খেলনাগুলো গোছাচ্ছে।)

মাঝখানে বরকন্যা, দুই পাশে বাজনদারেরা। কনের সঙ্গে যাচ্ছে পালঙ্ক, আলমারি, টেবিল, সোফা-সেট। আর সেলাইকল, রেডিও? এবার বাজারে গেলে মাকে বলব, কিনে দেবে।

তাকের উপর থেকে শিবঠাকুর চেয়ে আছেন। একটা পা তুলেছেন বেঁকিয়ে। হাতে ডমরু। 'বম্ বম্ বাজে ডমরু······বাজে ডমরু।'

মা'র প্রেজেন্ট এইটে—মা কোথায় রাখবে? বাইরের ঘরের খেলনার তাকে, মাঝের ঘরের তাকে, না শোবার ঘরের আয়না-টেবিলের উপরে? মা কি আবার আমায় ফিরিয়ে দেবে? আমার বরকন্যা তা পেলে ভারী খুশী হ'ত। না থাক্, ও মার, মা ওটা নিয়ে যা ইচ্ছে করবে।

খুলি এবার—এক, দুই, তিন···কাগজে বাঁধা বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। আমি একটা ভাল পিচ বোর্ডের বাক্স চাইলাম, দিল না।

প্রেজেন্ট। পদ্মফুল। ঝকঝকে সাদা ঝিনুক, একটি একটি ক'রে লাগানো। ফুলের পাপড়ি, পাপড়ির আগায় সরু সোনালী দাগ কাটা। ফুলের মাঝখানে কি রোঁয়া রোঁয়া মতন লাগানো। হলদে রঙের। ফুলের কেশর।

দোকানদার বলছিল বেশী টাকা দিলে আরো সুন্দর ফুল পাওয়া যেত, সোনা রুপো লাগানো। যাক্, এটাও কি সুন্দর হয় নি?

এইটেকে নিয়ে যাই তাকের উপর। শিবঠাকুরের কাছে। সব আলো নিবিয়ে দেব। খালি দেয়ালের সেই সাদা আলোটা জ্বলতে থাকবে—ঠিক শিবঠাকুরের গায়ে পড়বে আর আমার পদ্মফুলের উপর।···

···ভাল হয়নি? নিশ্চয় ভাল হয়েছে, চমৎকার হয়েছে। কী বল মিস্টার শিবঠাকুর? মা নিশ্চয় খুশী হবে, না?

আচ্ছা, এটাকে মাঝের ঘরে নিয়ে যাই। মা ঐখানে আগে যাবে। মা-র চোখে পড়বে।

('প্রেজেন্ট' হাতে নিয়ে গীতা আস্তে আস্তে মাঝের ঘরের দিকে এগল। ঘরের চৌকাঠের কাছে পৌঁছে হাতড়ে হাতড়ে আলোর সুইচ টিপল।)

ঘর ভরতি আলো। বিছানা হয়নি। ছেলেদের ধোয়া জামা কাপড় গাদা হয়ে প'ড়ে আছে অমনি। মা এলে রাগবে কুলিআর উপর।

আরে এটা কী? দেয়ালের কোণে তিনকোণা ব্র্যাকেটের উপর নতুন একটা জিনিষ রাখা! ধপধপে সাদা। সাদা পাথর না রুপো? সবটা আলো গিয়ে পড়েছে ওর উপরে। কত বড়, কী সুন্দর! কে আনল এটা?

হাত পাবে না ওখানে। খাটের বাজুর উপর উঠে দেখি।

(তার 'প্রেজেন্ট'টা জানালার উপর রেখে গীতা খাটের বাজুর উপর উঠল নতুন জিনিষটি দেখবে ব'লে।)

কাছ থেকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। আরো বড় আর সাদা। কী এটা? বাড়ী না মন্দির? না না, এটা তাজমহল। আমাদের ইতিহাস বইয়ে ছবি আছে। সাদা মার্বেল পাথরে তৈরী। আগ্রায় আছে। কে তৈরি করেছিল যেন—?

এটাও কি মার্বেল পাথর? হ্যাঁ তো—হাতে কী মোলায়েম লাগছে। ঠাণ্ডা লাগছে। কত টাকা দাম হয়তো—।

ওর নীচে একটা কাগজ। কি লেখা আছে সবুজ কালি দিয়ে।

'নূআ বোউকে জন্মদিনে—বনু'। বনুকাকা দিয়েছেন? মা-র জন্য প্রেজেন্ট?

পিছন দিকে কুলিআ এসেছে।—গীতাদেঈ,[১] ওতে হাত দিও না। এই একটু আগে বনুবাবু এসেছিলেন, রেখে দিয়ে গেছেন। মা দেখেন নি।

---

১ দেঈ—বড় বোন অথবা সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যাকে সম্বোধন।

—আচ্ছা আচ্ছা, যা, আমি জানি। তুই যা তো এখান থেকে।

বনুকাকা প্রেজেন্ট দিয়েছেন। চমৎকার জিনিষ। দামী জিনিষ। মা খুশী হবে। ভাল জিনিষ বলে, আর বনুকাকা দিয়েছেন বলে।

আমার জিনিষ রয়েছে জানলার উপর। জানলার অন্ধকার কোণে। সাদা দেখাচ্ছে না, চকচকে দেখাচ্ছে না, ময়লা দেখাচ্ছে।

মাকে দেব না আমার প্রেজেন্ট? দিয়ে কী হবে? কোথায় তাজমহল আর কোথায় আমার ঝিনুক। মা রেখে দেবে কোন কোণে, আর খোঁজ রাখবে না। বনুকাকার জিনিষটা ভেঙ্গে দিলে, ফেলে দিলে—?

না না, প্রেজেন্টটা বেশ সুন্দর। এ হচ্ছে বড়দের প্রেজেন্ট, আর আমার হচ্ছে ছোটদের প্রেজেন্ট। মা বনুকাকার প্রেজেন্ট পেয়ে খুশী হবে। আমার প্রেজেন্ট পেয়েও খুশী হবে।

এ জিনিষটা কি এখানে থাকবে? না বাইরের ঘরে নিয়ে যাব? চৌধুরীদের বাড়ীর ওরা মহীশূর গিয়েছিল, তাদের আনা জিনিষ বাইরের ঘরে আছে। নন্দভাই বম্বে থেকে কত জিনিষ এনেছিলেন, সেও তো সব সেখানেই আছে। বনুকাকার জিনিষ ঐখানে থাকবে. ভাল হবে।

এইখানে রাখব আমার জিনিষ। মার চোখ আগে পড়বে এখানে।

(গীতা তাজমহলের প্রতিমাটি আস্তে ক'রে তুলে একটা হাতে জড়িয়ে ধ'রে নামবার চেষ্টা করল।)

আরে—না না—উঃ—'দড়াম্'...(তাজমহল নীচে প'ড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। গীতা কাছে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে সেই দিকে। চোখ দুটিতে ভয়, সব-গেলর ভাব।)

এ কী হল? কেন হল?

মা-র জন্মদিনের প্রেজেন্ট ভেঙ্গে গেছে। বনুকাকার দেওয়া প্রেজেন্ট ভেঙ্গে গেছে। মা-র সব ভালবাসা ভেঙ্গে যাবে।

মা রাগবে। মা তো সবদিন রাগে, কিন্তু আজ আরো রাগবে। বনুকাকার জিনিষ ভেঙ্গে গেছে। জন্মদিনের সব আনন্দ চ'লে যাবে।

আর আমি মা-র জন্য প্রেজেন্ট এনেছিলাম। সে ঐখানে প'ড়ে আছে জানলার উপর। সেটাও ভেঙ্গে দিই গে।

না না, আমি ওটা ভাঙ্গিনি। আমি জেনে শুনে ভাঙ্গিনি। আমি চাইনি বনুকাকার জিনিষ ভেঙ্গে যাক। বনুকাকার দেওয়া জিনিষ পেলে মা বেশী খুশী হবে। আমি ওটা বাইরের ঘরে রাখতে যাচ্ছিলাম।

মা কি বুঝবে? বাইরের ঘরে নিয়ে যাচ্ছিলাম কেন? আমার জিনিষ এখানে রাখছিলাম কেন?

না, আমি জেনে শুনে কিছু করিনি। আমি বনুকাকার জিনিষ ভাঙ্গিনি। মা আমায় ভালবাসে। মা বুঝবে।

কিন্তু বনুকাকার জিনিষ ভেঙ্গে গেছে। বাড়ীর জিনিষ নয়। বাবার জিনিষ নয়। মা খালি রাগবে না, মা ব্যস্ত হয়ে উঠবে।

আমি কেন এখান থেকে নিয়ে যেতে গেলাম ওটা? মা আমার জিনিষ আগে দেখবে ব'লে? কেন এমন করলাম? বনুকাকার জিনিষ আমার চেয়ে ভালো, সুন্দর। মা-র জন্য বনুকাকার জিনিষ আমার চেয়ে ভালো, সুন্দর।

এখুনি ওরা আসবে। মা ফিরবে। বনুকাকা আসবেন। মুখে মুচকি হাসি। বাবা আসবেন, কিন্তু তাঁর আসার সঙ্গে কি?

আমি কেন এমন করতে গেলাম?···

(দু'হাতে মুখ ঢেকে গীতা খাটের উপরে ব'সে পড়ল। চোখের জলে তার দু'হাতের তেলো ভিজে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে।)

জুতোর মচমচ শব্দ। কে এল? বনুকাকা নয়। বাবার পায়ের শব্দ।

(গীতার বাবা ঘরে ঢুকে দেখলেন এ দৃশ্য। মুখে ক্লান্তি ও ব্যস্তভাব প্রতিদিনের মত।)

—এটা কী প'ড়ে আছে?

(উত্তর নেই।)

—এটা কী ভেঙ্গেছে, জিগেস্ করছি না?

—প্রেজেণ্ট, বনুকাকা এনেছিলেন মার জন্য।

বাবা চুপ ক'রে রইলেন। কী ভাবছেন। বাবা ফিরে যাচ্ছেন। কিছু বলছেন না কেন?

(কান্নার ভিতরেও গীতার মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটা নূতন আশা মনে জাগল যেন।)

বাবা ফিরে যাচ্ছেন। জিগেস করব? জিগ্যেস করব?······

—বাবা, বাবা—

—কী?

(গীতা দৌড়ে গেল বাবার কাছে।)

—বাবা······মার জন্য প্রেজেণ্ট এনেছ?

চন্দ্রের অভিশাপ

অখিলমোহন পট্টনায়ক (1927—)

পুরী জেলার খোর্ধা শহরে একটি সাহিত্যিক পরিবারে অখিলমোহনের জন্ম। গল্পকার বাঙ্কনিধি পট্টনায়ক তাঁর পিতা। অখিলমোহনের গল্পে পিতার প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর লেখায় প্রগতিধর্মীতা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। তাঁর গল্পের এক ভিন্ন স্বাদ পাঠককে আকর্ষণ করে। অখিলমোহন বর্তমানে ভুবনেশ্বরে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'ঝড়র ঈগল' ও 'ধরনীর কৃষ্ণসার'।

দশ বৎসর পূর্বেকার কথা।

সরোজ আর সীমাদ্রি ছিল পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সিটি কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্র ছিল তারা। সীমাদ্রি ছিল আর্টিস্ট। সে ছবি আঁকে না বা শুয়ে শুয়ে জ্যোৎস্না বসন্ত বা গোলাপ ফুল মার্কা কবিতা লেখে না। সে বলে বাঁচাই সব চাইতে বড় আর্ট। আর যে নিত্য নতুন ক'রে বাঁচতে পারে তার চেয়ে বড় আর্টিস্ট আর কেউ নেই। সেই জন্য চেস্টার্টন না হয়ে বরং তাঁর "আজব জীবিকা"র চরিত্র হওয়াই তার বেশী পছন্দ। সে মম্-এর মত পৃথিবী বিখ্যাত হতে চায় না, তাঁর সৃষ্টি 'স্ট্রিকল্যাণ্ড' চরিত্রের মত কোনো অজ্ঞাত গিরি-কন্দরে দুরারোগ্য ব্যাধিতে তিল তিল ক'রে মরতে চায়। সীমাদ্রি নিছক আর্টিস্ট, আর রোমাণ্টিসিজম তার এক সহজাত প্রবৃত্তি বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু সরোজ পুরাপুরি সিনিক্। এ দুনিয়াটার যে কিছু হবে কোনোদিন বা মানুষের জীবন নিয়ে যে বাস্তবিক সার্থক কিছু ক'রে তোলা যেতে পারে। এ কথা সে একেবারেই বিশ্বাস করে না। সে সীমাদ্রির যথার্থ কাউন্টারপার্ট আর সেই জন্যই বোধহয় তারা পরস্পরের এত কাছাকাছি এসেছিল।

শহরের কোলাহল তাদের বিশেষ আকৃষ্ট করে না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় দুই বন্ধু বেড়াতে যায় খাল পারে। শহরের এক প্রান্তে এই খালটি কিছুদূর বয়ে গিয়ে হঠাৎ মোড় বেঁকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রতিদিন বেড়াতে গিয়ে তারা সেখানে একটা জায়গা আবিষ্কার করেছে। জায়গাটি ছোট। কয়েকটা বড় বড় গাছের

আড়ালে, অপেক্ষাকৃত নির্জন। ঠিক জলের ধারে খানিকটা জায়গায় বালি জমে গেছে, আর তারি উপরে একটা পাথরের থাম কে জানে কোন কাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে রোদ আর বৃষ্টির অত্যাচার সহ্য করে। সেটা বোধহয় একটা পুরানো জীর্ণ তুলসী-মঞ্চ বা ঐরকম কিছু, আর তারা যেখানে বসে সেটা বোধহয় একটা পরিত্যক্ত স্নানের ঘাট। কালক্রমে একটির অব্যবহারে অন্যটি পঙ্গু হয়ে পড়েছে। শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় স্থানটি বেশ রোমান্টিক হয়ে ওঠে। সীমাদ্রি বলে—এইখানে এলে আমার মনে হয় শেকস্‌পিয়রের মিডসামার নাইটস্‌ ড্রীমের পরীরা বোধহয় নিশার্ধে এখানে নেমে এসে হাত ধরাধরি ক'রে নাচে চাঁদের আলোয়। সরোজ শ্লেষ ক'রে বলে—তুই তো জানিস্‌ শেকস্‌পিয়র বলে কোনো লোক ছিল কি না সেটাই আজ ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের এক অতি বিতর্কিত সমস্যা, তাঁর লেখার আবার পরীদের অস্তিত্ব, তায় আবার এই খালের ধারে।

সীমাদ্রির যে ঠিক এইখানে ধৈর্যচ্যুতি হবে তা সরোজ বেশ জানে। সীমাদ্রি চিৎকার ক'রে ওঠে—কতবার বলেছি তোকে, আমরা যা জানি না সেটা যে পৃথিবীতে নেই বা থাকতে পারে না এ কথা ভাবার চাইতে বড় মূর্খতা আর কিছু নেই। ইম্যাজিন্‌, পঞ্চদশ শতাব্দীতে যদি তোর মত একটা মূর্খ উড়োজাহাজের ধারণাটাকে হেসে উড়িয়ে দিত—সে হয়তো এতদিন বাঁচত না, কিন্তু যদি বাঁচত তাহলে সে উপলব্ধি করত তার মূর্খতা।

আর কোনো কিছুর দরকার নেই। যে কোনও একটা টপিক্‌ হাতের গোড়ায় পেয়ে গেলেই সময়টা চমৎকার কাটে। তর্কের ক্লাইম্যাক্সে সীমাদ্রি তার হাতের চাবির গোছাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় খানিক দূরে। নয়তো পুরো সিগারেট প্যাকেটটা হাতের মুঠোয় চটকে ফেলে দেয় খালের জলে। যেন এই সিগারেট আর চাবি প্রভৃতি পদার্থগুলোই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে সরোজের যুক্তির সমর্থন করছে। সময় হয়ে গেলে ওদের একজন অনিবার্য সন্ধির শর্ত পেশ করে—আচ্ছা বেশ, লেট আস এগরি টু ডিফার। দুই জন ক্লান্ত বিমর্ষ গলদ্‌ঘর্ম বন্ধু সন্ধিপত্রে অবিলম্বে স্বাক্ষর করে।

পূজোর ছুটির পর কলেজ খুলেছে। সরোজ নাইট এক্সপ্রেস থেকে নেমে হস্টেলে এসে দেখে সীমাদ্রি এসে গেছে। তার জিনিষপত্র সব রয়েছে তার রুমে, অথচ সীমাদ্রির দেখা নেই। কিন্তু সেকেণ্ড শো সিনেমা তো অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। সীমাদ্রি গেল কোথায়? সরোজ অনিবার্য সিদ্ধান্তে পৌঁছে খাল পারে চলে। খালের ধারে এসে সরোজ দেখে তার অনুমান নির্ভুল ঃ নিশ্চিন্তভাবে সেখানে শুয়ে আছে সীমাদ্রি। প্রথমটা একটু অশ্বস্তি লাগে সরোজের। জায়গাটার নির্জন পরিবেশে যেকোনো লোকের মনে ভয় হওয়া স্বাভাবিক। এত রাত্রে এখানে কী করছে সীমাদ্রি একলা? বিস্ময়ের সীমা থাকে না সরোজের। কাছে গিয়ে দেখে সীমাদ্রি কিন্তু ভয় পাওয়ার অবস্থায় নেই মোটেই। নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমাচ্ছে সে। আশ্চর্য! কয়েকবার ডাকল সরোজ, কিন্তু সীমাদ্রির সাড়া নেই। অগত্যা তার গায়ে হাত দিয়ে দু'একবার জোরে নাড়া দিল সে।

কিন্তু তার পরে যা ঘটল তার জন্য সরোজ প্রস্তুত ছিল না মোটেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে উঠে সীমাদ্রি এক লাফে গিয়ে একটু তফাতে, আর সেখান থেকে কিছুক্ষণ নিস্পন্দভাবে চেয়ে থাকে সরোজের দিকে, আর তার পরেই চিৎকার করে ওঠে—কে—কে তুমি? ভয়জড়িত কণ্ঠ সীমাদ্রির। খুব ভয় পেয়ে গেছে সে। আর কোনো দিন হলে হয়তো সরোজ সীমাদ্রির এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে একটু তামাশা করত। আজ কিন্তু সীমাদ্রির এই অবস্থায় সরোজ নিজেই বেশ খানিকটা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। মুহূর্ত বিলম্ব না ক'রে—আরে, আমি সরোজ, আমি সরোজ—ব'লে সে এগিয়ে গেল সীমাদ্রির দিকে। কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সীমাদ্রি। গা দিয়ে তার দর দর ক'রে ঘাম ছুটছে। সরোজ অপরাধীর মত বলে—তুই এত ভয় পেয়ে যাবি ব'লে আমি মোটে ভাবিনি সীমাদ্রি।

সীমাদ্রি আর একবার সরোজের দিকে আপাদমস্তক চেয়ে দেখে। তার পরে নিজের হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে—আমি কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেই জানি না। এত রাত হয়ে গেছে, আমায় আরো আগে তুলে দিসনি কেন বলতো?

সরোজ বলে সে মাত্র কয়মিনিট হ'ল তাকে খুঁজতে খুঁজতে এইখানে এসে পৌঁছেছে। সে কেমন ক'রেই বা ভাববে যে এত রাত্রে সীমাদ্রি শুয়ে ঘুমোচ্ছে এইখানে।

সীমাদ্রি আরো বিস্মিত হয়। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে শুধোয়—সত্যি বলছিস্ সরোজ, তুই আমার সঙ্গে এখানে আসিসনি?

সরোজ সামান্য একটু আমোদ অনুভব করে এবার। বলে—নাইট এক্সপ্রেসে রাত দুটো পর্যন্ত অনিদ্রায় কাটিয়ে এখন খাল ধারে আসার উৎকট কবিত্ব আমার নেই।

সীমাদ্রি নীরবে পা বাড়ায় ফেরার জন্য। চলতে চলতে বলে—আমিও আজ 'জনতা'য় এসে পৌঁছেছি সন্ধ্যে ছ'টার সময়। বড় ক্লান্ত লাগছিল। বিছানাটা খুলে নিয়ে খাটের উপর লম্বা হয়ে পড়লাম। তার অল্পক্ষণ পরে—আমার স্পষ্ট মনে আছে—তুইও এসে পৌঁছালি তোর সেই ছেঁড়া চামড়ার সুটকেস আর হোলড-অলটা নিয়ে, ঠিক তেমনি বেপরোয়া ভাবে। বললি, গুড ইভনিং সীমাদ্রি, তুই এসে গেছিস্ তাহলে, দ্যাটস্ লাইক এ গুড বয়। আমি কী জবাব দিলাম মনে নেই। তার পরে তুই খুব ব্যস্ত হয়ে উঠে বললি কী হয়েছে তোর সীমাদ্রি? আই হ্যাভ নেভার সীন ইউ সো ভেরি মুডি। আমি বোধহয় তবু কিছু জবাব দিইনি। তার পরে তুই তোর কাপড়ও না বদলে আমার হাত ধ'রে একটান মেরে আমায় উঠিয়ে দিলি খাটের উপর থেকে, আর বললি—চল্ চল্, আমাদের কুরুক্ষেত্রে চল, অনেকদিন যাওয়া হয়নি সেখানে, সেইখানে সব সমাধান হয়ে যাবে। ইস্, কী বাজে ছেলে হয়ে গেছিস্ তুই এই ক'টা দিন ছুটির ভিতরে, ছি ছি! তার পরে আমরা দু'জন বেরিয়ে এসেছি, আর আমাদের চিরপরিচিত রাস্তা ধরে এসে গেছি এইখানে।

আমার ঠিক মনে আছে, আমি এইখানে ব'সে ব'সে তোকে 'রীতা'র কথা

বলছিলাম—এই প্রথম। আমি কেমন করে রীতার প্রতি অতি অসহায়ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি অথচ মুখ খুলে রীতাকে প্রেম নিবেদন করার সাহস আমার নেই।

তোর মুখ চাপা হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ছিল। আমার পিঠ চাপড়ে বললি—তাই বল্। এই ছুটিটা বিরহে কাটিয়ে ইয়ং লকিনভার একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। তার পরে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে তুই বললি—আজ কিন্তু আমি এই প্রথম জানলাম সীমাদ্রি যে তোর অনেক কথা আছে যা তুই আমার জানা প্রয়োজন মনে করিস্ নি।

তারপরে আমি আর কিছু মনে করতে পারছি না। আমি জানিনা কখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। আস্তে আস্তে সব ভুলে গেছি। হঠাৎ নিজেকে এইখানে আবিষ্কার ক'রে আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

সরোজ চুপচাপ সব শুনে যেতে থাকে। শেষে বলে—তুই তাহলে কি বলতে চাস হস্টেল থেকে এই খাল পার পর্যন্ত এই আধমাইল রাস্তা তুই চ'লে এসেছিস্ তোর অজান্তে, সম্পূর্ণ নিদ্রিত অবস্থায়?

সীমাদ্রি ছোট একটি 'হুঁ' ব'লে নীরব হয়।

সরোজ বলে—কিন্তু—

সীমাদ্রি বলে—এতে কিন্তু নেই সরোজ, এটা ঠিক সেই জিনিষ যাকে মেডিক্যাল সায়েন্সে বলে সোমনাম্বুলিজম।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে সীমাদ্রি ব'লে চলে—তোর বোধহয় মনে আছে আমি সেবার যে স্টেয়ার-কেস্ থেকে প'ড়ে গিয়েছিলাম সেটাও সেই নিদ্রিত অবস্থায়। তুই নিশ্চয় ভাবছিস আমি আজ পর্যন্ত কেন তোকে এ কথা বলিনি। একজন সোম্নাম্বুলিস্টের সঙ্গে এক রুমে থাকাটা সবাই সহ্য করতে পারে না—বুঝতে পারিস নিশ্চয়—কেমন একটা আন্ক্যানি ফীলিং হয়। কেবল সেইজন্য আমি কথাটা চেপে গিয়েছিলাম আজ পর্যন্ত।

সরোজ কিছু উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করল—রীতা কে সীমাদ্রি?

সীমাদ্রি বলল—সে সেকেণ্ড ইয়ার সায়েন্সের ছাত্রী, লেডিজ হস্টেলে থাকে। বোটানিকাল গার্ডেনে আমার সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা হয়, আলাপও হয়।

সরোজ বলে—হুঁ।

দুই বন্ধু ততক্ষণে হস্টেলে পৌঁছেছে।

দুই

সেদিন ভারী ফুটফুটে জ্যোৎস্না। খাল ধারে সেই ছোট জায়গাটির বালুকাশয্যায় শুয়ে থাকে দুই বন্ধু নীরবে। কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে তারা একাগ্র চিত্তে লক্ষ করতে থাকে সেই পরিত্যক্ত বিগত প্রতিষ্ঠ জরাজীর্ণ তুলসী-মঞ্চটিকে। এই কিছুদিন আগের একটা নতুন আবিষ্কার নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করায় তারা আত্মবিস্মৃত।

সীমাদ্রি খুব আস্তে আস্তে বলতে থাকে—দ্যাখ, ওর বাঁ কাঁকালে একটা কলসী, কোমরের কাছে শরীরটা সামান্য বাঁ দিকে ঝুঁকে এসে আবার ডান দিকে ঢলেছে, মাথাটিও দেহের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ডান দিকে নুয়েছে সামান্য।

সরোজ বলে—হুঁ, ওর শাড়ীর ভাঁজগুলোও দেখেছিস্ তো!

সীমাদ্রি যোগ করে—মাথায় নিশ্চয় ঘোমটা নেই, নইলে তার এমন সুন্দর কেশবতী খোঁপাটা দেখা যেত না।

এক মুহূর্তের জন্য দুই বন্ধুর তন্ময় চক্ষুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে একটি স্বাস্থ্যবতী পল্লীবধূ, হাতে কলসী নিয়ে।

সরোজ বলে—ওর নাম 'তমিস্রা'।

সীমাদ্রি প্রতিবাদ করে—আমি কিন্তু ওর নাম দিতাম জ্যোৎস্নারেণু'।

তর্ক বেশী দূর এগোয় না। প্রত্যেকের নিজস্ব নামকরণে প্রত্যেকে সন্তুষ্ট থাকে। তারপর হঠাৎ মনের টেনশন্ আলগা করে দেয় তারা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু অন্ধকার আর কিছু জ্যোৎস্নার রেণু নিয়ে গড়ে ওঠা জনপদবধূটির অপমৃত্যু হয়।

সীমাদ্রি আর সরোজ দু'জনেই জানে যে তারা সেই জীর্ণ তুলসী-মঞ্চটির দিকে চেয়ে চেয়ে নিজেদের মনে একটা সুনির্দিষ্ট মরীচিকা সৃষ্টি করছে। তুলসী-মঞ্চ থেকে তাদের দূরত্ব পনের গজের কম হবে, কিন্তু মঞ্চটির এই রহস্যময়ী অবস্থিতি তাদের চোখে সহস্র ইন্দ্রজাল বুনে চলে। কাছের কী একটা নাম না জানা গাছ তার বিশৃঙ্খল দীর্ঘ শাখা মেলে মঞ্চটির উপরে একটা প্রশস্ত আবরণ রচনা করেছে, আর তার ভিতর দিয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে অসংখ্য জ্যোৎস্নারেণু। অনেক আলোর রেণু আর অন্ধকারের রেণু লুকোচুরি খেলছে সেই পাথরের থামটার উপরে। তাদের কেবল চোখের লেন্স দিয়ে ধ'রে সাজিয়ে নিতে হয় আপন খেয়াল-খুশি মত।

পল্লীবধূর অপমৃত্যুর পরে হয়তো সেখানে আস্তে আস্তে তৈরী হয় এক ডাক-পিয়ন। যে অন্ধকারের রেণুপুঞ্জে তৈরী হয়েছিল বধূটির কেশবতী খোঁপা, হয়তো সেগুলিকেই সামান্য সরিয়ে সাজিয়ে তৈরী হয় পোস্টম্যানের ব্যাগ। তার গহন কালো চুলে চকচক করছিল যে রুপোর ফুলটি তাই নিয়ে করা হয় পিয়নের টুপির বোতাম। শাড়ীর ভাঁজগুলি নিয়ে রচিত হয় খাকী ট্রাউজার।

এই রূপান্তরটা ঠিক ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে বা গণিতের ক্রম অনুযায়ী হয় না। এটা হয় একটা সংবেদনশীল মনের সহজ লঘু সঞ্চরণে—যেমন সন্ধ্যা হ'লে শতদল ধীরে ধীরে মুদিত হয়, যেমন কৃষ্ণনীরা যমুনার সঙ্গে গঙ্গোত্রীর স্বচ্ছধারা একাকার হয়ে যায়, যেমন কোনো নিয়ম না মেনে, ক্রম রক্ষা না করে, এক স্বপ্ন গলে গিয়ে মিশে যায় আর একটা স্বপ্নে।

প্রথম কিছুদিন একটু অসুবিধা হয় তাদের, কিন্তু অল্প কয়দিনের অভ্যাসে দুই বন্ধু এতে বেশ নিপুণ হয়ে উঠেছে। প্রথমে মনের মাংসপেশীগুলোকে আলগা ক'রে দিতে হয়, তার পরে মন প্রাণ দিয়ে একটা নির্দিষ্ট বস্তুকে চোখের সামনে ফিক্স্ ক'রে নিয়ে তার চারিদিকে কিছু কুয়াশা দিয়ে শক্ত ক'রে নিতে হয়। একটি

বায়নাদার অবুঝ ছেলেকে চকোলেট দেখিয়ে বশ করার মতো মনকে আস্তে আস্তে তোষামোদ করে বিশ্বাস করিয়ে নিতে হয়।

প্রতি সন্ধ্যায় তারা এমনি অনেক ছায়ামূর্তি গড়ে আর ভাঙে। প্রথম আবিষ্কারের নেশা তাদের প্রায় ছুটে এসেছে। প্রথম দিকের হালকা আনন্দের মধ্যে এখন তারা খুঁজতে শুরু করেছে একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ।

সেদিন হঠাৎ সীমাদ্রি গম্ভীর হয়ে বলল—এটাই বোধহয় যোগের প্রথম সোপান : যে জিনিষকে আমরা পনের গজ দূরে দেখতে পাচ্ছি, আর একটু সাধনার পরে আমরা ঠিক সেই জিনিষ দেখতে পাব মাত্র পাঁচ গজ দূরে। দৃষ্টির যে মায়া আমরা এখন সৃষ্টি করতে পারছি সে মায়া হয়তো স্পর্শ ও গন্ধের জন্যও সৃষ্টি করতে পারব আর কিছুদিনের সাধনার পরে।

শুধু ঐটুকুই নয়—সীমাদ্রি ব'লে চলে—আজ আমি কিংবা তুই কেবল পরস্পরকে এই প্রবর্তনা দিতে পারছি, কিন্তু হয়তো আর কিছুদিন পরে আমরা ঠিক এই ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে পারব বহুলোকের জন্য—একসঙ্গে। তার জন্য কেবল দরকার মনের ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে বিশ্বাসের বীজ রোপণ······

সরোজ বিদ্রূপের হাসিতে ফেটে পড়ে—হ্যাঁ, তা না তো কী, আর একটু সাধনা করলেই হয়তো এইখানে একটা বিরাট সাধারণ সভা ডেকে আমরা প্রমাণ ক'রে দিতে পারব যে সবাই যা দেখছে তা একটা ভাঙ্গা তুলসী-মঞ্চ নয়, সেটা কোণার্কের মন্দির থেকে সদ্য আনা এক জীবন্ত লাস্যময়ী রূপসী! বুঝলি সীমাদ্রি—কাঁকে—কাঁকে—!

সীমাদ্রির বিরক্তির সীমা থাকে না। ক্যারম খেলার নিষ্ফল রিবাউণ্ডের মত সে সেই বিরক্তির বেগে উঠে যায় অতীতের দার্শনিকদের রাজ্যে—এমনি ব্যাপার নিয়ে কে কবে কোথায় কী মতামত দিয়েছেন, আর ঠিক তার পরেই সরোজকে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ দেখে ঠিক সেই বেগেই নেমে আসে উপস্থিত ঘটনাচক্রের মধ্যে। চিৎকার ক'রে ওঠে—সিনিক—সিনিক—হিদেন······এত হালকা মন নিয়ে তোর পক্ষে প্রাচ্য দর্শন সম্বন্ধে প্রারম্ভিক ধারণাটুকুও করতে পারা সম্ভব নয়।

দুই বন্ধু হস্টেলে ফিরে আসে। সরোজ বিছানায় পড়ে পড়ে নাক ডাকায় আর সীমাদ্রি বিছানার উপরে উসখুস করে। তার মনের ভিতরে একটি মাত্র বাসনা উঁকি মারতে থাকে। তার ভারী ইচ্ছে হয় গিয়ে দেখতে যে তারা চলে আসার পরে সেই পাথরের থামটা কী করছে। সে হয়তো একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'সে পড়ে তাদের অভিশাপ দিচ্ছে। তাদের জন্য তাকে বহুরূপী সাজতে হচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে। কিংবা হয়তো সেও শুয়ে আছে সরোজের মত অচেতন নিদ্রায়। অদ্ভুত কৌতূহল হয় সীমাদ্রির। সে যদি গিয়ে কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে ছুঁয়ে দিতে পারত সেই থামটাকে তাহলে হঠাৎ একটা গুণছেঁড়া ধনুকের মত সে চমকে দাঁড়িয়ে উঠত। দাঁড়াত তুলসী-মঞ্চের বেশ ধ'রে আর একবার। নইলে হয়তো ঠানদিদির রূপকথার সেই রূপবতী ব্যাঙ কন্যের মত ব্যাকুল হয়ে বলে উঠত—হায়, এ কী করলে, আমায় ছুঁয়ে ফেললে তুমি? তাহ'লে আর তো আমি হেথায় থাকতে পারি না। তারপর

সে হয়তো তার দুই শুভ্র ডানা মেলে উড়ে যেত শাপমুক্ত কিন্নরীর মত আলোয় আকাশ চিরে। তার পরদিন সে সরোজকে নিয়ে এসে এই অবিশ্বাসের সত্য উপলব্ধি করাতে পারত হয়তো।

এ কি কেবল চোখের ভুল? গভীর সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে সীমাদ্রির মনে। প্রাচীন আর্যরা যে জড়ের মধ্যে জীবন আবিষ্কার করেছিলেন তা হয়তো সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। তার সমস্ত শৈশবকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে এইধরণের অসংখ্য কিংবদন্তী আর কাহিনী। নিজের স্থূল শরীরকে পরিত্যাগ ক'রে অন্য এক জড়পিণ্ডে জীবন ন্যাস করার অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনেছে সে। সেসব কি শুধুই কল্পনা?

তিন

সরোজ খুব বুদ্ধিমান। সেইজন্য তার বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির পরিধির বাইরে যে আর কিছু থাকতে পারে তা মানতে সে আদৌ প্রস্তুত নয়। বিন্দু বিন্দু করে বিশ্বাস সঞ্চয় ক'রে সীমাদ্রি যখন ক্ষুদ্র একটি স্তূপ নির্মাণ করে আর তার অবসর সময়কে উপভোগ করতে যায় তখন সরোজ ঠিক তার দুর্বল স্থানটিতে আঘাত করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে সীমাদ্রির সমস্ত সঞ্চয় একটা সামান্য মৌলিক ভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যে পর্যন্ত সীমাদ্রি হাতে শক্ত করে কিছু একটা না পাচ্ছে সে পর্যন্ত সে কিছুতে সরোজকে বুঝিয়ে দিতে পারছে না যে তার বুদ্ধির পরিধি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, আর সেই ক্ষুদ্র পরিধিকে আরো সীমিত ক'রে দিয়েছে তার অহঙ্কার আর যুক্তির কুয়াশা।

আজকাল সরোজকে সঙ্গে না নিয়ে সীমাদ্রি একলা খালের ধারে যায়। প্রতিদিন সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে শুয়ে শুয়ে সে অনেক মূর্তি গড়ে আর ভাঙ্গে। সেইখানে বসে বসে আপন মনে নিজের সঙ্গে কথা কয়। সে জায়গাটা যেন সীমাদ্রির ল্যাবরেটরি। সে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য আবিষ্কার করার আগে আর কেউ এসে তার এক্সপেরিমেন্টে ব্যাঘাত করে তা সে চায় না। সে আর তার অবজেক্টের মাঝখানে আর কারও উপস্থিতি একেবারেই অসহ্য। তার মনটাও এর মধ্যে পোষ মেনে গেছে। মূর্তিগুলিকে রূপ দিতে খুব অল্প সময় ও পরিশ্রম আবশ্যক হচ্ছে তার। প্রায় প্রতিদিন সীমাদ্রি যায় সেখানে আর ফিরে আসে নূতন বিস্ময় ও বিশ্বাস নিয়ে।

'ইমেজ'-টাকেও সে পুরোপুরি আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলেছে। কখনো কখনো হস্টেলে তার জানালার কাছে বসে শূন্যে আকাশের গায়ে সে একখণ্ড মেঘ এঁকে নেয়, আর তারপরে তাকে বহু বিচিত্র রূপ দিতে থাকে। শূন্যে সেই তুলসী-মঞ্চটাকে বাড়াতে চেষ্টা করে সে। মহাকাশের মধ্যে মঞ্চটা অবিশ্বাস্যভাবে লম্বা হয়ে চলে।...দীর্ঘায়িত সেই ছোট থামটা আকাশের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকে পিসার হেলানো মন্দিরের মত। তারপরে হয়তো সেই সুদীর্ঘ স্তম্ভের চূড়া গিয়ে

আঘাত করে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রের গায়ে। সীমাদ্রির মুখে সন্তোষের দীপ্তি ফুটে ওঠে। পোতাশ্রয়ের লাইট হাউস ঠিক এই রকমই দেখায়। খালের ধারে সেই জীর্ণ থামটা আকাশের গায়ে এসে হয়েছে একটা আলোকস্তম্ভ—কে বলে থামটা জড়, অজ্ঞান, স্থাবর? সেই দীর্ঘ লাইট হাউসকে আবার ছোট ক'রে আনবার চেষ্টা করে সীমাদ্রি—মনের লেন্সে। অতি দ্রুতগতিতে ছোট হ'তে আরম্ভ করে তার অবজেক্ট আর ঠিক সেই মূল থামের আকারে এসে পৌঁছে স্থির হয়ে যায়; কিন্তু—না আরো ছোট করতে হবে। একই পরিশ্রম করতে হয় সীমাদ্রিকে। তার মনে হয় সে যেন ঠিক কামারের মত তার মনের হাতুড়িতে পিটে পিটে ছোট করছে থামটাকে। ছোট, আরো ছোট, অনেক ছোট হয়ে যায়। সীমাদ্রি যেন তার চোখের সামনেই দেখছে আকাশের বিরাট দাবার ছকে দাঁড়িয়ে আছে একটিমাত্র নিঃসঙ্গ নিরালা বোড়ে। বাঃ। খুশী হয়ে ওঠে সীমাদ্রি। কত ওজন হবে বোড়েটার? তার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনীটাকে বাড়াতে চেষ্টা করে সে মহাশূন্যেঃ স্বপ্ন দেখছে না তো সীমাদ্রি! তার আঙ্গুলের পাবগুলো বাড়তে শুরু করেছে। তারপর তার হাতের তেলো···আর ক্রমশঃ তার হাতটা অনেক দূর অবধি লম্বা হয়ে গেছে আকাশের মধ্যে। আর মাত্র কয় ইঞ্চি পথ। আনন্দে সীমাদ্রির আঙ্গুল দুটো কেঁপে উঠছে। সত্যিই কি সে তুলে আনতে পারবে আকাশের গা থেকে সেই ক্ষুদ্রায়ত বোড়েটিকে? দুই আঙ্গুলের স্বল্প ব্যবধানের মধ্যে সে স্পর্শ করতে পারছে—সে নিঃসন্দেহে অনুভব করছে একটা কিছু জিনিষ ধ'রে আছে সে। এবার গুটিয়ে আনা। তার মনে হচ্ছে যেন সাত রাজার ধন এক মাণিক সে তুলে আনছে আকাশ থেকে। কিং মিডাস বোধহয় এর চেয়ে বেশী সাবধানতার সঙ্গে ধরতেন না সোনার বাট একখানা। আবার ছোট হয়ে আসছে তার হাত—তার হাতের তেলো—আর তার আঙ্গুল, সব। তার চিরঈপ্সিত বস্তুটিকে সীমাদ্রি এনে রেখেছে তার বাঁ হাতের তেলোর উপরে। চোখ অপারেশন করার সময় ডাক্তার বোধহয় এর চাইতে সাবধানতার সঙ্গে ফরসেপ্স দিয়ে ধরতে পারত না চোখের তারাটা। তার হাতের মেলে ধরা তেলোর উপর সে তার ওজন পর্যন্ত অনুভব করতে পারছে। নতুন আবিষ্কারে সীমাদ্রির চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে ভাবছে এই মুহূর্তে যদি এখানে থাকত মূর্খ সরোজ, তাহলে তাকে বলত—গো অন্, যা দেখে আয় খালপারের সে থামটা আর নেই সেখানে। তাকে আমি লুঠ ক'রে এনেছি মনের জোরে। আর সে যখন খাল পার থেকে বিস্মিত হয়ে ফিরে আসত তখন সে তার চোখের সামনে আস্তে আস্তে তার বাঁ হাতের মুঠো খুলে দেখিয়ে দিত সেই থামের এই ক্ষুদ্র সংস্করণটিকে।

হই হুল্লোড় করতে করতে একদল ছেলে এসে ঢুকল সীমাদ্রির রুমের ভিতর। চমকে উঠল সীমাদ্রি। তার বাঁ হাতের মুঠো তবু খোলা রয়েছে, কিন্তু তার প্রিয় পদার্থটি আর তার উপরে নেই। চক্ষের নিমেষে তার হাতের তেলোর উপর থেকে যেন সেটা মিলিয়ে গেল সমুদ্রের ধারের উজ্জ্বল জেলি-ফিশের মত। মনে মনে

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল সীমাদ্রি। রুক্ষ স্বরে কিছু বোধহয় বলল সে তাদের—তারা নীরবে চলে গেল। রাত দশটা বেজে গেছে।

শোবার চেষ্টা করল সীমাদ্রি।

*   *   *   *   *   *

অনেক রাত হয়েছে।

দেখলে মনে হবে সীমাদ্রি শুয়ে আছে গভীর ঘুমে; কিন্তু সীমাদ্রি তার মুদ্রিত চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে খাল পারের সেই তুলসী-মঞ্চটিকে। সেটা আর স্থানু নয়—সীমাদ্রির মনের রশ্মি নিয়ে যেন তার সব স্নায়ু প্রাণ পেয়েছে, রুগ্ন মাংস-পেশীগুলি তার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বাতাস বইছে বোধহয়, আর সেই বাতাসে সেই পাথরের থামটা হেলছে দুলছে হাল্কা চালে। এক একবার দমকা হাওয়ায় থামটা নুয়ে পড়ছে একেবারে নীচে—যেন সে রবারের তৈরী থাম একটা। তার মনে হ'ল যেন সেই থামটা দুলে দুলে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে তাকে সেখানে যাবার জন্য।

বিছানায় হঠাৎ তাই উঠে বসল সীমাদ্রি।

তাকে এই মুহূর্তেই যেতে হবে সেখানে! রুমের আলো জ্বালতে মনে ছিল না তার। সরোজ আছে কিনা সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। হাত তার আপনি উঠে গেল দরজার হুড়কো খুলতে। হস্টেলের লম্বা বারান্দাটা সম্পূর্ণ নির্জন। একটিও ছেলে নেই কোথাও। একটা ম্লান আলোর আস্তরণের নীচ দিয়ে চলেছে সে মন্ত্রমুগ্ধের মত। তারপর সিঁড়ি, নির্ভুলভাবে প্রতিটি ধাপে পা ফেলে নামতে নামতে চলেছে সীমাদ্রি, আর তারপর সদর ফটক দিয়ে একেবারে বাইরের রাস্তায়।

রাস্তাটাও অতি নির্জন। স্টেশন থেকে ট্রেনের তীব্র হুইস্‌ল্ শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। সারি সারি রাস্তার আলোগুলিকে সীমাদ্রির চোখে মনে হচ্ছে আকাশ থেকে নেমে আসা আশ্চর্য সব তারার মত। একজন নেশাখোর রিকশাওয়ালা তীরবেগে রিকশা চালিয়ে চলে গেল সীমাদ্রির একেবারে গা ঘেঁষে—কিন্তু সীমাদ্রি তার চারিপাশের সমস্ত ঘটনার প্রতি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, নির্বিকার। তার দুই অর্ধ-নিমীলিত চোখের সামনে কেবল দুলে দুলে ইশারা করছে সেই থামটা। কস্তুরী-মৃগের মত সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে সীমাদ্রি চলেছে একটা অদৃশ্য অপরিহার্য শৃঙ্খলের অনিবার্য আকর্ষণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে।

তরল রূপোর মত জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে আছে। সেই জ্যোৎস্নার জাদুতে খালের জল বালি আর গাছ সব যেন রূপো হয়ে গেছে। সমস্ত পরিবেশকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে এক অব্যক্ত বিজনতা, যার মধ্যে মন্থর হয়ে এসেছে পৃথিবীর পার্শ্ব-পরিবর্তনের ঘূর্ণনবেগ। ধীরে অতি ধীরে একটি একটি করে পা ফেলে চলেছে সীমাদ্রি—একটু জোরে চললে বুঝি এই চিররহস্যময়ী পরিবেশের কুহক যাবে নষ্ট হয়ে। রাত্রি কত জানবার উপায় নেই। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকের পটভূমিকায় গাছের

সান্দ্র দীর্ঘ শাখাগুলি হয়েছে কৃষ্ণতর। গাছের নাম সীমাদ্রির অজানা। তবে গাছগুলোর স্বাতন্ত্র্য আছে। দেখলে মনে হয় যেন প্রত্যেকে তারা কোনও আর্টিস্টের আঁকা অসমাপ্ত পেইনটিং।

কাছে গার্ল'স্ হস্টেলের দোতালা বাড়ী দেখা যায়। তার ভিতরে অনেক তরুণী ঘুমাচ্ছে হয়তো। যেন কোনও দৈত্যের মোহমন্ত্রে অচেতন হয়ে আছে তারা। তাদের মধ্যে শুয়ে আছে রীতাও। আহা, কি নিপীড়িত রীতার যৌবন। রীতা কি চায় না এই জ্যোৎস্নার আলোয় লুটোতে, এই শীতল বালুশয্যায়? সে কি অসহায়ভাবে চাইছে না এই দেয়ালের ইঁটগুলো গ'লে যাক, খ'সে পড়ুক এই মাতাল জ্যোৎস্নায় ভিজে ভিজে?

মুহূর্তে সীমাদ্রির মন করুনায় আর্দ্র হয়ে উঠল। রিতাকে কি উদ্ধার করা যায় এই যক্ষপুরীর ভিতর থেকে? হয়তো। সীমাদ্রিকে আসতে হবে একদিন জলের সন্ধানে রাজপুত্রের মত···তার পরে হয়তো ঘোড়ার জিনের উপরে তার উষ্ণীষটি রেখে দিয়ে তাকে উঠতে হবে লোহার পাইপ ধ'রে দোতলায়···তারপরে হয়তো— সীমাদ্রি চোখ ফেরাল সেই জীর্ণ তুলসী-মঞ্চের থামটার দিকে, এই থামটাকে যদি সে করতে পারত আলাদিনের সেই আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্য, তাহ'লে হয়তো তাকে সে আদেশ করতে পারত রীতাকে উদ্ধার করে আনতে। ওঃ, একবার—একবার যদি সে চেতনা সঞ্চার করতে পারত এই জড় জীর্ণ পাথরের থামটার দেহে!

অনিমেষ দৃষ্টিতে সীমাদ্রি চেয়ে রয়েছে সেই থামটার দিকে, সে আজ কিছু ভাবতে চায় না। আজ কেবল সে থাকবে থামটার নিজস্ব ক্রমপরিবর্তনের অপেক্ষায়। প্রথমে তার মনে হ'ল যেন সেটার উপরে অনেকগুলি আলো আর আঁধারের রেণু ভেসে বেড়াচ্ছে অনিশ্চিতভাবে। তারপরে মনে হ'ল যেন সেই ভ্রাম্যমান রেণুগুলি আস্তে আস্তে স্থির হয়ে আসছে···তারা রূপ পরিগ্রহ করছে।

উচ্ছৃঙ্খল জ্যোৎস্না ঝ'রে পড়ছে আকাশ থেকে।

এমনি ভরা জ্যোৎস্নায় মানুষ নাকি পাগল হয়ে যায়। সীমাদ্রি পাগল হ'য়ে যাচ্ছে না তো? তার এই এক্সপেরিমেন্টটা একটা পাগলামি নয় তো? ঠিক ক'রে কিছু বুঝতে পারছে না সে। আর একবার চেয়ে দেখল মঞ্চটার দিকে সীমাদ্রি— মুহূর্তের জন্য। তার মনে হ'ল যেন সেটা রূপান্তরিত হয়ে গেছে একটা মানুষের মূর্তিতে—একটা খাকী রঙের ফুলপ্যান্ট পরেছে লোকটা। পাতলা কোমর থেকে উপরে উঠেছে ক্রমপ্রশস্ত বুকের দুই দিক ট্রাপেজিয়মের বাহুর মত। বাঁ চোখের উপর ফেল্ট্ হ্যাট্টা নুয়ে এসেছে, মুখটা ঠিক দেখা যাচ্ছে না। সীমাদ্রি আস্তে আস্তে এগোতে চেষ্টা করল সেই লোকটির দিকে। সে যেন চলেছে এক অশরীরীর সঙ্গে পরিচয় করতে। কিন্তু সেই লোকটি দাঁড়িয়ে থাকে অবিচলিতভাবে। কাছে—খুব কাছে এসে গেছে সীমাদ্রি, সীমাদ্রির নিঃশ্বাস বোধহয় লাগছে সেই লোকটির গায়ে, কিন্তু তার কোনো ভাবান্তর হয় না। চোখে অবিশ্বাস্য বিস্ময় নিয়ে সীমাদ্রি চেয়ে থাকে সেই লোকটির দিকে। আগে তাকে কোথায় দেখেছে দেখেছে

মনে হয় তার।···কিন্তু ভুলে যাচ্ছে সীমাদ্রি···ভুলে যাচ্ছে সে। খুব আস্তে, চাপা গলায় শুধায় সীমাদ্রি—তুমি কে? নিশ্বাসের মৃদু শব্দের মত কথাদুটো মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। চমকে উঠল সীমাদ্রি। একান্ত নির্জন পরিবেশের মধ্যে এই সামান্য দুটি কথাও বড় বেখাপ শোনাল কানে। কে কথা বলল? সে নিজে, না তার সামনে দাঁড়ানো এই অশরীরী যুবক—ঠিক কিছু বুঝতে পারে না সে। সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তার মাথার ভিতর।

সীমাদ্রির মেরুদণ্ড দিয়ে হঠাৎ যেন খেলে গেল একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ। তার মনে হ'ল সে যেন নিজেকে দেখতে পাচ্ছে একটা বিরাট আয়নার ভিতরে। তারই এই অপরিচিত তরুণ দেহ, এতক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে সে নিজে! হুঁ, ঠিক তো। নিঃসন্দেহ সীমাদ্রিই দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। কি এ কি সম্ভব? আজ পর্যন্ত তো সীমাদ্রি কেবল এরই তপস্যা ক'রে এসেছে। কত রাত্রিই না সে কল্পনা করেছে নিজেকে সে উজ্জীবিত করবে এই নির্বাক জড় প্রস্তরের দেহে। আজ হয়তো অকস্মাৎ এসেছে সেই চিরঈপ্সিত মুহূর্ত। যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে সীমাদ্রি। সে আর কিছু ভাবতে পারছে না। ক্রমে ক্রমে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব নির্জীব হয়ে আসছে। পক্ষাঘাত বোধহয় ঠিক এমনিভাবে আরম্ভ হয়। অতি অসহায়ভাবে সে তিলে তিলে প্রস্তরিত হয়ে যাচ্ছে···সে চলৎশক্তিরহিত।

সীমাদ্রির প্রস্তর সমাধি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তার চোখের পাতাও নড়ানো আর সম্ভব নয়। এবার কিন্তু চলতে আরম্ভ করেছে সেই অন্য লোকটি, সীমাদ্রির দ্বিতীয় সংস্করণ। সে যেন শুধু অপেক্ষা ক'রে ছিল সীমাদ্রির এই অবস্থান্তরের। কিন্তু সীমাদ্রির মস্তিষ্ক কাজ করছে ঠিক, সে ঠিক জানতে পারছে যে লোকটি যাবে গার্ল'স্ হস্টেলের কাছে। এটা সীমাদ্রির নিজস্ব ভাবনা নয়। সেই লোকটির প্রতিটি চিন্তা যেন কোন অজ্ঞাত শক্তির বলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে সীমাদ্রির মনে। সীমাদ্রি কিছু অনুমান করার চেষ্টা করছে না একেবারেই; তবু সে জানতে পারছে তার মনের প্রত্যেকটি ভাবনা।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সীমাদ্রি চাঁদের আলোয়···সেই লোকটি গার্ল'স্ হস্টেলের পাইপ ধ'রে উঠছে উপরে। খুব পরিশ্রম করতে হচ্ছে তাকে নিশ্চয়···সীমাদ্রির প্রস্তরিত পায়ের মাংসপেশী সব ফেটে পড়ছে সেই লোকটির ওঠবার চেষ্টায়। তারপর সেই লোকটি চলেছে একটী সঙ্কীর্ণ প্রাচীরের উপর দিয়ে কোনোমতে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করে—আর ঠিক সেই স্পন্দন অনুভব করছে সীমাদ্রি—সেও টলছে, কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে। এক অনিবার্য দোলনে দোলায়িত হচ্ছে সীমাদ্রি। তারপর লোকটি উঠছে সন্তর্পণে একটা অপ্রশস্ত কার্নিসের উপরে, দেওয়ালে পিঠ ঘষে ঘষে চলেছে লোকটি···সে নিশ্চয় যাচ্ছে রীতার রুমের জানলার কাছে—কিন্তু তাকে আরো অনেক দূর যেতে হবে সেই সঙ্কীর্ণ পথ বেয়ে। সীমাদ্রির পায়ের তলা থেকে যেন খানিকটা মাটি স'রে গেল হঠাৎ, একটা অপ্রশস্ত মাটির আল রয়েছে কেবল তার পায়ের তলায়। সীমাদ্রির ভারসাম্যও আন্দোলিত হতে

শুরু করেছে। উঃ, কি আশ্চর্যভাবে ঐ লোকটির প্রতিটি বিষয় সীমাদ্রিকে প্রভাবিত ক'রে চলেছে।

না—সীমাদ্রির পক্ষে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয় বোধ হয়। সে প্রায় প'ড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেল একবার ; কিন্তু এই কয়েকটি মুহূর্ত অতি অনিশ্চিত—কিছু বলা যায় না। হঠাৎ শূন্যে ঝুঁকে পড়ল সীমাদ্রি—এবার আর কিছু প্রতিবন্ধক নেই, সামনের শূণ্যতার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে সীমাদ্রি একখানা শুকনো কাঠের গুঁড়ির মত। ঠিক তার পরেই সীমাদ্রির সংবিৎ লোপ পেয়ে গেছে···

চার

গার্ল'স্ হস্টেলের মাঠে অনেক লোকের ভিড় জমেছে। সীমাদ্রি ছাদের উপর থেকে প'ড়ে গেছে অসাবধান হয়ে, সরোজও এসেছে সেখানে। সীমাদ্রির মাথার খুলিটা থেঁতলে গিয়ে মুখটা কেমন বিকৃত দেখাচ্ছে। তার পরনের কাপড় বাদ দিলে তাকে সীমাদ্রি ব'লে চেনা সম্ভব নয়।

পুলিস অনুসন্ধান করছে। সরোজ এ দুর্ঘটনার উপরে কোনো আলোকপাত করতে পারেনি। শহরের সমস্ত জনসাধারণ অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে রায় দিয়েছে যে সীমাদ্রি কোনও প্রেমঘটিত ব্যাপারে জড়িত হয়ে হয়তো দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে অথবা আত্মহত্যা করেছে।

সরোজ কেবল তার দুই হাত বক্ষোবদ্ধ ক'রে চিন্তিতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে লক্ষ্যহীন-ভাবে। কিছু কূল কিনারা পায় না সে। ঘুরতে ঘুরতে খালের ধারে আসে সরোজ আর সেখানে দেখে—

সেই জীর্ণ তুলসী মঞ্চটিও ভেঙ্গে পড়েছে গোড়া থেকে, পড়ার দাপটে কয়খানা ইঁট ছিটকে পড়েছে দূরে।

সরোজ বিস্মিত হয়েছে—কাল রাতে ঝড় বা বৃষ্টির কোনও চিহ্ন নেই—তবে ভাঙ্গল কী ক'রে! হয়তো সীমাদ্রি শেষ পর্যন্ত এই পাথরের থামটার আত্মার মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছিল।

পাঁচ

দশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে।

সরোজ তার স্ত্রীকে নিয়ে গাড়ীতে যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে। খাল-পারের সেই বিশেষ জায়গাটির কাছে এসে সরোজ গাড়ী দাঁড় করায়। গাড়ীতে তার স্ত্রীকে অপেক্ষা করতে ব'লে সরোজ নেমে পড়ে। গিয়ে ওঠে খালের বাঁধের উপরে। দশ বছর পরে সে বোধ হয় তার বন্ধু সীমাদ্রিকে স্মরণ করতে চায় সেই পুরানো পরিবেশের ভিতরে।

আজও সেখানকার সেই বালি রূপো হয়ে গেছে জ্যোৎস্নার আলোয়। আজও সেইসব গাছ তেমনি দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যেকে এক একটি মূর্তিমান রহস্যের মত।

দূরে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কে একজন ভদ্রলোক মাথা নীচু ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেখানে। এই চিরনির্জন খালের ধারে তিনি বোধহয় একজন শহরের কোলাহল-নিপীড়িত শরণার্থী। দূর থেকে সরোজের আসার আভাস পেয়ে ভদ্রলোক যেন হঠাৎ নিশ্চল হয়ে গেলেন এক মুহূর্তের জন্য আর যেন ভয় পেয়েছেন এমনিভাবে ব'সে পড়লেন বালির উপর।

সরোজ গেল বালির উপরে। কয় পা এগিয়ে সে দেখে ভদ্রলোক যেখানে বসেছিলেন সেখানে কোনো মানুষের নামগন্ধও নেই। সেখানে তেমনি নির্বাক্ হয়ে প'ড়ে আছে সেই ভাঙ্গা তুলসী-মঞ্চটা। কালের অত্যাচারে তার উপর শেওলা জমে গেছে, ইঁটের ফাটলে ঘাস গজিয়েছে প্রচুর।

অভিভূত হয়ে কয় মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সরোজ। মনে মনে উচ্চারণ করল সে—সেই দিন থেকে এইখানে তুই শুয়ে আছিস্, সীমাদ্রি···কত রাত না আমরা এইখানে শুয়ে কল্পনা করেছি আমাদের বিয়ের কথা—আমি বিয়ে করেছি—আয়, দেখবি আয় আমার বউকে...কেমন ক'রে দেখাই তোকে...

সরোজের চোখে জল টলমল করছিল।

সরোজ ফিরে এল গাড়ীর কাছে।

সরোজের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল—কে ঐ ভদ্রলোক এত রাতে ঘুরছিলেন এখানে?

সরোজ রুমালে তার চোখদুটো মুছে ফেলতে ফেলতে বলল—বাড়ী চল, বলব।

মহাপাত্র নীলমণি সাহু (1926—)

কটক জেলার নিআলি গ্রামে নীলমণির জন্ম। একাধারে তিনি কবি, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। ওড়িশার শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক। ওড়িশার সাহিত্য মাসিক 'ঝঙ্কার' সম্পাদনায় যুক্ত ছিলেন দীর্ঘকাল। নীলমণি সৎ-সাহিত্য রচনায় তাঁর নিপূণতা প্রকাশ করেছেন। তাঁর লেখায় বিষয়বস্তুর ক্রম সাহিত্যগুণসম্পন্ন সৃষ্টিধর্মী রচনায় রূপ গ্রহণ করেছে। তাঁর কয়েকটি, গল্পসংগ্রহ: 'প্রেম ও ত্রিভুজ', 'মিছ বাঘ', উপন্যাস: 'ধরা ও ধারা', 'তামসী রাধা'।

সুমিত্রার হাসি

আংটিটা হাতে নিয়ে সুমিত্রা হাসল। হাসবে না? নয়তো কি কাঁদবে? সে যোগ্যতা কি তার আছে? অনেক মেয়েকে কাঁদলে ভারী চমৎকার মানায়। কারো কারো মুখে আবার মানায় না মোটে। গোঁসাঘরের ভিতরে দোরে খিল দিয়ে ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদত তারা সেকালে। কাঁদলে তাদের চোখ থেকে মুক্তো ঝরত। মুখের লাবণ্য চোখের জলে ধুয়ে দুটি আধবোঁজা লাজুক নীল পদ্মের মত চোখের ভিতর থেকে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে মধু ঝরত। সকালবেলাকার সদ্যফোটা গোলাপ ফুলের পাপড়ি যেমন হাল্কা হাওয়ায় ফুলে ফুলে ওঠে—তেমনি নরম ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে উঠত। উদাস মনে মাটির পানে চেয়ে নখে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে—কিংবা কণ্ঠাস্তম্ভের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে আনমনা হয়ে উপরে ছাদের কিনারায় পারাবত দম্পতির চঞ্চু চুম্বনলীলাবিলাস দেখতে দেখতে অথবা সুবর্ণ-পিঞ্জরে শুক-পক্ষীর ঠোঁটে আদর-সোহাগে কাঁপা চাঁপার কলির মত আঙ্গুল দুটিতে আহার দিতে দিতে—কিংবা বাতায়নদণ্ড ধ'রে বহুদূরে হারিয়ে যাওয়া কার চলা-পথের দিকে চেয়ে চেয়ে, কিংবা উপরে চন্দ্রশালায় দাঁড়িয়ে আষাঢ় গগনে কোন এক অজানা ঘরছাড়া তরুণ সন্ন্যাসীর ঘনকৃষ্ণ জটার মত কুণ্ডলী পাকানো মেঘ আর সেই সন্ন্যাসীর জটা থেকে খসে পড়া সাদা ফুলের মালার মত সার বেঁধে উড়ে-চলা বলাকার দিকে চেয়ে চেয়ে রাজকন্যারা কাঁদতেন। ছবির পটে কত এমনি দৃশ্য দেখেছে সে। ভারী চমৎকার মানায় তাদের এমনি কান্না। কাঁদত তারা সেকালে।

একালেও তো কাঁদে ওরা—রেণু, ঊষা, মাধবিকা আর বিনোদিনীরা। চীফ্

ইঞ্জিনীয়ারের মেয়ে রেণু—জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কন্যা উষা—বড় ডাক্তারের দুলালী বিনোদিনী—আর কনট্রাক্টার তনয়া মাধবিকা। হায়! তারা কে কোথায় এখন। সেদিনের ম্যাজিস্ট্রেট-কন্যা আজ ডাক্তারের সহধর্মিনী। সেদিনের কনট্রাক্টার-নন্দিনী আজ ইঞ্জিনীয়ারের হৃদয়েশ্বরী। তখন তারা কাঁদত, অশ্রু জমত সোনার থালায়। ওরা আজও কাঁদছে—চোখের জল ঝরছে রত্ন-থালায়। ওরা ধন্য।

কিন্তু তাই বলে সুমিত্রা কাঁদবে নাকি? কোথায় বা কাঁদবে? কাঁদার এখানে জায়গা কই? এই সেক্রেটারিয়েটে বসে কি কাঁদা যায়? টাইপ-রাইটারের উপর কি চোখের জল ফেলবার কথা? ঐ ওখানে বহুদূরে যে নদীটা এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে—আর ঠিক তার ধারে সেই যে ভাঙ্গা মন্দিরটা আছে—সেই মন্দিরের কাটা পাথরটার উপরে সন্ধ্যাবেলা যদি নিশ্চিন্ত হয়ে বসা যেত তবে চমৎকার কাঁদা যেত। নয়তো এই অল্পদূরে সেই যে পার্কটা—আর তার সবশেষের কোণে আলো-আঁধারের মধ্যে মধুমালতীর কুঞ্জের নীচে যে সিমেন্টের বেঞ্চটা রয়েছে—সেখানেও যদি নির্ভয়ে একলা বসতে পারা যেত, তবে কী আরামেই না কাঁদা যেত! কিংবা নিদেন পক্ষে যদি নির্জন একলা ঘর একটা থাকত তবে সেই ঘরে কবাট দিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে নাক ফোঁস ফোঁস করতে করতে কেঁদে রীতিমত এক পসলা চোখের জল ঢেলে বালিশ ভিজিয়ে দেওয়া যেতে পারত। আর পরে সেই ভিজে বালিশটা দেখে তৃপ্তিতে মনটা ভরে উঠত। নিজের ওজনের উপর প্রত্যয় কত বেড়ে যেত। আর তার সঙ্গে কত হাল্কা লাগত নিজেকে! আর এখানে? এই সেক্রেটারিয়েটের ভিতরে টাইপ-রাইটারের পাশে জোড়া জোড়া হাঁ করা চোখের সামনে বসে কি কাঁদার কথাও ভাবা যায়?

বরং হাসাই উচিত। সবাই এখানে হাসতে চায়। হাসি দেখতেও চায়।

বিকাল পাঁচটা বেজেছে। খিদেও পেয়েছে। মাথাটা ব্যথা করছে। ফাইলের গাদার ভিতর থেকে উঠে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালে হয়। অবশ্য বাড়ী মানে তো মেস্। তিন চারটে মেয়ে মিলে একটা মেস্ করেছে। মেসে কি কবাটে খিল দিয়ে নিশ্চিন্তে নিরিবিলিতে কাঁদার উপায় আছে? সেখানে কে কাঁদে বল তো? গিরিবালা বাসন্তী ভারতী আর হর্ষমণি সব কটা হাসকুটে, খুড়ীর মত দিনরাত হিঁ হিঁ করছেই। মেস্ না চুলো!

তবু সেখানেই যেতে হবে। খিদে পেয়ে গেছে, মাথা ব্যথা করছে।

ছাতাটি নিয়ে সুমিত্রা বেরুল। সিঁড়ি দিয়ে তরতরিয়ে নেমে পেটিকোয় আসতেই হঠাৎ তার কাছে ক্যাঁচ ক'রে মোটরের ব্রেক কষার শব্দ। সুমিত্রা চমকে উঠে বাঁ দিকে সরে গেল। উপরওয়ালা সাহেব কেউ, কিংবা···কিন্তু সে চমকে উঠল—গাড়ীর ভিতর থেকে পাঁচ বছর আগেকার একটি পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে :

—কীরে, সুমিত্রা যে!

সুমিত্রা চেয়ে দেখল, রেণু বসে গাড়ীর ভিতর। নিজেই ধরেছে স্টিয়ারিং। বাঁ পাশে দুটি ফরসা ফারসা মোটাসোটা চনমনে বাচ্চা। একটি ছেলে, একটি মেয়ে।

রেণু আগের তুলনায় অনেক মোটা হয়ে গেছে, কিন্তু এটুকু মাংস না থাকলে এত বড় গাড়ীটাতেও মানাবে না। প্রসাধনের যথেষ্ট কৃত্রিমতার মধ্যেও রেণুর স্বভাবসুন্দর লাবণ্য আগের চেয়ে বরং আরো উজ্জ্বল হয়েছে।

সুমিত্রা নমস্কার ক'রে গাড়ীর দরজায় হাত রেখে দাঁড়াল। রেণু তেমনি ব'সে আছে গাড়ীর ভিতরে স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে। বাচ্চা দুটিও ব'সে আছে খুব স্থির আর গম্ভীরভাবে। রেণু একটু হেসে বলল,

—তারপর? তুই? তুই বোধহয় এখানে······

—এল ডি অ্যাসিস্ট্যান্ট—রেণুর বাক্যটি শেষ করল সুমিত্রা—তুমি এদিকে কোথায়, রেণুদি?

—আর কোথায়? তোদের সব কাজ শেষ হয়েছে, কিন্তু তোদের সাহেবদের আর বাড়ীর কথা মনে পড়ে না। আজ একটা জায়গায় যাবার কথা ছিল, অথচ ভদ্রলোকের সে কথা খেয়ালই নেই। তিনবার ফোন করলাম······এই যাচ্ছি—হ্যাভ্ পেশেন্স—ডোন্ট ডিস্টার্ব······শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে নিজেই শেষে এলাম······ইস্, দেশটাকে সত্যি যেন এঁরাই মাথায় ক'রে সামলাচ্ছেন!

সুমিত্রা সব বুঝল, কিন্তু বুঝতে পারল না কোন সাহেবের কান ধ'রে আপিস থেকে টেনে নিয়ে যেতে রাগে লাল হয়ে গর গর করতে করতে ছুটে এসেছে এই মিসেস্ রেণু······কে হতে পারে—প্রধান—শতপথী—না মহাপাত্র—না চৌধুরী—না সেনাপতি?

—কোন সাহেবের কথা বলছ রেণুদি? সাহেবরা তো কখন তাঁদের কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন।

—এই তোদের সেনাপতি সাহেব। তোর কোন ডিপার্টমেন্ট, সুমিত্রা? সেনাপতি সাহেবকে চিনিস্ না?

সেনাপতি সাহেব! সুমিত্রা চমকে উঠল। ওদের ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারি মিঃ অমরেশ সেনাপতি, আই-এ-এস। ও মাগো! মানুষ তো নয় সে, বাঘ। হিয়া লম্বা, তেমনি চওড়া, দশাসই মানুষ যাকে বলে—এত বড় মুখ—জ্বল-জ্বলে চোখ—বাঘের হুংকার দেওয়ার মত হালুম হালুম করে কথা—কাছে দাঁড়ালে মুখ থেকে কথা বেরোয় না। গা কাঁপে—চোখ বুঁজে আসে। কে যাবে ঐ বাঘের সামনে, মাগো! সেই বাঘের নাকে দড়ি দিয়ে কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাবে বলে এসেছে রেণু—মিসেস্ রেণু সেনাপতি! তারই ছেলেবেলার কলেজ পড়ুয়া বন্ধু সেদিনের রেণুদি। নরম লতপতে লজ্জাবতী লতা, সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি-এ পড়ত। একটু কথায় কেঁদে ফেলে। ভারী ছিঁচকাদুনী (কাঁদলে কিন্তু ভারী সুন্দর মানায় ওকে)—মুখোমুখি কারো সামনে দাঁড়াতে পারে না। কারো বকুনি সইতে পারে না। সেই রেণুদি—কোত্থেকে এল তার জোর? এত দেমাক? এত তেজ? এসেছে সেনাপতি সাহেবের নাকে দড়ি দিয়ে কান ধ'রে নিয়ে যেতে অফিস্ থেকে······

সুমিত্রার ঠোঁটের শুকনো হাসিটুকু ঝরে পড়ে উড়ে গেল।

—সেই ডিপার্টমেন্টেই, রেণুদি। চারটে বাঘে একুশটা ছাগল। বাঘ-ছাগল খেলা তো দেখেছ, বাঘকে খুঁটিয়ে চেনা সহজ নয় আমাদের পক্ষে—দরকারও নেই, গন্ধেই বোঝা যায়, হুঙ্কার শুনে বোঝা যায়, সব বাঘ সমান—তুমি না হয় বাঘ খেলাচ্ছ—

সুমিত্রার কথা শুনে রেণু হাসতে হাসতে কেশে উঠল।

—যাঃ ফাজিল! যাই হোক সুমী, তোরা খুব ফরচুনেট। আমি তো দেখছি—পাঁচ বছর আগে তুই যেমন ছিলি আজও অবিকল তেমনি আছিস্। তেমনি হাসছিস্ আর হাসাতে পারছিস্। বেশ স্বাধীন আর নিশ্চিন্ত জীবন— কিন্তু দ্যাখ তো আমাদের অবস্থা।

সুমিত্রার রক্তহীন চোখে কৌতুক ঝলমল ক'রে উঠল।

—তুমি কাঁদ আজকাল, রেণুদি?

—কাঁদার বাড়া, সুমিত্রা। এমন এক একটি বাঘ নিয়ে ঘর করলে জীবন কেমন কাটে জানিস্ না তো!

সুমিত্রা সত্যি সত্যিই হাসল।

—বাড়ী গেলে বাঘ পোষ মেনে থাকে, না রেণুদি?

—বাঘ কোনোদিন পোষ মানে রে, বোকা মেয়ে?

সুমিত্রা কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রেণুর বাচ্চারা চেঁচিয়ে উঠল—ও ড্যাডি—ড্যাডি—

বড়টি খুব গম্ভীর হয়ে ব'সেছিল, এখন সেও গাড়ীর মধ্যে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠল:

—ড্যাডি ইজ্ এ নটি বয়্!—ড্যাডি ইজ্ টু-উ লেট্!

অবস্থা বুঝে সুমিত্রা বিদায় নিয়ে চ'লে আসছিল, কিন্তু রেণু বলল—

—দাঁড়া সুমিত্রা, পালাস্ কেন? দাঁড়া, তোকে ইনট্রোডিউস্ ক'রে দেব ওঁর সঙ্গে। আমার গাড়ীতে তোকে পৌঁছেও দিয়ে আসব তোর বাসায়···দাঁড়ান।···

—না না, রেণুদি, অশেষ ধন্যবাদ—আমি যাই···

সুমিত্রা নমস্কার জানিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চ'লে এল। বাঘ আসছে—বাঘ। ও মাগো! রেণুর হাতে আছে বিজলী-চাবুক। খাঁচা খুলে দেবে—বাঘ গিয়ে ঢুকবে খাঁচার ভিতর হালুম হালুম করতে করতে ··ও মাগো!

ধন্য রেণু···!!

রেণুকে ঈর্ষা করার কথা, কিন্তু সুমিত্রার মন বরং তার প্রতি প্রশংসায় ভ'রে উঠছে। খুব ভাগ্যবতী মেয়ে রেণু। বাবা রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট—বি-এ পাস করতে না করতে আই-এ-এস্ বর। পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে দুটি চমৎকার ছেলেমেয়ে।···কত গম্ভীর হয়ে বসে ছিল, অথচ যেই বাবাকে দেখা অমনি কী চঞ্চল হয়ে উঠল—ড্যাডি ইজ্ এ নটি বয়!

হি-হি-হি-

সুমিত্রা মনে মনে হেসে উঠল।

ভগবান ওর মঙ্গল করুন। ভালো মেয়ে রেণু। বরাবরই ভালো। আজ তো আবার দেখে চিনতে পারল। হোক না একটু দেমাকী। রেণু কাঁদলে বেশ মানায় ওকে। কেঁদে কেঁদেই বোধহয় ও সেনাপতি সাহেবকে নাচাচ্ছে। কাঁদতে জানলে বাঘও নাচবে, রেণু ভালো···

ভগবান ওর মঙ্গল করুন! হে প্রভু, তোমার জগতে সব মেয়েই বি-এ পাস ক'রে আইবুড়ো হয়ে বসে নেই। সেক্রেটারিয়েটে এল্ ডি অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে মেসে রেঁধে খাচ্ছে না। মেস—!

ইস্—মেসের কথা মনে পড়লেই মাথাটা আরো বেথিয়ে ওঠে। খালি হা-হা হি-হি, ভারী বিচ্ছিরি ওগুলো। ঐ যে ভারতী ছুঁড়িটা—বড় লঘু স্বভাবের মেয়ে ওটা একটা, কোনো কিছুর গুরুত্ব দিতে শেখেনি। সব সময় ঐ এক হিঁ-হিঁ করতে থাকবে। কম অসভ্যও নয়। অফিস থেকে ফিরল তো অমনি সব অফিসারদের ক্যারিকেচার করা শুরু হয়ে গেল। কী লাভ হয় তাতে ওর কে জানে। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি প্রফুল্ল বাবুকে সে কেন এত ঠাট্টা করে?

ভারী ফাজিল মেয়েটা। হ্যাঁ—প্রফুল্লবাবু নাকি ওকে একটু বেশী ডাকেন।

আজ পর্যন্ত প্রফুল্ল বাবু বিয়ে করেন নি।

দেখতেও প্রফুল্ল বাবু সুন্দর।

হাসেন কী সুন্দর।

অথচ হাসিতে আড়ম্বর নেই।

কিন্তু কেমন একটু মেয়েলী!

ভারী আস্তে কথা বলেন।

যেন কী ভাবছেন······

চোখ দুটি বড় উদাস দেখায়—

তাকাবেন এমন ক'রে—যেন তিনি তোমার অনুগ্রহের অপেক্ষায় রয়েছেন।

কোনো গড়জাতের রাজার ছোট ভাই নাকি।

তা সেসব যাই হোক তুই একটা ফাজিলের মত তাঁর অসাক্ষাতে সকলের সামনে তাঁর ক্যারিকেচার করবি?

প্রেম করতে হয় তো প্রেম কর।

কে তোকে মানা করেছে?

যে প্রেম করে সে কি তার প্রেমিকের কথা নিয়ে অন্যদের সামনে এমনি খূড়ীর মত হিঁ হিঁ করে হাসে?

প্রেম করছিস্ তো কাঁদ। দেখবি তোর চোখের জলে অভিষেকের জন্য রাজপুত্র ছুটে আসবে হাতীতে চ'ড়ে—ঘোড়ায় চ'ড়ে।

প্রফুল্ল বাবু নাকি নতুন একটা মোটর কিনেছেন। ভারতী সে মোটরে দু'তিন বার চড়েছে।

ভালো কথা।

কিন্তু তুই এমনি একটা খুড়ীর মত হিঁ হিঁ কেন করিস্ ?

একটু সিরিয়াস হ।

কাঁদতে পারিস্ না ?

সুমিত্রা এসে চৌমাথার মোড়ে পৌঁছে গেছে। ঠিক বাঁ দিকে পার্কটা। আর একটু সোজা এগিয়ে গেলে ঐ ওদিকে ওদের মেস্।

মেস্ না চুলো !

পার্কে আলো জ্বলছে। নীল আলো। ইস্, কীরকম নীল। সামনের অশোক গাছটায় ভরতি লাল ফুল। অশোক—সুন্দর নামটি। অশোকমরবিন্দঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা। এই চারটির সঙ্গে নীলোৎপল নিয়ে কন্দর্পের পাঁচটি বাণ। ওড়িয়া অনার্স ক্লাসে 'লাবণ্যবতী' কাব্য পড়বার সময় মুখস্থ করেছিল এই শ্লোকটি—"উন্মাদং অরবিন্দে স্যাৎ রসালো খেদদায়কঃ। দাহো নীলোৎপলে চাপি অশোক নবমালিকা। উচ্চাটমশোকে স্যাৎ ইত্যনঙ্গশরাঃ গুণাঃ।"

সত্যি ফুলে ভরা অশোক গাছ দেখলে মনটা কেমন উচাটন লাগে। এত লাল, মনে আগুন লাগিয়ে দেয় যেন। আর সেই আগুন লাগা চুলো জ্বালানো মনটার জন্য শেষে কাঁদতে ইচ্ছে হয়। নামটি নাহয় অশোক, কিন্তু তার নীচে বসলে—এক এক সময়ে মনে হয় কাঁদি। ইস্—এত লাল! এত আগুন! এত দহন! এত উচাটন!

এই অশোকবনে রাবণ নিয়ে গিয়ে রেখেছিল সীতাকে। ভেবেছিল সীতার মনে আগুন ধরিয়ে দেবে এই অশোক। কিন্তু কী হল? আগুন লাগল লঙ্কায়। অশোক বনটা সীতার চোখের জলে ভেসে গেল।

অবশ্য সীতার পক্ষে বেশ ছিল বনটা। অশোক বনে না থেকে তিনি যদি একটা মেসে থাকতেন ভাল ক'রে কাঁদতে পারতেন? আর যদি সেই মেসে এই ভারতীর মত মেয়ে একটা থাকত?

ভারী ফাজিল মেয়েটা!

এইরকম মেয়েরাই তো প্রেম করে।

বেহায়া!

বড় হালকা…

টের পাবে একদিন মজাটা…

প্রফুল্ল রায়ের বয়ে গিয়েছিল এমনি এক ফরফরীকে…প্রেম কি এত সোজা কথা?

বড় কঠিন সে প্রীতি-পালন…

ভারতী ভাল ক'রে মজা বুঝবে একদিন!

চুলোয় যাক ভারতী!!

অশোক গাছটার এদিকে ফুলে ফরা কৃষ্ণচূড়া গাছ। তাতেও আগুন লেগেছে এখানে ফাল্গুন ফাগ দিয়ে হোলি খেলছে না, খেলছে আগুন দিয়ে। পার্কের নীল

আলো নীচে ছড়িয়ে পড়েছে। সুন্দর বাতাস বইছে। এই বাতাসটাও কেমন যেন মাতিয়ে দেয়। যাবে নাকি সে একটু পার্কের ভিতরে? দু'দণ্ড ব'সে গেলে হয়। খিদে অবশ্য পেয়েছে। মাথাটাও ব্যথা করছে। মেসে গেলে অবশ্য খেতে পাওয়া যাবে, কিন্তু মাথা ব্যথা করবে আরো।

সেখানে আর তিন চারটে মেয়ের সামনে ভারতী হয়তো ক্যারিকেচার করছে প্রফুল্ল রায়ের। অন্যেরা হিঁ হিঁ করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

ছি—

মেস্ না চুলো!

তার চেয়ে বরং…

সুমিত্রা পার্কের ভিতর ঢুকল। অশোক গাছের তলায় গোল ক'রে বাঁধানো সিমেন্টের চাতাল। পার্কের নীল আলো পড়েছে সেখানে। সেখানে কেউ নেই। একটু কোণের দিকে জায়গাটা। আর সবদিকে হৈ চৈ করছে মানুষ। জোড়া জোড়া প্রজাপতির মত উড়ছে ছেলেরা আর মেয়েরা। ঐ ওখানে জলের ট্যাঙ্কের কাছে ব্যাঙের উপর ঢিল ছুঁড়ছে কয়েকটা ছোট ছোট ছেলে। মজা লাগছে তাদের। ঐ কয়টা বকাটে ছোকরা খালি টহল মারছে। কত ঢঙের রঙচঙে হাওয়াই—খালি হাওয়াতেই ভাসছে। আর এই ছুঁড়িগুলোও হয়েছে তেমনি। ঐ ওদিকে সব লাল হলদে নীল আঁচল উড়িয়ে তারাই কি কিছু কম?

হাওয়ায় উড়ে যায়—লাল আঁচল আমার—ফরফর ফরফর আঁচল আমার··

ওরা হাওয়ায় চিৎ-সাঁতার দিচ্ছে। হাসছে—নাচছে—মাতছে—

আচ্ছা, ঐ ছোকরার দল কী আরম্ভ করেছে ওখানে? হঠাৎ লংজাম্প খেলা শুরু হয়ে গেল কেন?

যত সব বকাটে—!

কিন্তু ঐ যে ছেলেটি ওখানে—সাদা ফুল-শার্ট আর সাদা ফুল প্যাণ্ট পরে দুই পা ফাঁক ক'রে বুকের উপর দু'হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে—মাথায় খুব ছোট ছোট চুল—লম্বা আর সটান চেহারা—একটু গম্ভীর—ওকে সে দেখছে অনেকবার—বোধহয় কলেজে উঁচু ক্লাসে পড়ে। ভারী ভাল ছেলেটি মনে হয়। স্মার্ট দেখতে, কিন্তু এদের মত চ্যাংড়া নয় মোটেই। মিশছে বটে এদের সঙ্গে, নইলে ও বোধহয় আলাদা ধরণের—সব দেখে—সব শোনে—কিন্তু······ভালো ছেলেটি······হয়তো কবিতা লেখে—কিংবা গল্প······

আর ঐ বেঁটে হোঁতকা মত ছেলেটা—ওঃ, প্যাণ্টের উপর সিল্কের একটা জার্কিন চড়িয়েছেন! খুব শক্ত-মক্তও আছে। আছে আছে—আবার হঠাৎ এক একবার তার মাথায় কী ঢুকছে বোঁ ক'রে, এক চক্কর কেটে সবাইকার পিছন দিয়ে দিয়ে বিদ্যুতের মত একবার ঘুরে এসে আবার বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ড্রিল করার ভঙ্গীতে। কেন এমনি দুরন্তপনা করছে ও? ভারী এনার্জি আছে কিন্তু ছেলেটার। হাত পা তার স্থির থাকতে চায় না। ভারী দুষ্টু ও। এমনি ছেলেরাই তো

মেয়েদের সীটের পায়ার নীচে চটপটি রেখে দেয়। সিনেমায় পিছন থেকে বিনুনি কেটে নেয়—কখনো বা আঁচলে সিগারেট লাগিয়ে ফুটো ক'রে দেয়। আবার কখনো আর কিছু করতে না পেরে ভিড়ের মধ্যে মেয়েদের হাতে হয়তো একটু আলপিনই ফুটিয়ে দিল।

ঐটুকুই। তার বেশী আর এগোয় না ওরা। খালি মজাই করে। ভারী দুষ্টু ছেলে ও। এমনি একটা ছেলে সিগারেট দিয়ে শাড়ীতে ফুটো ক'রে দিলে কিংবা আড়াল থেকে হাতে ছুঁচ ফুটিয়ে দিলে রাগ হয় সত্যি—কিন্তু যদি নিজের ছোট ভাই হয় তবে তার সঙ্গে ঝগড়া করতে খুব ভাল লাগবে নিশ্চয়।

নাঃ—ওরা এই দিকে তাকাচ্ছে সবাই। ঐ, সবাই এই দিকে মুখ করেছে, ওদের কৌতূহল বেড়েছে। ওকে দেখে বোধহয় সবাই ভাবছে এই অশোক তরুতলে কে এই বিরহিণী তরুণী বাসকসজ্জা করে অপেক্ষা করছে কোন স্বপনপুরীর রাজকুমারের—

ওরা কী ফিসফাস করতে আরম্ভ করেছে…

কে একজন ইশারা ক'রে কী বলছে যেন!

ঐ যে সেই সাদা ফুল-প্যাণ্ট আর ফুল-শার্ট পরা টান টান চেহারার লম্বা ছেলেটি—মাথায় যার ছোট ছোট চুল—ভেড়ার লোমের মত—সে কেমন একটা সবজান্তা ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছে। আর সেই নীল জার্কিনের সঙ্গে হাফ প্যাণ্ট পরা দুষ্টু হোঁতকামত ছেলেটা যেন খাপ পেতে কাউকে ধরবার ভঙ্গীতে নুয়ে পড়েছে। দু'হাত ছড়িয়ে হাতের তেলো দু'টো নাড়ছে উপর নিচে—এই অশোকগাছের নিচে কোনো কল্পিত যুবকের ছায়াটি পড়লেই যেন সে হাততালি দিয়ে বিকট গলা খাঁকরানি দিতে শুরু করবে।

না—এবার এদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকানো উচিত।

সুমিত্রা ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চাইল। ধেৎ—একটু একলা নিশ্চিন্তে বসে আমার জীবনের এত বড় ট্র্যাজেডিটাকে গভীরভাবে অনুভব ক'রে কাঁদতে আমায় দেবে না এরা।

কী বিরাট এই পৃথিবী, অথচ সুমিত্রার জন্য এতটুকু জায়গা কোথাও নেই যেখানে বসে সে নিরিবিলিতে একটু কাঁদতে পারে। অথচ কাঁদার মতো কত বড় দামী ঘটনাই না তার রয়েছে একটা।

সুমিত্রা আঙ্গুল থেকে সেই আংটিটা খুলে হাতে নিল। খুব ছোট সরু রুইতন শেপের চকচকে সোনার আংটিটি। তার গায়ে নীল রঙের মিনার কাজের উপর একটি লাল পদ্ম। আর ঠিক তার নীচে ছোট দুটি অক্ষর—

'সুখী'

এই আংটিটা আজ সেক্রেটারিয়েটে এসে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন শরৎভাই।

শরৎ পট্টনায়ক। তার অনেক দূরসম্পর্কীয় মাসতুত ভাই। তখন সুমিত্রা মেস্ করে থাকত না। এই মেসের বাড়ীটাই ছিল তার নিজের কোয়ার্টার্স্। ছোট

'টাইপ ফোর' কোয়ার্টার্স্। সামনে ছোট একটি ফুলের বাগান। আর ঘরের ভিতর একটি জনতা স্টোভ।

সুমিত্রার চ'লে যাচ্ছিল একরকম। তার আর কে আছে সংসারে? বাবা তো তার ছেলেবেলায় মারা গেছেন। বাকী ছিলেন মা আর বড় ভাই। মামার বাড়ীতে থেকেই মানুষ হয়েছিল সে আর তার বড় ভাই, মামা তখন ছিলেন কালেক্টোরেটের একজন সামান্য মুহুরী। পড়াশোনা শেষ ক'রে ভাই মৎস্য বিভাগে চাকরি করতে লাগলেন। তারপর সরকারী বৃত্তি পেয়ে তিনি গেলেন জাপানে, সামুদ্রিক-মৎস্যচাষ সম্বন্ধে গবেষণা করতে। এক বছর পরে ফিরে আসার কথা, কিন্তু তিনি আর ফিরলেন না।

সমুদ্রে একটি ছোট নৌকায় সামুদ্রিক মাছের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে নৌকাটি ডুবে যায় অতল সাগরগর্ভে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সব আশা ভরসাও।

একমাত্র ছেলের এই শোচনীয় মৃত্যুর খবর শোনার পর মা-ও আর বেশীদিন বাঁচেন নি। সমস্ত দুর্দশা দুর্ভোগ সইতে পারার জন্যই সে কেবল বেঁচে থেকে বি-এ পাস করল। তার বিয়ে দিতে মামা অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা কি এত সহজ?

বি-এ পাস করে সুমিত্রা চাকরিতে ঢুকল। আর কী-ই বা করত সে? চলেও যাচ্ছিল বেশ। প্রথমটা তো বেশ ভালই লাগছিল। নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল সে। স্বাধীন স্বতন্ত্র আর আত্মনির্ভরশীল জীবন।

কত মেয়েই তো এমনি রয়েছে। আশালতা ষড়ঙ্গী এখন কি? এই চাকরি ক'রেই তো বুড়ী হলেন। নীলিমা রাউত পেনশন নিয়েছেন—চিরকুমারী। এখন কোন অনাথ আশ্রম থেকে একটি ছোট ছেলে এনে পালছেন। এমনি অনেকেই তো। সকলেই কি বিয়ে করবে নাকি? বিয়ে করার দরকারই বা কী? নিজের পায়ে জোর আছে, তারি উপর নির্ভর করে চলা যায়। তাছাড়া বিয়ে করবে কাকে?

সরকারী চাকরিতে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর পেনশন আছে। জীবনটা ভালই কাটছিল।

কিন্তু কী হল?

এই শরৎভাই।

একদিন এসে উপস্থিত ঝড়ের মত সুমিত্রার বাসায়।

—চিনতে পারিস্, সুমী?

—ওমা! কেন, চোখের মাথা খেয়েছি নাকি? তারপর? হঠাৎ এলে কোত্থেকে, শরৎভাই? আমায় কী ক'রে মনে পড়ল তোমার?…মনে রেখেছ তাহলে? এস এস, হাত পা ধোও, ব্যাগ রাখ। কোথায় আছ আজকাল? করছ কী?

—কোথাও না, সুমী। তোর কাছেই এসেছি থাকব ব'লে। একটু জায়গা দিতে পারবি কিছুদিন—মানে…

সুমিত্রা চমকে উঠেছিল। শরৎভাই। কন্দরপুরের মাসীর বড় জায়ের ছেলে। ছেলেবেলায় মাসীর বাড়ী সে গিয়েছে কতবার। কী দুষ্টু ছিলেন তখন এই শরৎভাই। বয়সে মাস পাঁচ ছয়ের বড় হবেন। বোতাম ছেঁড়া হাফ-প্যাণ্ট একখানি নাইয়ের নীচে প'রে চারিদিকে লাফালাফি দুরন্তপনা ক'রে বেড়াতেন। দেখতে তখন রোগা পাতলা হলেও শরীর খুব শক্ত ছিল। গাছে চড়ায় বানরও পারবে না তাঁর সঙ্গে। পানকৌড়ির মত সারাদিন নদীতে ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরবেন। ভারী দুষ্টু। ভারী ডানপিটে। হাত ধ'রে মুচড়ে দেবেন। নিজের হাতের তেলোয় ধারালো চিল লুকিয়ে রেখে সুমিত্রার হাতের তেলো ধ'রে চেপে রগড়ে দেবেন। তবু ভালবাসতেন খুব। গাছে উঠে আম পেড়ে দিতেন—কাঁটা ঝোপ থেকে বঁইচি—পাখীর ডিম। ভারী পিছনে লাগতেন—ভেঙাতেন। কিন্তু কাঁদতে দেখলে কত ঘুষ দিয়ে শান্ত করতেন। দুপুরবেলা ঘরের ভিতর থেকে লুকিয়ে এনে তেঁতুল, আমের আচার—কত কী!

কী সুন্দর দিন ছিল সে সব। গাছে দোলনা বেঁধে রজর সময় দোল দোল খেলা—বউ বউ খেলা।

তারপর—কে কোথায় গেছে। মা মারা যাওয়ার দিন থেকে মাসীর বাড়ী সাত স্বপন। কলেজে পড়ার সময় শরৎ ভাইয়ের সঙ্গে মামার বাড়ীতে দু' এক বা'র দেখা হয়েছিল। শেষ দেখা হয় কটক স্টেশনে, তাও খুব একটুক্ষণের জন্য।

ট্রেন ছাড়তে আর অল্পক্ষণ আছে, তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তিনি নাকি যাচ্ছিলেন দল বেঁধে এন-সি-সি ক্যাম্পে। খুব ভাল দেখাচ্ছিল তাঁকে সেই এন-সি-সির পোষাকে। কোথায় ছেলেবেলার সেই নাইয়ের তলায় প্যাণ্ট পরা শরৎ ভাই, এন-সি-সির পোষাকে তাঁকে দেখাচ্ছিল মস্ত এক সেনাপতির মতো। হেসে জিজ্ঞেস করলেন,

—কিরে সুমী, চিনতে পারছিস্? এদিকে যাচ্ছিস্ কোথায়?

সুমিত্রা নমস্কার করেছিল।

—ভুবনেশ্বর যাচ্ছি শরৎভাই। তোমরা সবাই কোথায় চলেছ এই বীরবেশে?

—ক্যাম্প হচ্ছে, সুমী। আচ্ছা চলি, গাড়ী ছাড়বে। মনে রাখিস্।

তারপর হেসে তিনি আবার হারিয়ে গেলেন ক্যাডেটদের ভিড়ে।

তিনি চ'লে যাওয়ার পরে মনটা কেমন নরম হয়ে এল। তাঁকে আর একটু দেখতে, আর দুটো কথা বলতে মন চাইছিল—কিন্তু তিনি চ'লে গেলেন, ট্রেন ছেড়ে দিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মনটা যেন অকারণে ভারাক্রান্ত হয়ে রইল।

আজ ঠিক তিন বছর পরে সেই শরৎভাই—মোটে ভাবেনি সে তাঁর কথা— যে হঠাৎ তিনি এমনি এসে উপস্থিত হবেন...

...এ কি স্বপ্ন না সত্য?

মনে পুলক জেগে উঠেছিল। কল্পনা নেচে উঠেছিল।

দেহ উল্লসিত হয়েছিল।

* * * * * *

তারপর কত অপবাদ, কত গঞ্জনা...কত গুজব...কত অপমানের ভিতরেও সে শরৎভাইকে ঘরে স্থান দিয়েছিল !

শরৎভাই ও-এ-এস্ পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। সব নিন্দা গঞ্জনা অপমান ও পরিহাসের দিকে চোখ বুঁজে থেকে সুমিত্রা স্বপ্ন দেখছিল।

কী মিষ্টি সে স্বপ্ন !

কী নেশা সে স্বপ্নের !!

শরৎভাই আজ এসে অফিসে তার আংটিটা ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন—হাসতে হাসতে—যেন কিছুই হয়নি।

—তোর আংটিটা আমার কাছে থেকে গিয়েছিল সুমী, ফিরিয়ে দিতে এলাম।... নে নে, কিছু মনে করিস্ না।—আচ্ছা তুই বোস্, আমি যাই—এসেছিলাম একটা কাজে এখানে—আজ সন্ধ্যার ট্রেনে কলাহাণ্ডি হেডকোয়ার্টার্সে ফিরে যাচ্ছি।

কলাহাণ্ডি জেলায় শরৎভাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

আংটিটা হাত বাড়িয়ে নিল সুমিত্রা। না পারল কিছু বলতে, না পারল তাঁর মুখের দিকে তাকাতে। অফিসে কত লোক। সবাই আড়ি পেতে আড় চোখে চেয়ে তাদের দিকে। সুমিত্রা মুখ নিচু ক'রে ঠোঁট কামড়ে আংটিটা নীরবে নিয়ে আঙুলে পরে ফেলল। শরৎভাই চ'লে গেলেন...ব'লে গেলেন—কিছু মনে করিস্ না।

তাই শুনেই সে হেসেছিল।

সত্যিই তো, মনে করবার আর কী আছে ? কী মনে ক'রে সে একদিন পরিয়ে দিয়েছিল তাঁর হাতে এই আংটি ?

মনে হয় যেন কালকের কথা।

সেদিন শিবরাত্রির অমাবস্যার রাত, শরৎভাইয়ের ও-এ-এস্ পরীক্ষা হয়ে গেছে। (খুব খেটেছিলেন কিন্তু, তা সুমিত্রাও কি সে জন্য খেটেছিল কম !) দু'জনে রিকশ ক'রে লিঙ্গরাজ মন্দিরে শিবরাত্রি দেখতে গিয়েছিল। এমনি বসন্তকাল তখন। অশোক আর কৃষ্ণচূড়া গাছগুলি লাল ফুলে ভ'রে গিয়ে আপনি উচাটন হচ্ছিল আর সকলকেও উচাটন করছিল। সন্ধ্যার আগে বেরিয়েছিল তারা।

লিঙ্গরাজ মন্দিরের বিরাট প্রাঙ্গণে শত শত স্ত্রীপুরুষ। সহস্র প্রদীপের কম্পিত আলোর উৎসবে প্রাঙ্গণ ঝলমল করছিল। আজকের মত সেদিনও বইছিল দখিন হাওয়া, আর তাতে ভ'রে ছিল আশ্বাস ও বিশ্বাস, স্বপ্ন, আর যে কোনও শপথ নিতে পারার মদির আবেগ ও উচ্ছ্বাস।

মন্দিরের পাণ্ডারা বুঝতে পেরেছিল তারা স্বামী-স্ত্রী।

তেমনি সম্বোধনও করেছিল তারা। আর তাই ভেবে দু'জনের নামে তাদের কল্যাণে ঠাকুরের মাথায় তারা জল ঢেলেছিল, ফুল দিয়েছিল, প্রদীপ জ্বেলেছিল।

শরৎভাই প্রতিবাদ করেননি। সেই-বা কী ক'রে প্রতিবাদ করত? সেখান থেকে ফিরে ঠাকুরাণীর মন্দিরের ভিতরে পূজারী সিঁদুর চন্দন আর ফুল এনে দিয়েছিল শরৎভাইয়ের হাতে।

শরৎভাই নিয়েছিলেন।

মন্দিরের ভিতরে অন্ধকার ও স্বল্প দীপালোকের পবিত্র রহস্য। সেখানে শুধু আপন প্রেম ও বিশ্বাসকে অন্যের উপরে আরোপ ক'রে নিজেকে সহজ ও সরলভাবে তার কাছে সমর্পণ ক'রে দেওয়ার এক ব্যাকুল ভাবাবেগের অলৌকিক অনুপ্রেরণা। মন্দিরের ভিতরে সেই ছায়ান্ধকারের মধ্যে বাহ্য জগতের স্পষ্ট আলোকিত যুক্তি চিন্তা ও সংশয়ের স্থান ছিল না। কেবল সরল ও সহজ আদিম বিশ্বাসে মন ভরে উঠেছিল। সেই বিশ্বাসে সহজেই মনে হয়েছিল শরৎভাই তার জন্মজন্মান্তরের সাথী। সুমিত্রা মাথা নুইয়ে শরৎভাইয়ের সামনে দাঁড়াল, আর শরৎভাই তার সিঁথিতে পরিয়ে দিলেন ঠাকুরাণীর সিঁদুর।......

অমনি সুমিত্রা শরৎভাইয়ের হাত ধ'রে ফেলেছিল আর প্রাণের আবেগে কাঁপতে কাঁপতে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিল এই আংটিটা...এই আংটিটা...

আজ শরৎভাই সেটি ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

বেশ, তাতে কিছু যায় আসে না। ভালোই হ'ল।

পঞ্চাশ ভরি সোনা—পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক—কত দামী দামী উপহার—অপূর্ব সুন্দরী কন্যা—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্বশুর।

শরৎভাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

সুমিত্রা মাটির প্রদীপে তেল ভরে শিবরাত্রির প্রদীপ জ্বেলেছিল—একটি রাত।

ম্যাজিস্ট্রেটের আদুরী দুলালী সোনার প্রদীপে ঘি দিয়ে এবার থেকে শিবরাত্রির দীপ জ্বালবে হয়তো জীবনভোর।

ভালই হয়েছে।

শরৎভাই সুখে থাক। ম্যাজিস্ট্রেটের সৌভাগ্যবতী আদুরী কন্যার কাঁচ-অ বজ্র হোক[১]। তার সীমন্তে সিঁদুর জ্বলতে থাক জ্বল জ্বল করে চিরদিন। প্রভু তাদের সুখে রাখুন।

কিন্তু এই আংটিটা!

কি লোকসান করছিল এই আংটিটা ওদের? শরৎভাইয়ের দশটা আঙুলের কোনো একটা আঙুলে লেগে যেত আংটিটা। আর আংটিটাও এত সরু যে তাঁর মোটা মোটা আঙুলে যেন চোখেই পড়তে চায় না। তাঁর হাতে মানাচ্ছিল না আংটিটা। তবু এ আংটিটা তিনি পরেছিলেন। আর, তিনি পরেছিলেন বলেই সুমিত্রার ভালো লেগেছিল।

১। কাঁচ-অ বজ্র হোক—ওড়িয়া বাকরীতি, অর্থ: (সধবার) কাঁচের চুড়ি না ভাঙুক। ওড়িশায় কাঁচ-অ (কাঁচের চুড়ি) এয়োতির চিহ্ন।

কিন্তু কী এমন ব্যাঘাত করল এই আংটিটা ওদের।

নিত্য মধুসাগর মন্থনে ওদের যুগল জীবন কত অমৃতরসে ফেনিল হয়ে উঠবে। আর, তাদের যুগল জীবনের বিচিত্র সুন্দর রঙ্গমঞ্চের উপরে ফুটে উঠবে নিত্য কত ঐশ্বর্যের রঙিন চপল লীলা।

তার মধ্যে এই বেচারা আংটিটা। কত ছোট।

কিন্তু এতই কি তার ধার?

যে ফিরিয়ে দিতে পথ পেল না!

শরৎভাইয়ের স্ত্রী (আহা, ভগবান তাকে সুখী করুন) এইটুকু একটা আংটির ভারও সহ্য করতে পারল না! পঞ্চাশ ভরি সোনার ঔজ্জ্বল্য তেজ দীপ্তি আর গরিমা কি ম্লান ক'রে দিতে পারল না এই চারমাষার একটা নকল সোনার আংটির অলজ্জ উজ্জ্বলতাকে?

যে ফিরিয়ে দিতে পথ পেল না!

শরৎভাইটাও কেমন মেয়েলী! এতটুকুও যদি বুদ্ধি থাকে মগজে!

ছাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট!

আংটিটাকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিলে চলত না?

না, ভয় হল—মাছে গিলে ফেলবে, সে মাছ ধরবে আবার এক জেলে, তখন আবার—! বেচে দিতে পারলেন না?

ইঁদুরের গর্তে ফেলে দিতে পারলেন না?

আংটিটা এনে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

এইটেই খুব সহজ, না?

একটা আংটি বলেই না!

আর কি আমার কিছু রাখেন নি তিনি?

ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন না।

ফিরিয়ে দিতে পারবেন কি?

ও!! তা ফিরিয়ে দেওয়ার দরকার নেই বুঝি—

সেটা ম্যাজিস্ট্রেটের দুলালী মেয়ের চোখে পড়েনি বুঝি!

শরৎ ভাইয়ের স্ত্রীটাও ভারী বোকা মেয়ে! (আহা বেচারী সুখে থাক, সিঁথির সিঁদুর উজ্জ্বল হয়ে থাক চিরদিন।)

বোকা মেয়ে নয়?

ভাবছে আংটিটা তার সতীন! আজ অবধি সে তার আজ্ঞাধীন প্রেমাধীন দেবতাটির কেবল এই আংটিটাই দেখেছে!

আর কিছু দেখেনি?

না, দেখেও চোখ বুঁজে থেকেছে?

তাহলেও কী বোকা মেয়ে!

সুমিত্রার হাসি পেল—অসময়ে।

বিয়ে হ'লে সব পুরুষই বোধহয় এমনি মেয়েলী হয়ে যায়। আর সব মেয়েগুলোও বোধহয় হয়ে যায় এমনি বোকা!

কিন্তু এত কথায় তার কীই বা লাভ? সে আংটিটা দিয়েছিল, আর সেই আংটি ফেরত পেয়েছে।

বরং ভালোই হ'ল। এতে বরং সে নিশ্চিন্ত হ'ল। কিন্তু এমনি মানে মানে ফিরে না এসে সেটা যদি ওদিকে শরৎভাইয়ের একেবারে অজানতে কোথাও হারিয়ে যেত—আর এদিকে সে ব'সে ব'সে ভাবতে থাকত গালে হাত দিয়ে—যে—

—আহা, আংটি বেচারা আমার কেমন আছে! কেই বা সেখানে তার খবর রাখে! কার সময় আছে সেখানে তার খবর নিতে? মহোৎসবের প্রমত্ত কোলাহলের মধ্যে বেচারা—কোথাকার কে হয়ে আঙ্গুলের কোন কোণে লেগে আছে কেবল—অনাথের মত—কার নজর আছে তার দিকে? কার করুণাকোমল করস্পর্শে সে পুলকিত হয়ে উঠছে? কারই বা স্মৃতি তাপিত হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে সে সতেজ হয়ে উঠছে?

—কারও না—কারও না।

—সেখানে তাদের নিত্য মহোৎসব।

সেখানে কে আর ঐ আংটির ভাবনা ভাবছে! নিত্য অবহেলা কেবল।

ভালো হয়েছে, আংটিটা তার সে ফিরে পেয়েছে। ভালো হয়েছে।

সুমিত্রা আংটিটা হাতে ক'রে চোখের সামনে নিয়ে ধরল। কী নিরীহ শান্ত ছোট অথচ অভিমানী শিশুটির মত দেখাচ্ছে! কত দুর্বল, অথচ কী তার ধার! কী উজ্জ্বল! আর কী উদ্ধত!

কেন আর সে থাকবে ওখানে? কে আর ওখানে আছে তার দিকে চাইবার? এমন মমতাশূন্য অসহনীয় অবহেলার মধ্যে থাকবে কী ক'রে? এখানে বরং সে না খেয়ে মরবে। শুকিয়ে শুকিয়ে মরবে। ওখানে সে থাকতে পারবে না—থাকতে পারলনা—বেচারা পালিয়ে এসেছে।

যেন ধনী মামা তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন বাপমরা গরিব শিশু ভাগনেটিকে তার দুঃখিনী মায়ের কোল থেকে; সেখানে মামীর অত্যাচার সইতে না পেরে পালিয়ে এসেছে এই শীর্ণ দুর্বল শান্ত অথচ অভিমানী ছোট ছেলেটি তার গরিব মায়ের কোলে। এখানে সে শুকিয়ে শুকিয়ে মরবে—কিন্তু ওখানে সে দুধ ঘি মধুর প্রাচুর্যের মধ্যে অবহেলা সইতে পারবে না। পালিয়ে এসেছে—পালিয়ে এসেছে—আংটি তো নয়, তারই রক্তমাংসের আশা আকাঙ্খা আর প্রাণপূর্তির উজ্জ্বল সঙ্কেত—সে তার সন্তান—অবহেলা সইতে না পেরে ফিরে এসেছে আবার।

সুমিত্রা তার দুটি হাতের মধ্যে আংটিটিকে চেপে ধ'রে মুখে ছোঁয়াল—তার সমস্ত অন্তর এক গভীর বেদনায় কেঁপে উঠল। আংটিটিকে ব্যাকুলভাবে মুখে চেপে ধ'রে সে ভেজা গলায় বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগল,

—ওরে আমার দুঃখের ধন রে!

—ওরে আমার দুঃখের সর্বস্ব রে !

—ওরে আমার সাত রাজার ধন মাণিক রে !

—ওরে আমার......

তার চোখের জলে আংটিটা ভিজে গেল।

হঠাৎ কার ডাকে সুমিত্রা চমকে উঠে প্রকৃতিস্থ হ'ল।

—সুমি অপা (দিদি) !

—কে ? রাধারাণী ? হর্ষমণি ?—তোমরা কি—কোন দিকে—মানে, কী হয়েছে ?

—তুমি এখানে এসে বসে আছ সুমি অপা ? আমরা ওদিকে খুঁজে খুঁজে সারা। রাত আটটা বেজেছে !

—ভারতীর খবর শুনেছ সুমি অপা ?—এ কী—তোমার চোখে জল যে ! কাঁদছিলে নাকি ? কী হয়েছে তোমার সুমি অপা ?

সুমিত্রা এ সবে কান না দিয়ে শুধাল—ভারতীর কথা কী বলছিলে ? কী হয়েছে ভারতীর ? আগে বলনা ভারতীর কি হয়েছে।

—ভারতী নেই যে—

—কোথায় গেছে ?

—ওমা, তুমি জান না ? আজ প্রফুল্ল রায় এসে ওকে মেস্ থেকে নিয়ে গেছে তার গাড়ীতে। আজ বোধহয় ওরা কটক গেল।

—অ্যাঁ, হল কী !

—হবে আর কী, সুমি অপা ? তুমি এমন অবাক হচ্ছ কেন ? এ তো আমরা আগে থেকেই জানতাম। আজ ওরা কটক গেল। কাল ওদের কোর্টে বিয়ে হবে যে।

—বিয়ে ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বিয়ে। দ্বিতীয় পক্ষ নয় সুমি অপা, দস্তুর মত বিয়ে বাড়ী। ভারতী শেষে প্রফুল্ল রায়কে—ভালই হল—ভারতীর একটা হিল্লে হয়ে গেল। তবে কিনা আমরা সব এখানে ম'লাম।

সুমিত্রার ঠোঁট কেঁপে উঠল। তার চোখ দুটো জ্বলে উঠে ঠেলে বেরিয়ে এল। গলা চড়িয়ে আদেশের সুরে সে বলে উঠল,

—কেন ? তোমরা সব এখানে মরবে কেন ?

—নয় তো কী ? খুব হাসাত যে ভারতী। আজ থেকে আমাদের মেসে হাসি নিবে গেল, সুমি অপা !

সুমিত্রার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। তার মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল, মনে হল যেন তার চারিদিক থেকে হাসির তুফান ছুটে আসছে।

হাঃ হাঃ হাঃ

হিঃ হিঃ হিঃ

হো হো হো—

তার মাথা খারাপ হয়ে গেল বুঝি। থিয়েটারের স্টেজের উপরে উন্মাদিনী নায়িকার আবেগতপ্ত প্রগলভ সংলাপের মত বক্তৃতা শুরু করল সে হাত মুখ নেড়ে।

—আরে যাঃ, এই জন্য তোরা সবাই ম'রে যাবি ভাবিস্? ওলো, ভারতী চ'লে গেল বলে এ মেস্ থেকে হাসিও চ'লে যাবে না তার পিছু পিছু। যাক সে কোন চুলোর দোরে যাচ্ছে যাক। তোরা সবাই চল—চল, ফিরে চল মেসে। দ্যাখ্ আজ থেকে আমি কেমন হাসাই তোদের। চল—চল, শিগগির চল। হাসির জন্য তোদের মরতে হবে না লো। চল—চল, মেসে চল, আজ রাত্তিরেই আমি এমন একটা হাসির কথা বলব তোদের যে হেসে গড়িয়ে পড়বি তোরা, হেসে লুটিয়ে পড়বি—হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলবি। ভারী মজার কথা লো—ভারী মজার কথা…

হি হি হি হি

হি হি হি হি—

সুমিত্রা উন্মাদিনীর মত হেসে উঠল উচ্চকণ্ঠে।

হর্ষমণি বাসন্তী আর রাধারাণী সুমিত্রার এ হাসি দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

তারা চেঁচিয়ে উঠল।

—সুমি অপা—সুমি অপা—ও কী, অমন করছ কেন সুমি অপা?

সুমিত্রা তবু হেসে চলেছে লহর তুলে তুলে—

হি হি হি

হি হি হি—

সুমি অপা—ও হো—(কান্না) সুঁমি অঁপাঁ—অ্যাঁ—কিঁ হল তোঁমার—?

—ও মাগো…ওলো এ কী হ'ল—?

—অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ সুঁমি অপাঁ…

তারা সবাই এ ওকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে উঠল।

সুমিত্রা তবু হাসছে—

হি হি হি

হি হি হি

হি হি হি—

বসন্তকুমারী পট্টনায়ক (1923—)

কটক শহরে বসন্তকুমারীর জন্ম। ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথম সারির লেখিকা। 'অমড়াবাট' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্যের দরবারে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর লেখায় নারীর আশা আকাঙ্খা, হতাশা ও ক্ষোভ মূর্ত হ'য়ে ওঠে। নারী জাতীর প্রতি পুরুষ-প্রধান সমাজের যে কোন শোষণের বিরুদ্ধেই তাঁর কলম সোচ্চার হ'য়ে ওঠে। নিচের গল্পটি তাঁর বিষয়বস্তুর সর্বজনীনতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'সভ্যতার সাজা', 'জীবন চিহ্ন' এবং 'পালটা ঢেউ'।

নেমন্তন্ন

নানী বলেছে কাল চান করার বেলায় নেমন্তন্ন—সে নানীর সঙ্গে ইস্কুলে যাবে।

সারা রাত বিন'র চোখে ঘুম নেই। থেকে থেকেই মায়ের ঘুম ভাঙ্গিয়ে শুধোয় সকাল হয়েছে কি না। নানী বলেছে আজ তাকে ইস্কুলে নিয়ে যাবে, কত মেয়ের সঙ্গে চেনা করিয়ে দেবে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিন-অ ভাবছে সেই কথা। হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সে মায়ের গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল—মা, মা, ওঠ্, সকাল হয়েছে, কাক ডাকছে যে—

ঘুমে ঢুলঢুলে চোখে জানালার দিকে তাকিয়ে মা বললে—উঃ, এ ছেলেটা মানুষকে একটু ঘুমুতে দেবে না। এত অন্ধকার রয়েছে, সকাল হল কোথায়, হ্যাঁ রে ?

—হ্যাঁ, একটা কাক ডেকেছে, আমি স্পষ্ট শুনেছি।

মা আরমোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বিন-অ এদিকে রমাকে ডাকল—নানী, নানী, সকাল হয়েছে, উঠবি না নাকি গো ? এই নানী—

দরজা খুলে তিনজনেই বাইরে এল। মা'কে বার বার তাগাদা বিন'র—আগে তার কাজ সেরে তার পর আর সব।

পুকুর পাড়ে পাথরের উপর ব'সে হাতে একখানা ঝামা নিয়ে বিন-অ নিজের গা রগড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছে—মা, এবার আমায় ফরসা দেখাচ্ছে ? মা যতই হ্যাঁ বলুক বিন'র মন ওঠে না, সে আরো বেশী ক'রে গা রগড়ায়। শেষে বিন-অ জেদ ধরল কাছে এসে দেখে যেতে হবে। বাসন মাজা ছেড়ে মা এসে দেখল

ঝামায় গায়ের নরম চামড়া ছ'ড়ে গিয়ে লাল হয়ে উঠেছে। ছেলের হাত থেকে ঝামাখানা কেড়ে নিয়ে মা বললে—হ্যাঁ রে, ঝামা দিয়ে কেউ গা রগড়ায় ?

—আলতা পরার সময় তুই যে পায়ের ময়লা তুলিস্ ?

স্নান ঐখানেই শেষ। সারা গা জ্বলছে। গা হাত পা মুছে বিন-অ ফিরে এল। ঘরের মাটির দেওয়ালে পেরেক পুঁতে একখানি আয়না টাঙ্গানো। সেইখানে এসে দাঁড়ালো বিন-অ—হাতে চিরুনি। চিরুনির মাঝের দাঁতগুলি ভাঙ্গা। দুই দিকে যা দুই এক গণ্ডা দাঁত আছে তাই দিয়ে বিন-অ তার তেল চুকচুকে খাড়া খাড়া চুলগুলি চিকন ক'রে পাটি পাড়ার চেষ্টায় লেগে গেল। মনে আনন্দ—সব আজ তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চিকন-চাকন।

* * * * * *

স্কুলের ফটকের কাছে এসে বিন অ বলল—নানী, আমায় সব জিনিষ দেখিয়ে দিবি তো ? আর, সব মেয়েদের সঙ্গে চেনা করিয়ে দিবি, অ্যাঁ ?

—আচ্ছা। এই দ্যাখ, এখানে কেমন দুব্বো ঘাস হয়েছে, আর এখানে মুথা ঘাস।

—আরে, হ্যাঁ তো! ব'লে জীবনে যেন কখনো ঘাস দেখেনি এমনি ভাবে বিন-অ নুয়ে প'ড়ে একবার ঘাসে হাত দিয়ে দেখে নিল। তারপরে দুজনে এগোল আবার।

একটার পর একটা গাছ দেখিয়ে চলেছে রমা—পলাশ জবা কৃষ্ণচূড়া রজনীগন্ধা আম বেল—কোনোটা ফুলে বা ফলে ভ'রে আছে, কোনোটা বা অমনি নেড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু বিন'র চোখে আজ সব সুন্দর। চোখে রামধনুর রঙ মেখে সে চাইছে চারিদিকে, তার পর আবার এগোচ্ছে।

গাছপালা দেখা হয়েছে। বাকী আছে স্কুলঘর, যেখানে মেয়েরা আরামে ব'সে পড়া করে। রমা দেখল তার ক্লাস তখনও খোলা হয়নি। ভাঙ্গা জানলা বেয়ে উঠে ভাইয়ের হাত ধ'রে ভিতরে টেনে নিল। আর সব জানলা দরজা বন্ধ, ঘরের ভিতর অন্ধকার। চলতে গেলে বেঞ্চের গায়ে ধাক্কা লাগছে, আর তার সঙ্গে বিন'র মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে আসছে—বাবা রে, মা রে। শেষে রমার জামা ধ'রে টেনে বলল—না গো নানী, ভূত আছে বোধহয়, চল্ ফিরে যাই। মুখের কথা না ফুরোতেই বিজলীবাতি জ্বলে উঠল আর সেই আলোয় দেখা গেল রমার মুখে একটা সবজান্তার মতো চাপা হাসি। বিন-অ হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল—নানী তার কত কিছুই জানে! সে বললে অমনি বিজলী বাতিও জ্বলে ওঠে!

আনন্দে মাটিতে পা পড়ছে না, এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে এখানে করছে সে। উপরে নীল আকাশ নেই, নিচে সবুজ ঘাসের গালচেও নেই, তবু সেই বন্ধ ঘরে দুটি মানুষের ছেলেমেয়ে বসন্তের কীট পতঙ্গের মত আনন্দে আত্মহারা।

* * * * * *

মাঠে দলে দলে মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। চেনা মেয়েদের দেখতে পেয়ে রমা তাদেরকাছে গেল। সবাই বিন'র দিকে তাকিয়ে—সকলের মুখে মুচকি হাসি।

—এ কে, রমা ?

—আমার ভাই।

—ঠিক অনার্যদের মত দেখাচ্ছে—একজন টিপ্পনী কাটল।

রমার মুখটা শুকিয়ে গেল। সন্দেহ ভরা চোখে ভাইয়ের দিকে চেয়ে আর একবার দেখে নিল। বিন'র চেপ্টা নাক পুরু ঠোঁট টেবো টেবো গাল আর পাকা তালের মত গায়ের রঙ কোনোটাতেই রমা কোনো দোষ খুঁজে পেলনা। ভাইয়ের কাঁধে হাতটি রেখে সে বলল—তোকে মিছিমিছি বলছে রে, ভয় পাসনি। ভয় পায়নি এটা দেখাবার জন্য বিন-অ হাসল। পুরু ঠোঁট দু'ভাগ হয়ে সরু জিভটি বেরিয়ে এসে একটু লকলক ক'রে আবার ভিতরে ঢুকে গেল—ঠিক সাপের মত।

—এই ছেলে, আর একটু হাস তো, হাস তো······

—না। বিন-অ মুখটা শুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—আরে, বড় অবাধ্য ছেলে তো!

—নানী, চল খেলব।

বিন-অ দিদির হাত ধ'রে খেলতে চ'লে গেল।

খেলতে খেলতে গা দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। সূর্য মাথার উপর থেকে নিচে নামতে শুরু করেছে। তবু রান্না শেষ হচ্ছে না।

* * * * * *

সারি সারি মেয়েরা চলেছে—একজনের হাতে চাটাই, আর একজনের হাতে পাত। একটা সারির শেষ মুড়োয় বসেছে বিন-অ আর রমা। বিন'র লোভী চোখ দুটো রয়েছে পাতের দিকে। মাঝে মাঝে দিদিকে চিমটি কাটছে—দিদি খেতে আরম্ভ করলে সেও আরম্ভ করবে। খেলবার সময়ে দিদি তাকে বার বার ক'রে বলেছে সে আরম্ভ না করলে বিন-অ যেন আরম্ভ না করে।

স্কুলের মুরুব্বিরা ঘুরে ঘুরে দেখছেন সবাই ঠিক মত সব পেয়েছে কিনা। হঠাৎ একজনের নজর পড়ল রমার পায়ের উপর—পায়ে গোটা গোটা খোস। রমার দিকে চেয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—তোমার খোস হয়েছে—আর সবায়ের ছোঁয়াচ লাগবে। তোমরা যাও খেলা কর গিয়ে, এদের খাওয়া হ'লে তোমাদের ডাকা হবে। রমা উঠে পড়ল।

বিন-অ ব্যাকুল হয়ে চাইল দিদির মুখের দিকে।

—এ ছেলেটি কে?

—আমার ভাই।

—আচ্ছা, ওকেও তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও। তুমি যখন খাবে তখন ও খাবে।

ভাই বোন দু'জনে উঠে চ'লে গেল পাতের দিকে চাইতে চাইতে।

—বুঝলি বিন-অ, ওদের খাওয়া হয়ে যাক, আমরা খাব।

—না নানী, আমার ভারী খিদে পেয়েছে······বমি পাচ্ছে। সকালে মা খেতে দিচ্ছিল, তুই বারণ করলি।

—আচ্ছা দাঁড়া, আর একটুক্ষণ তো। দেখলি তো কেমন ভালো ভালো জিনিষ

রান্না হয়েছে। সকালে মা পান্তাভাত খেতে দিচ্ছিল, তা খেলে তুই কি ভাল জিনিষ বেশী খেতে পারতিস্ ?

—আমার বমি পাচ্ছে।

—আচ্ছা তবে চল, দুটো বেল পাতা শুঁকিয়ে দিলে গা-বমি ভাল হয়ে যাবে।

বেলপাতা শুঁকতে গিয়ে দু'মুঠো বেলপাতা চিবিয়ে খেয়ে ফেলল বিন-অ। তারপর বলল—নানী, ভারী খিদে—।

—এই দ্যাখ, কী কী সব রান্না হয়েছে তোকে আমি এইখানে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ব'লে রমা কাঠি-কুটো কুড়িয়ে এনে মাছ-মাংস বানালো, ঢিল-কাঁকর দিয়ে মিঠাই-মণ্ডা আর ঘাস-পাতা দিয়ে তরকারি হ'ল। বিন'র খিদেয় শুকনো মুখ চোখের দিকে চেয়ে রমা ভূতের গল্প বলতে আরম্ভ করল—এইখানে এই পাঁচিলের ওপাশে যে অন্ধকার ঘরটা দেখছিস্ না, ঐখানে ভূত ছিল।

* * * * * *

ভূতের গল্পে কতক্ষণ কাটল কে জানে। ডুবন্ত সূর্যের লালচে আলো ছড়িয়ে পড়েছে, ভাই বোন দুটি একলা একলা ব'সে আছে সেই ঘাসের উপর। হঠাৎ কার ডাকে চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখল চাপরাশী ডাকছে। খুশী হয়ে রমা ভাইয়ের হাত ধ'রে উঠল—চল্, এবার আমরা খাব, দেখছিস্ না চাপরাশী ডাকতে এসেছে ? শুকনো মুখে হাসি ফুটিয়ে রমা চাপরাশীর দিকে চেয়ে শুধোল—ওদের খাওয়া হয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ, সবাই খেয়ে যে যার বাড়ী গেছে……তোমরা এসে এইখানে ব'সে আছ, বাড়ী যাবে না নাকি ?

নিজের অজান্তে হাতের মুঠোর ভিতর থেকে ভাইয়ের হাতখানি খ'সে পড়ল। রমার চোখে জল।

চাপরাশী ভাল মানুষ, বললে—চল, আমি তোমাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাব।

—না থাক্, আমরা একাই চ'লে যাব।

* * * * * *

নেমন্তন্নের জায়গা। এঁটো পাতের উপরে কাক কুকুরের লড়াই। সেইখানে চারখানি ধুলোমাখা ছোট ছোট পা মুহূর্তের জন্য থেমে আবার এগিয়ে চলল।

সকালে যে পা চারখানি মাটিতে পড়ছিল না, সন্ধ্যাবেলা তাদের যেন মাটি থেকে ওঠবার জোরটুকুও নেই।

আরণ্যক

মনোজ দাস

বালেশ্বরে জন্ম। বয়স এখন পঞ্চাশের ওপর। আধুনিক ওড়িয়া ছোটগল্পের একজন মুখ্য প্রবক্তা। ওড়িয়া গল্পের ক্ষেত্রে তিনি এক নতুন শৈলীর অগ্রদূত। তাঁর গল্পে মুখ্য হ'য়ে ওঠে মানুষের অসহায়তার কথা। মনোজ দাস সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কৃত লেখক। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'আরণ্যক', 'ধূম্রাভ আকাশ', 'নন্দবাটির মাঝি' ও 'শতাব্দীর আর্তনাদ'।

মিসেস্ মিটি দরজায় মৃদু আঘাত শুনতে পেলেন। তিনি চোখ খোলার আগে আরো কতবার হয়তো এমনি ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ হয়ে থাকবে। খুব মৃদু আওয়াজ। মাঝে এক এক মিনিটের ব্যবধান। চৌকিদার এর অন্যথা করবে না। সে জানে।

মিসেস্ মিটি প্রশস্ত ঘরখানির সমস্ত ভিতরটাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তাঁর পায়ের কাছে প'ড়ে ছিলেন রাজা সাহেব—একরাশ অশ্লীল আবর্জনা। রাজা সাহেবের পুরু ঠোঁটের উপর আধ ডজন মাছি পিকনিক করছিল।

আর দুর্দান্ত সব বেচারা মিঃ চাকোড়ি নাক ডাকাচ্ছিলেন—শুওরের মত আওয়াজ ক'রে।

আর মিঃ মিটি ও মিসেস্ চাকোড়ি মেঝের উপরে মুখোমুখি হয়ে শুয়ে ঘুমচ্ছিলেন; সম্ভবত: পরস্পরের কাছে আসার প্রয়াসের মধ্যেই অচেতন হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা।

দরজায় আর একবার আঘাত। মিসেস্ মিটি চৈতন্যের স্তরে আর একধাপ উঠলেন। যে পর্বত প্রমাণ জড়তা তাঁর সম্বিতের উপর চেপে ছিল তার থেকে একটা চাঙ্গড় খ'সে পড়ল। অবশ্য কখন তাঁরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তা এখন পর্যন্ত তিনি মনে আনতে পারছিলেন না। তবে অর্ধচেতন বরাহটিকে আগুনের ভিতর ফেলে দেওয়া, তার পরে তার চারদিকে নাচতে নাচতে সুরাসমভিব্যাহারে তার গা থেকে অর্ধসিদ্ধ মাংস এক এক স্লাইস্ কেটে খাওয়া পর্যন্ত সব মনে আছে। লক্ষ বছর আগে মানুষের যেমন উন্মত্ত বন্য অবস্থা ছিল এক রাত্রির জন্য তারই ভিতরে

ফিরে যাওয়া ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। মিঃ চাকোড়ি অবদমিত প্রাগৈতিহাসিক প্রবৃত্তির অবাধ মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে একজন পণ্ডিত। এই রকম সাময়িক স্বেচ্ছাকৃত মুক্তি কত স্বাস্থ্যকর, পানাহারের প্রারম্ভে সে বিষয়ে তিনি একটা দীর্ঘ বক্তৃতা করেছিলেন। (কে বা শুনছিল সেই বুদ্ধ্ বিবৃত তত্ত্ব !)

দ্বারে আবার এক আঘাত। এবার মিসেস্ মিটির স্মৃতির ভিতরে পলকে জেগে উঠল সমস্ত ইতিবৃত্ত।

২

পূর্বদিনের দ্বিপ্রহর।

মাইলের পর মাইলব্যাপী ঝোপজঙ্গল ও রুক্ষ পাথুরে মাটির উপর দিয়ে জীপ ছুটছিল—অরণ্যের অভ্যন্তরে এই পরিত্যক্ত বাংলোটির উদ্দেশে। আহত প্রজাপতি একটি জীপের চাকার নীচে পড়ে যেতে মিসেস্ মিটি চীৎকার করে উঠলেন—ইঃ বড় করুণা হয় যে! মাখনের মত মোলায়েম তরল কারুণ্য বুঝি এখনি গড়িয়ে পড়বে এমনি তাঁর মুখের রেখাগুলির সাবলীল কুঞ্চন। আর সেই বিগলিত কারুণ্য চটপট চেটে নেবার জন্য বুঝি মিঃ চাকোড়ি তাঁর ব্যাঘ্রগুম্ফমণ্ডিত অতিকায় মুখখানা মিসেস্ মিটির খুব কাছে এনে বললেন—ছিঃ, এত কোমল হ'লে কি চলে, চাইল্ড্ ? মিসেস্ চাকোড়ি যেন একটা দুর্গন্ধে আক্রান্ত হয়েছেন এমনি নাসিকা কুঞ্চন ক'রে বললেন—মিটি সাহেবের মতো স্বামীর পক্ষে একটু অতিরিক্ত কোমল! মিসেস্ চাকোড়ি যখন প্রতিটি অক্ষরে জোর দিয়ে আপাতনিরীহ কণ্ঠে কথা বলেন তখন নিয়মিতভাবে তাঁর একটি চোখ বন্ধ হয়ে যায়। অদৃশ্য বিষ ছড়িয়ে যায় হাওয়ায়; স্বয়ং আশীবিষ তাতে ম্রিয়মাণ হবে। তবে সে বিষের মাত্রাতিরিক্ত সেবনে পরিপুষ্ট মিঃ চাকোড়ির কোনো ভাবান্তর ঘটল না।

আত্মবিস্মৃত অবস্থা থেকে জেগে উঠে এবার যে মিঃ মিটির কথার গাড়ি ছুটবে তার সিগন্যাল ডাউন হ'ল। হঠাৎ বিপুলকায় চুরুটটি তিনি বিনা হস্তসঞ্চালনেই ঠোঁটের এক কোণে নিয়ে এসে চট ক'রে নিচু ক'রে দিলেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হলেন ঊর্ধ্বনেত্র আর তাঁর মুখে ফুটে উঠল এক 'বলব? কিন্তু তোমরা কি বুঝবে?'—জাতীয় সূক্ষ্ম হাসি। তিনি যে কোনো সামান্য কথা বলতে যাচ্ছেন না এসব তার সঙ্কেত। কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি লক্ষ্য না ক'রে সকলের মাঝখানের শূন্যতাটার গায়ে নিজের দৃষ্টিটা বুলিয়ে দিয়ে তিনি বললেন,

—মিসেস্ চাকোড়ি! এই নারীসুলভ কোমলতা জিনিষটি আমার কাছে বড় রহস্যময়। এর আমি কিছু বুঝি না—বুঝলেন? বুঝি না, তবে সত্যি কথা বলতে কি আপনাদের মিসেস্ মিটির মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যেটা আমার ভয়ঙ্কর ভালো লাগে। হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে কী, যুদ্ধে শত্রুকে খতম করার চাইতেও বেশী ভালো লাগে। হুঁঃ হুঁঃ, ইয়াঃ, সত্যি কথা।

—চুপ কর, লিট্‌ল্ উল্‌ফ্ !—মিসেস মিটি আপত্তি জানিয়ে মুখের উপরে রুমালের এবং রুমালের উপরে মুখের হাওয়া করতে লাগলেন।

মিসেস্ মিটি আরো কিছুক্ষণ তেমনি কোমলমতি একরত্তি বালিকা হয়ে রইলেন—মিসেস্ চাকোড়ির প্রবল অন্তর্দাহ সত্ত্বে। তারপর হঠাৎ এক মুহূর্তে তাঁর সঞ্চরণশীল দৃষ্টি উত্তেজনায় টগবগ ক'রে ফুটে উঠল।

—ইউ ড্রাইভার, থাম !

রাস্তার বাঁদিকে এক অর্ধবৃত্তাকার পরিসর। তার তিন দিক ঘিরে রয়েছে অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী।

জীপ থামল। প্রজাপতি উড়ে গেলে বাতাসে সেটুকু তরঙ্গাভিঘাত হয় তাতেও বিচলিত হতে অভ্যস্তা মিসেস্ মিটি ; কিন্তু আকস্মিক ব্রেক-ঘটিত জার্কিং-এ তিনি নিষ্পন্দ হয়ে রইলেন। প্রায়শঃ একচক্ষু মিসেস্ চাকোড়ির উভয় চক্ষু অভাবনীয়-ভাবে বিস্ফারিত হয়েছে দেখা গেল। মিটি সাহেবের আত্মবিস্মৃত ভাবও তখন অন্তর্হিত।

পাহাড়ের নিচে সেই অর্ধবলয়ের মধ্যে একটি হরিণ। ঘনকৃষ্ণ মেঘের মত কালো পাথরের গায়ে এক ঝলক বিদ্যুৎ লেগে রয়ে গেছে যেন।

পাকা আকন্দ ফল ফাটার মত সবাই জীপের ভিতর থেকে ছিটকে বেরুলেন। এ ঝোপ ও ঝোপ ছুঁয়ে ছুঁয়ে হরিণ তীরের মত ছুটছে ; এক দুই তিন, আবার তিন দুই এক—একইভাবে সে তার গতির পুনরাবৃত্তি ক'রে চলেছে। তিন দিকে পথ রোধ ক'রে পাহাড়। একমাত্র খোলা দিকটি জুড়ে রয়েছেন ছয়জন। তাঁদের হাতে পাঁচটি বন্দুক। মিসেস চাকোড়ির হাতে বন্দুক নেই। তবে তাঁর দুটি চোখ জ্বলন্ত বুলেটে পরিণত হয়েছিল।

মিনিটখানেক এদিক ওদিক ছোটাছুটি ক'রে হরিণ শেষে একটা দুঃসাহসিক কাজ করল। সে ড্রাইভার শ্যামলেন্দুর উদ্যত বন্দুকের সামনে দিয়ে হঠাৎ অন্য দিকের ঘন জঙ্গলের ভিতরে ছুটে পালাল।

শুট্ !—মিসেস্ মিটি চেঁচিয়ে উঠলেন।

কিন্তু শ্যামল ট্রিগার টিপল না। ওদিকের শ্যামলিমার গায়ে হরিণটি একটা সোনার ছুরির মত একবার বিঁধে গিয়ে অদৃশ্য হওয়ার পর সে বন্দুক নিচু করল।

তারপর পাঁচটি ক্রোধ কম্পিত দাবির সামনে শ্যামল কৈফিয়ত দিল—হাত উঠল না। ওটা হরিণী, গর্ভবতী।

রুমাল দিয়ে মুখ থেকে কথাগুলি মুছে আনলেন মিসেস্ মিটি।—কী আস্পর্ধা ! আবার অশ্লীল কথাও বলে !—তিনি প্রায় কেঁদে ফেলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মিঃ চাকোড়ি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—আহা, আপনি আবার অমনি কোমল হয়ে উঠছেন ম্যাডাম ! নেক্সট্ চান্সে আপনি নিজেই গুলি করবেন, কেমন ? বন্দুকটা কোলে নিয়ে থাকুন।

এবার মিসেস্ মিটি ড্রাইভার শ্যামলের পাশে বসলেন। এই উদ্ধত যুবক বাকী

পাঁচজনের বেদনা ও আবেগের প্রতি একটুও ভ্রূক্ষেপ করছে বলে মনে হচ্ছিল না। তার কারণ তার মনিব, রাজাসাহেবটি তার অন্তর্ভ্রাতা, পরলোকগত বৃদ্ধ রাজার বহু সন্তানের মধ্যে শ্যামল একজন। অবশ্য তার জননী রাজার স্বীকৃতিপ্রাপ্তা রক্ষিতা-বর্গের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তার আসন ছিল অনেক নিচে।

সর্বদা কিছু বিমর্ষ কিন্তু সুদর্শন, বিচক্ষণ শিকারী শ্যামল বৃদ্ধ রাজার চেহারার সমস্ত আভিজাত্যের নিদর্শন বহন করছিল। অথচ তাঁর উত্তরাধিকারী খোদ রাজাসাহেব ছিলেন বৈশিষ্ট্যহীন একটি জীব। জীবনীশক্তির বিবেচনাহীন ও অনর্গল বায় তাঁকে বহুদিন এক বিকল অক্ষম বুভুক্ষুতে পরিণত করেছিল। যথাসম্ভব দীর্ঘকাল নারীসঙ্গ যাপন ক'রে তাদের ঘ্রাণ গ্রহণ করাই ছিল তাঁর এখনকার একমাত্র বিলাস। প্রধানতঃ সেই লোভেই তিনি বহুকালাবধি বর্জিত তাঁর আরণ্য-নিবাসটিকে সম্প্রতি বাসযোগ্য ক'রে সেখানে এই অভিযানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

বাংলোয় পৌঁছানো পর্যন্ত রাজাসাহেব প্রতি পাঁচ মিনিটে একবার শ্যামলের বোকামির কথা স্মরণ ক'রে তাকে অভিশাপ দিতে থাকলেন। শ্যামল নির্বিকার-ভাবে গাড়ী চালাতে থাকল।

অপরাহ্নে বাংলোয় পৌঁছে কিছু হাল্কা পানাহারের পর তাঁরা শিকারে বেরুলেন। শ্যামল কিন্তু যেতে চাইল না। কিছুক্ষণ অসম্বদ্ধ তর্জন গর্জনের পর রাজাসাহেব চুপ করলেন। সেই হরিণীজনিত ব্যর্থতার শোকে তদবধি মুহ্যমানা মিসেস্ মিটিও বাংলোতে থেকে গেলেন।

মিসেস্ চাকোড়ি মিসেস্ মিটির দিকে তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু মিসেস্ মিটি জানতেন মিটি সাহেবের আরণ্য সান্নিধ্যের লোভ ত্যাগ ক'রে থাকতে পারবেন না মিসেস্ চাকোড়ি। বৃদ্ধ-প্রবর মিঃ চাকোড়ির উপস্থিতি সত্ত্বেও নিভৃত অরণ্যে বহু ডাকাত আদান প্রদানের সুযোগ পাবেন মিঃ মিটি ও মিসেস্ চাকোড়ি।

৩

সন্ধ্যা আগতপ্রায়।

ভৌতিক নীরবতা—মধ্যে মধ্যে এক অজানা শব্দ। ভয় কৌতূহল ও এক দুর্বার লিপ্সার সমাবেশে মিসেস্ মিটি অননুভূতপূর্ব শিহরণে কেঁপে উঠলেন। তারপরে একাকী কিছু সুরাপানের অব্যবহিত পরে হঠাৎ তাঁর অহং শ্যামলের নিরাসক্ত উদ্ধত বিমর্ষতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে উঠল।

এমনি সময়ে দূরান্তর থেকে শোনা গেল এক গর্জন।

—এ কীসের শব্দ হ'তে পারে? মিসেস মিটি জিজ্ঞাসা করলেন শ্যামলকে।

—বাঘের, মাডাম। শ্যামল বললে।

মিসেস্ মিটি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ও বারান্দা থেকে ভিতরে পলায়নের অবসরে পুরোপুরি শাস্ত্রীয় রীতিতে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গেলেন এবং শ্যামল না আসা

পর্যন্ত ওঠার চেষ্টা করলেন না। আর যখন শ্যামল এল তখন সে তাঁকে সম্পূর্ণ তুলে ধরার সুযোগ পাওয়ার জন্য যেটুকু ওঠা প্রয়োজন সেইটুকুই উঠলেন।

অতঃপর এ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য না ক'রে তিনি মুখে একটি মারাত্মক হাসি ফুটিয়ে বললেন—তুমি একজন শিকারী, না শ্যামল ?

শ্যামল বুঝল। মিসেস্ মিটিকে তার বিশ বৎসর আগেকার খেলার সাথীটির মত মনে হ'ল, যে সহজভাবে একটা খেলার কায়দা শেখাচ্ছে মাত্র।

শ্যামল সুশীল বালকের মত ব্যবহার করল। তার মুখ থেকে সেই ঈষৎ বিদ্রূপ মেশানো বিমর্ষ হাসি কিন্তু মিলাল না। সেই নীরব হাসি মিসেস্ মিটিকে কেবল যে জয়লাভের তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত করল তা নয়, তাঁর মন ছেয়ে দিল এক তীব্র অপমান ও পরাভবের অন্ধকারে।

রাজাসাহেব এবং অন্য তিনজন অরণ্য হ'তে যখন ফিরলেন তখন অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। মিসেস্ মিটির ক্লান্ত নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। কেমন জ্বর জ্বর লাগছিল তাঁর। দরজা খুলতে প্রথমেই তাঁর চোখ পড়ল মিসেস্ চাকোড়ির চোখে। মিসেস্ চাকোড়ি যে অনেক কিছু কল্পনা ক'রে ফেলেছেন তা বুঝতে তাঁর দেরি হ'ল না। যথাসম্ভব সত্বর ঘরের এক কোণে মেঝের উপর নিদ্রিত শ্যামলের উপর মিসেস্ চাকোড়ির দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। সে দৃষ্টি ভয়াবহ। তাতে সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছিল তিনি কত শোচনীয় ও প্রতারিত অনুভব করছিলেন।

—ডার্লিং, তোমায় একলা ফেলে রেখে গিয়ে মিসেস্ চাকোড়ি এত অস্থির হচ্ছিলেন যে সে আর কী বলব! আশা করি তোমার কিছু অসুবিধা হয় নি ? বললেন মিঃ মিটি।

সে পর্যন্ত সুরা নিদ্রা অন্ধকার ও সেই ভৌতিক নিস্তব্ধতার সম্মিলিত বিচিত্র প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হননি মিসেস্ মিটি; অথচ মিসেস্ চাকোড়ির কল্পনাকে তথা যে বিদ্রূপ ভরা অসহ্য হাসির আভাস তখনও শ্যামলের মুখে লেগে আছে বলে তিনি আশঙ্কা করছিলেন তাকেও একসঙ্গে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি মিঃ মিটির বেল্ট ধরে তাঁকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত গদ গদ কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—জানো ..জানো ..ঐ জানোয়ারটাকে আমি এক চড় কষিয়ে দিয়েছি।

—শ্যামলের কথা বলছ ?

—আবার কার! লোকটা কী ভয়ঙ্কর শয়তান!

তারপর কয় মুহূর্ত বিরাজ করল সেখানে শ্মশানের নীরবতা।

আজীবন শ্যামলের বিরুদ্ধে অকারণ অভিযোগ পোষণ ক'রে আসছিলেন যে রাজাসাহেব তিনি এবার ঘুমন্ত শ্যামলের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু তারপর কী করবেন স্থির করতে না পেরে সেখানে দাঁড়িয়ে কেবল ফোঁস ফোঁস করতে ও ঘাম মুছতে লাগলেন।

বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়েছিলেন মিঃ চাকোড়ি ও মিঃ মিটি; কিন্তু সেই কিংকর্তব্য-

বিমূঢ় অবস্থা ভেঙ্গে দিলেন মিসেস্ চাকোড়ি। তিনি হঠাৎ কেঁদে ফেলে শ্যামলের দিকে ছুটে গেলেন ও তার নিদ্রিত দেহে এক প্রচণ্ড পদাঘাত করলেন।

শ্যামল বিহ্বল চোখ বড় বড় করে দাঁড়িয়ে উঠল। তবে বেশীক্ষণের জন্য নয়। মিসেস্ মিটির দিক থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে সকলে মিসেস চাকোড়ির পদাঙ্ক অনুসরণ করে একযোগে তাকে প্রহার করতে শুরু করলেন। মিসেস্ মিটির উন্মাদবৎ অট্টহাস্যের মধ্যে সে চেতনা হারাল।

তার রক্তাক্ত নিঃসাড় দেহ তাঁরা টেনে নিয়ে গেলেন পাশের ছোট ঘরের ভিতরে, যেখানে সদ্য শিকার ক'রে আনা একটা অর্ধমৃত রক্তাক্ত বন্য বরাহকে তাঁরা ফেলে রেখেছিলেন।

কয়টি মুহূর্তের মধ্যে এসব সমাধা হয়ে গেল। তারপর তাঁরা ব'সে প'ড়ে হাঁপাতে লাগলেন।

তারপর চৌকিদারকে সেখান থেকে বিদায় ক'রে দেওয়া হ'ল, খুব সকালে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়ে।

দরজা ও জানালাগুলি ভেতর দিক থেকে ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। পিছনের প্রাচীর বলয়িত কিচেন গার্ডেনে অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করা হল। তার চারিদিকে ব'সে তাঁরা পান করতে আরম্ভ করলেন। যখন আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল, তাঁরা বরাহটিকে টেনে নিয়ে এসে তাতে নিক্ষেপ করলেন ও তার গা থেকে চাকলা চাকলা মাংস কেটে নিয়ে খেতে খেতে গান গাইলেন এবং নাচলেন।

রাত্রি গভীর হওয়া পর্যন্ত।

8

আবার দরজায় আঘাতের শব্দ। মিসেস্ মিটি উঠে ব'সে জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকালেন। এখনও অন্ধকার আছে।

হঠাৎ সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে তাঁর উপর ধাওয়া ক'রে এল এক শীতল আতঙ্ক। সংক্রামিত হ'ল ক্রমে তাঁর সমস্ত দেহে। তার সমস্ত রক্ত ভরপুর ক'রে ছাপিয়ে বাকিটুকু তার যেন উপচে বেরিয়ে এল বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়ে।

তিনি ডাকলেন আর সবাইকে। চৌকিদার বুঝল তাঁরা উঠেছেন, সে দরজা ধাক্কানো থেকে ক্ষান্ত হ'ল।

রাজাসাহেব বললেন—সুপ্রভাত বন্ধুগণ! চা তৈরি করা যাক, না কী বলেন? আমি দেখি সে বজ্জাত শ্যামল কী করছে।

শ্যামলের বন্দীগৃহের দিকে রাজা সাহেব পা বাড়ালেন।

—যেও না! মিসেস্ মিটি চিৎকার ক'রে রাজা সাহেবকে বাধা দিলেন।

হকচকিয়ে গিয়ে রাজা কোনও মতে বললেন—কী—কী—কিন্তু, কে—কেন?

মিসেস্ মিটি বললেন—জানিনা, কিন্তু ধর ঘরের মধ্যে শ্যামলের বদলে যদি বরাটাকে দ্যাখ?

—কিন্তু আমরা তো কাল রাতে বরাটাকে ঝলসে খেলাম, তাই না ?

—ধর যদি ঘরের মধ্যে শ্যামলের বদলে বরাটাকে দ্যাখ ?

দীর্ঘকাল ধ'রে বিরাজ করল এক মৃত্যুশীতল স্তব্ধতা। তারপর কেউ একজন বললেন—কিচেন গার্ডেনে গিয়ে দেখি চল। বরার অনেকখানি নিশ্চয় এখনও সেখানে প'ড়ে আছে।

—দোহাই, দোহাই তোমাদের—কক্খনো না !—মিসেস্ মিটি ও মিসেস্ চাকোড়ি উভয়ে চিৎকার ক'রে উঠলেন—সেখানে যা প'ড়ে আছে তা যদি বরার না হয় ?

আবার মৃত্যুশীতল স্তব্ধতা। সবাই দেখলেন সবাই কাঁপছেন।

দুই ঘণ্টা পরে। মিঃ মিটি জীপ চালাচ্ছিলেন। কয়েকটি বালির বস্তার মত আর সবাই প্রাণহীন হয়ে বসেছিলেন।

রাজা সাহেব হাসবার চেষ্টা ক'রে বললেন—কী অদ্ভুত তোমার কল্পনা—বা—স্বপ্ন, মিসেস মিটি। যাই হোক না কেন, তুমি আমাদের রক্ত হিম ক'রে দিলে। তুমি বাস্তবিকই অদ্ভুত !

মিসেস্ মিটি বা আর কেউ কিছু বললেন না। কাজেই রাজাসাহেব আবার বললেন—আমি অবশ্য আমার ওস্তাদ চৌকিদারকে ব'লে দিয়েছি—বাস্তবিকই যদি আমরা নেশার ঘোরে দৈবাৎ কিছু ভুল ক'রে ফেলে থাকি তবে সে ব্যবস্থা করবে কিছু, যাতে ফাঁস না হয়। কিন্তু আমার এক তিলও সন্দেহ নেই যে মিসেস্ মিটির আশঙ্কা ভূতের মতই অলীক।

মিঃ চাকোড়ি ও মিঃ মিটি বললেন—তাতে সন্দেহ কী ? ঐ ঘরটা না খোলা বা কিচেন গার্ডেনে না যাওয়াটা আমাদের মূঢ়তা ছাড়া আর কিছু নয়।

—অবশ্য ভূত যে অলীক সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই—রাজাসাহেব বললেন—ঐ বাংলোতে কয়েকটি ভূতপ্রেত আছে ব'লে শোনা যায়। তারা নানারকম বিভ্রাট বাধায়। হয়তো তারাই আমাদের কল্পনাকে নিয়ে খেলা ক'রে আমাদের বোকা বানিয়ে ছাড়ল !

মিসেস্ মিটি হঠাৎ কেঁদে উঠলেন। মিসেস্ চাকোড়ি অট্টহাস্য করতে লাগলেন। অন্যেরা আবার বালির বস্তাবৎ নিস্তব্ধ হলেন।

জীপের নির্ঘোষের নিচে দুই জনের হাসি ও কান্না বার বার দলে পিষে যেতে লাগল।

বিভূতিভূষণ ত্রিপাঠি

বিভূতিভূষণ কম লেখেন, অথচ ওড়িয়া ছোটগল্পে তিনি একটি বিশেষ প্রভাব ফেলেছেন। তাঁর গল্পে সমাজের পরিবর্তনশীলতা এবং তারই মাঝে আধুনিক মানুষের প্রয়োজনের কথা থাকে বেশি। তিনি আই. এ. এস। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'সেতু'।

চন্দ্রহার

সকালে চায়ের সঙ্গে এক কঠোর সংবাদ পরিবেশিত হইল।

কাল রাত্রে বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছে। চোর-ডাকাত যে ঘরে সিঁধ দিয়া চুরি করিয়াছে তা নয়; ঘরের ঢেঁকি কুমীর! গৃহিণী প্রায় আমায় উদ্দেশ্য করিয়াই বলিতে লাগিলেন যে আমি একটি ভোলানাথ, আমি আমার আপিসের কাজ বন্ধুবান্ধব ক্লাব প্রভৃতি ছাড়া কিছুই তো জানিনা বা খবরও রাখিনা, এই অপদার্থ চাকর পূঝারীর দল লইয়া এত বড় সংসার চালানো যে কী কঠিন ব্যাপার তা যে ভুক্তভোগী বা যিনি চন্দ্র সূর্য গড়িয়াছেন তিনি জানিলে জানিতে পারেন, আমাকে বলার কোনো অর্থ নাই, কিন্তু নিজের শোবার ঘরের খাটের তলা হইতে যখন জিনিষ অপহৃত হইয়াছে তখন সে কথা নিতান্ত বাধ্য হইয়াই আমাকে বলিতে হইতেছে, কারণ পুলিসকে খবর দিতে হইবে বা কী করিতে হইবে তা আমার জানিবার কথা—এ সকল সরকারী ব্যাপার···কানে পৌঁছাইয়া দিলেই তাঁর ছুটি।

যুগপৎ বিস্ময় ও আতঙ্কে স্তব্ধ হইয়া গেলাম। আমার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। এ কী কথা, শোবার ঘরের খাটের নিচ হইতে? কী কী চুরি গিয়াছে?

জগুআর মায়ের চন্দ্রহার···চারনরী হার—পনের ভরি। দুই বছরের মাহিনা জমাইয়া আমাদের সেকরার কাছে গত বছর যে চন্দ্রহার গড়াইয়াছিল, তাহাই। একটা ছোট টিনের বাক্সে তালা দিয়া শোবার ঘরের খাটের নিচে রাখিয়াছিল। গিন্নী-মায়ের মাথার নিচ হইতে জিনিষ লইয়া যাইবে এত সাহস কার···কিন্তু কাল রাত্রে এ অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। বাক্স খোলা, তাতে চন্দ্রহার নাই। জগুআর মা

গোয়াল ঘরে বসিয়া বসিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। উপায় আর কী. ফোনের দিকে হাত বাড়াইলাম।

গৃহিণী তো প্রায় তাড়া করিয়া আসিলেন—থাক্ থাক্, ফোন করার আগে ব্যাপারটা একটু বুঝতে চেষ্টা কর।

বলিলেন—এতক্ষণ ধরিয়া তিনি যা বলিলেন তার তাৎপর্য বুঝিবার ক্ষমতা আমার লোপ পাইয়াছে, দিনরাত সরকারী ফাইল চষিয়া চষিয়া আমার বুদ্ধিশুদ্ধি আর নাই। আহা, পুলিসকে কী বলিবে—বললাম না, ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়েছে? বাড়ীর দিকে একবার তাকাও।

ঘরের যে দরজাটা দিয়া বাড়ীর উঠান দেখা যায় সেটা খোলা ছিল, সেইখান দিয়া তাকাইলাম। উচ্ছব-অ গামছা পরিয়া ধপধপে পরিষ্কার পইতায় চাবির গোছা ঝুলাইয়া দুপ দুপ করিয়া রান্নাঘরের ভিতর ঢুকিতেছে, স্নানের ঘর হইতে রঙ্ক-র কাপড় কাচার শব্দ শোনা যাইতেছে, জগুআর মা তো গোয়ালঘরে। আর কি দেখিব?

গৃহিণী কাছ ঘেঁষিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিলেন ও সরলভাবে কতকগুলি ঘরের কথা বলিলেন যার মর্ম মোটামুটি এইরূপ। এ কাজ রঙ্ক-র, আর কারও নয়। উচ্ছব অ তো ছেলেবেলা হইতে এই বাড়ীতে মানুষ, তার হাতে বাড়ীর সব সম্পত্তি নিশ্চিন্তে ছাড়িয়া দিয়া যাওয়া যায়। তার কথা মোটে ওঠেই না। জগুআর মা তো জগুআর মা—বেচারী দুঃখিনী গরিব বিধবা মেয়ে। মহাপ্রসাদ সাক্ষী করিয়া গৃহিণীর ধর্মমেয়ে হইয়াছে। কত কষ্টে পেট মারিয়া মাহিনার পয়সা জমাইয়া একটি কোমরের বিছেহার করিয়াছিল, ভালো করিয়া এখনো পরেও নাই। বাক্সয় যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। যাত্রামচ্ছব পালপার্বনে এক আধবার পরিয়া থাকিবে। রঙ্ককে জগুআর মা কাছে ঘেঁষিতে দেয় না। একদিন কাঁদিয়া বলিল—মা, আমায় বিদায় করিয়া দাও, এই রঙ্কর জ্বালায় আমি আর এখানে থাকিতে পারি না। রঙ্ক এ কথা শুনিতে পাইল, সেইদিন হইতে তার আক্রোশ। সেই এ কাজ করিয়াছে। সে ছাড়া আর কেউ নয়।

বুঝিতে আমার গোলমাল হইয়া গেল। প্রত্যাখ্যাত প্রেমের এতো এক বিচিত্র পরিণাম! এ তো চমৎকার গল্পের খোরাক যোগাইবে। আমার কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল। সিগারেট ধরাইয়া বলিলাম—হাঁ, তারপর?

—তারপর আর কী? পুলিসে শিগগির খবর দাও, তারা এসে খানাতল্লাস করুক। মেয়েটার পনের ভরির জিনিষটা কি বাড়ী থেকে উপে গেল নাকি?

ফোনে পুলিস ইনস্পেক্টারকে সংক্ষেপে ঘটনাটা বিবৃত করিলাম। আপিসেরও বেলা হইয়াছে। পুলিস তাহাদের কর্তব্য করিবে। আমার ইহাতে ভাবিবার বা বলিবার কী আছে। আপিসে বাহির হইলাম।

মাঝে একবার ইনস্পেক্টারের ফোন—আমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে তো তাহারা রাঁধুনী ঠাকুর, চাকর ও জগুআর মাকে থানায় লইয়া যাইতে চাহে। আমার ইহাতে কেনই বা আপত্তি হইবে? তাহাই জানাইলাম।

আপিস হইতে বিলম্বে বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম উচ্ছব-অ ঠাকুর রান্নাঘরে। গৃহিণী প্রসাধনরতা। জগুআর মা ছেলেকে লইয়া বাহিরে খেলা দিতেছে। আর রঙ্ক? রঙ্ককে তারা থানায় আটকাইয়া রাখিয়াছে। উচ্ছব-অ ও জগুআর মা এক ঘণ্টার মধ্যেই থানা হইতে ছাড়া পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। রঙ্ক তখন হইতেই সেখানে—স্নানও করে নাই, খায়ও নাই।

রাত আটটায় রঙ্ক ফিরিল। আমি গোপনে একবার তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—মুখ শুকাইয়া পোড়া কাঠ হইয়াছে। চুপচাপ সে তার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বাহিরের বারান্দায় আরাম কেদারায় শুইয়া শুইয়া আমি সমস্ত ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। প্রায় এক বছর হইল রঙ্ক এ বাড়ীতে কাজ করিতেছে। একদিনও তার কাজে কোনো ত্রুটি চোখে পড়ে নাই। কিছু বলিতে হয় না, তাগাদা করিতে হয় না। কে আসিল গেল তার তত্ত্ব নেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ছেলেপুলেদের কথা, গাই-গোয়াল, বাসন মাজা, কাপড় কাচা বাজার হাট সবটাতে রঙ্ক। সে কখন স্নান করে কখন খায় কেহ জানে না। রাত না পোহাইতে তার কাজ শুরু হইয়া যায়। সকালে আমরা উঠিবার সময় রাশি রাশি বাসন মাজা হইয়া থাকে থাকে রাখা হইয়া যায়। ধোয়া মাজা সারিয়া তারপর বাজার। সেখান হইতে ফিরিয়া ছোট খোকাকে স্নান করাইয়া জামা কাপড় পরানো, তার পরে গ্যারেজে গাড়ী মোছা—রেডিয়েটার খুলিয়া জল দেখা, জুতায় কালি লাগাইয়া নিজের হাতে আমায় জুতা-মোজা পরাইয়া তারপর তার মায়ের কাজ, ছেলেপুলেদের কাজ, বামুন ঠাকুরের ফরমাস, কাপড় কাচা, গোয়াল সাফ করা—বেলা গড়াইয়া যায়, তার মা চেঁচাইয়া বলেন—ওরে, এবার চান কর, ভাত বাড়া হয়েছে। উচ্ছব-অ তার ভাত বাড়িয়া দিয়া নিজে খাইতে বসে, রঙ্ক খাইতে বসিতে বেলা তিনটা।

মাঝে মাঝে ভাবি, রঙ্ক না থাকিলে এ বাড়ী চলিত কেমন করিয়া? যখন তার উপরে মনটা অতিশয় প্রসন্ন হইয়া উঠে ভাবি লোকটা তো তার নিজের পরিসরের মধ্যে একটা মহৎ লোক। আপত্তি নাই অভিযোগ নাই রাতদিন খাটিয়া চলিয়াছে। মুখে কথা নাই, নিজের কথা বলিয়া বেড়ানো নাই। তার কাজে খুঁত ধরিতে বা বিরক্ত হইতে কাহাকেও সে এক তিল সুযোগ দেয় না। আত্মসম্মানজ্ঞান আছে বটে লোকটার। এমন নীরব কর্মী যদি সব ক্ষেত্রেই মিলিত তা হইলে দেশটা—

হঠাৎ চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। গৃহিণী বলিতেছেন—তুমি এইখানে ব'সে আছ আর আমি ওদিকে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। আজ কি খাওয়া দাওয়া হবে না? রাত তো অনেক হ'ল। জিজ্ঞাসা করিলাম—রঙ্ক খেয়েছে?—না। গৃহিণীর কণ্ঠে পূর্বের উত্তাপ নাই।—মানুষটা তাহ'লে সারাদিন উপোস ক'রে রইল?—আমি তো ডেকে ডেকে এলাম, তুমি এবার চেষ্টা ক'রে দ্যাখ। উঠিয়া গেলাম। রঙ্কর ঘর অন্ধকার, কবাট ভেজানো রহিয়াছে। ডাকিলাম—রঙ্ক।—আজ্ঞে?—আরে খাবি আয়, সারাদিন খাস্‌নি যে। উত্তর নাই। অন্ধকার ঘরে চাপা নিঃশ্বাস আর

গুমরানি শোনা যাইতেছে। দরজা অল্প ফাঁক করিয়া ভিতরের দিকে তাকাইলাম। বালিশে মুখ গুঁজিয়া রঙ্ক ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। পিছন পিছন গৃহিণী। জগুআর মা কী করছে?—জিজ্ঞাসা করিলাম।—সে ঘরে শুয়ে আছে, তার মাথা ঘুরছে, সেও খাবে না।—আর তুমি?—আমার কথা ভাবতে তোমায় কে বলছে? ছেলেপুলের ঘর, এতে আমার গলা দিয়ে ভাত নামবে?

ফোন তুলিয়া থানায় ডাক দিলাম। থানাবাবু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—কিছু ক্লু পাচ্ছি না স্যার্, তবু চেষ্টা চলেছে। চোরাই মাল যারা রাখে তেমনি কয়েকটা জায়গায় তাঁহারা নজর রাখিয়াছেন। যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি নাই, যা কিছু সম্ভব সব করা যাইতেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। বাতি নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িলাম। গৃহিণী জানেন এমনি অবস্থায় আমাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করা বৃথা। পাশের ঘরে তিনি ছেলেদের লইয়া শুইলেন।

বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতে করিতে একটু নিমঘুম আসিয়াছিল বোধহয়। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আস্তে চাপা গলায় কে ডাকিতেছে—মা—মা। এ তো রঙ্কর গলা। সঙ্গে সঙ্গে শুনিলাম গৃহিণী বলিতেছেন—কে, রঙ্ক? কী রে? কিছুক্ষণ চুপচাপ। গৃহিণী আবার বলিলেন—কী রে, কী বলছিস্? খাবি যা, তোর ভাত আলাদা ক'রে রান্নাঘরে রেখে দিয়ে এসেছি।—মা আমি যাচ্ছি।—কোথায় যাবি? তোর মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?—না না, আমি আর চাকরি করব না, রাত পোহালেই আমি চ'লে যাব।—আচ্ছা, যাবি তো যাবি, সকালটা হ'তে দে, বাবু উঠুন। তোর দুই মাসের মাইনে হয়েছে, টাকা পয়সা বুঝে নিবি, তবে না যাবি। রঙ্ক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল—মা, আমার মাইনের টাকা জগুআর মা'কে দিয়ে দেবেন। গৃহিণী চুপ। আমিও চমকিয়া উঠিলাম। তা হইলে রঙ্ক কি—

রঙ্কর শেষ কথা কানে আসিল—মা, তোমায় পেন্নাম হই। বাবুকে পেন্নাম হই। মা—মা, আমি যাচ্ছি। আর সে কিছু বলিতে পারিতেছে না। কণ্ঠস্বর বিকৃত শোনাইতেছে। যেন অঝোরে কাঁদিতেছে লোকটা।

যাইতেছে, যাক। লোকটা সত্যই কী ভয়ঙ্কর! সকলের চোখে ধুলা দিতে পারে। উঠিব নাকি? থানায় জানাইয়া দিব নাকি? সত্বর আসিয়া গ্রেফতার করিয়া লইয়া যাক। কিন্তু উঠিতে পারিলাম না। এ আলস্য না আর কিছু? মাথার ভিতরে কেমন যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। আচ্ছা থাক্, সকাল হোক।

সকালে বিলম্বে নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া শুনিলাম রঙ্ক আর কেহ উঠিবার আগেই চলিয়া গিয়াছে। আমাদের দেওয়া জিনিষপত্র কিছু নেয় নাই। পাটনা হইতে যে লাল কম্বলটা তাকে আনিয়া দিয়াছিলাম সেটা ভাঁজ করিয়া একটা কোণে রাখিয়া দিয়া গেছে।

বন্ধুবান্ধবেরা বলিলেন আমি একটি আস্ত বোকা, জানিয়া শুনিয়া চোরকে হাতছাড়া করিয়া দিলাম।

—এটা দয়া নয়, দয়ার অপপ্রয়োগ দ্বারা পাপকে প্রশ্রয় দান।

সব শুনিলাম, তবু মনের গ্লানি দূর হইল না। রঙ্কর সেই অস্পষ্ট অবরুদ্ধ কণ্ঠ—মা, আমি যাচ্ছি—মাঝে মাঝে কানে বাজিয়া উঠে, আমি অন্যমনস্ক হইয়া যাই।

সবই আবার আগের মত চলিতে লাগিল। নূতন চাকর আসিল। রঙ্কর অভাব ক্রমে ক্রমে গা-সহা হইয়া আসিল। একটির পর একটি দিন যাইতে লাগিল।

প্রায় মাস খানেক পরে। আপিস হইতে ফিরিয়া দেখি বাড়ীটা কেমন অদ্ভুত রকম চুপচাপ। কাউকে কোথাও দেখা যাইতেছে না। ড্রইংরুম পার হইয়া ভিতরে আসিয়া দেখি চেয়ারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন গৃহিণী। পায়ের কাছে জগুআর মা চোখে আঁচল চাপিয়া কাঁদিয়া ভাসাইতেছে। মেঝের উপর রহিয়াছে তাহার চন্দ্রহার। গৃহিণী উঠিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অতি অল্প কয়টি কথায় আমাকে বুঝাইয়া দিলেন সমস্ত রহস্য। মাস দুই তিন আগে আমাদের বাড়ীতে কোনও এক উপলক্ষে অনেক লোক আসিয়াছিল খাইতে, অনেক স্ত্রীলোকেরাও। সেদিন জগুআর মায়ের ভাইঝি আসিয়াছিল। তার কোমর খালি দেখিয়া জগুআর মা তাড়াতাড়িতে তার গিন্নী মায়ের আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া লইয়া বাক্স খুলিয়া তাহার চন্দ্রহার বাহির করিয়া ভাইঝির কোমরে পরাইয়া দিয়াছিল। তার পরদিন ভাইঝি গেল জামাইয়ের সঙ্গে পুরী। জামাই সেখানে কাজ করে। কাল রাত্রে সে ফিরিয়াছে। আজ আসিয়াছিল পিসীকে দেখিতে, চন্দ্রহার ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছে। জগুআর মার ভোলা মন, কিছু মনে থাকে না।—রঙ্কর দুই মাসের মাইনে? গৃহিণী জানাইলেন যে তার দুই গুণ টাকা তার বাড়ীর ঠিকানায় তিনি আজ মণি অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম সে কি তার দেশের বাড়ীতেই আছে এখনো?

ভারী গলায় গৃহিণী বলিলেন—আমি জানি সে সেখানে আছে। সে আর কোথাও চাকরি করবে না। আমায় সে ব'লে গেছে।

অরণ্য ও উপবন

কৃষ্ণপ্রসাদ মিশ্র (1933—)

ওড়িয়া ছোটগল্পে এক উল্লেখযোগ্য নাম। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক কৃষ্ণপ্রসাদ কিছু উপন্যাসও লিখেছেন। আধুনিক মানুষের বিচিত্র পরিস্থিতিতে দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের কথা তিনি লেখেন মনোরম বর্ণনার মাধ্যমে। তাঁর গল্পগ্রন্থ: 'মান্নবাটি রাত্রি', 'ক্রিতদাসীর কাব্য', 'অরণ্য ও উপবন', উপন্যাস: 'নেপথ্যে'।

রাস্তার উপরে চোখ। রাস্তার দুই ধারে বনানী। ঘণ্টায় আশি কিলোমিটার বেগে পিছনে পড়ছে দুই পাশের শাল পিয়াল, সেগুনের বন; কিন্তু আরো বেগে সেই আরণ্য দ্রুমগুলিকে পিছনে ফেলছে যে ট্রাকখানি সেটা আসছে পিছন থেকে। ট্রাকের সামনে অভয়পাণি গুরু নানকের ছবি টাঙ্গানো থাকলেও পাঞ্জাবী ড্রাইভারদের বিশ্বাস নেই, হুঁশ না-থাকা অবস্থায় তাঁরা গাড়ী চালায়। যোগেশ তার গাড়ী স্লো ক'রে ট্রাককে পথ ছেড়ে দিল। কাঠ বোঝাই ট্রাকটি তীব্রবেগে বেরিয়ে গেল—অ্যাম্ব্যাসাডার গাড়ীখানির সামনে রীল থেকে রিবনের মত রাস্তা খুলে দিতে দিতে। অ্যাম্ব্যাসাডার আবার উঠল আশিতে। বিশাল ট্রাকটাকে দূরে ছোট হয়ে আসতে দেখতে দেখতে যোগেশ রত্নাকে বলল—রত্না, তোমায় আজকাল একটু মোটা দেখাচ্ছে। তোমার ব্লাউজগুলো কত টাইট্ হয়ে গেছে দেখেছ তো? তোমার কোন বন্ধু তোমায় এ বিষয়ে কিছু বলেন নি?

বাঁ দিকের ঝাড়জঙ্গলের দিকে চেয়ে চেয়ে রত্না বলল—আমি কী করব বল। ছেলেটা ছোট, এখনই কি ডায়েটিং শুরু করব নাকি? ছেলে হবার পর মেয়েদের খিদে বেড়ে যায়। তায় আবার ব্রেস্ট্ ফীডিং করতে গেলে তো দুধ দই ছানা মাছ মাংস খেতে হবে, নইলে বুকে দুধ আসবে কোত্থেকে? মা ডায়েটিং করলে তার দুধে প্রোটিন ভিটামিন এসব যথেষ্ট পরিমাণে থাকবেই বা কী করে?

পথে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে গান গাইতে গাইতে তার তালে তালে পা ফেলে চলতে থাকা যুবতীদের উন্নত সুপুষ্ট স্তনগুলির দিকে চেয়ে যোগেশ বলল—তোমাকে

আমি ব্রেস্ট্ ফীডিং করতে বারণ করেছিলাম। লেডী ডাক্তার লাবণ্য দেবীও এসে আমার কথার যথার্থতা সম্বন্ধে তোমাকে বুঝিয়েছিলেন। তবু তুমি শুনছ না। তুমি আর আমি বেশ আছি। মাঝথেকে বাচ্চাটাই যা রোগা হয়ে যাচ্ছে। প্রোটিনগুলো তোমার দুধের সঙ্গে ছেলের গায়ে না লেগে তোমার গায়েই জমা হয়ে যাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে আমার!

রত্না ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে চাইল। পিছনের সীটে ছেলে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সত্যি ছেলেটা বড় রোগা, বড় রিকেটি। রত্না দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আবার তাকাল সামনে।

—আমি বলছি, বেবি ফুড দাও, বট্‌ল্ ফীডিং কর। দেখবে ছেলেটার স্বাস্থ্য কেমন ফিরে যাবে। আমি দেখেছি আমার এক বন্ধুর ছেলেকে। বেবি মিল্‌ক্ ফুডের দৌলতে সে ছেলে কী হয়েছে!

—ছেলেপিলের হ্যাঙ্গাম কিন্তু সত্যি ভারী হ্যাঙ্গাম। রত্না বলল, বহু মূল্যবান্ শাড়ীতে ঘুমন্ত প্রস্রাব ক'রে দেওয়া বমি ক'রে দেওয়া এবং রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাতের কথা মনে ক'রে।

—দ্যাখ, এই আমাদের প্রথম সন্তান, আর দশ বছরের মধ্যে তোমার দ্বিতীয় সন্তান হচ্ছে না। তোমার স্বাস্থ্য সৌন্দর্য মানসিক শান্তি আর আমার কাজকর্ম—সব দিক থেকেই আমরা আর সন্তান এখন হ'তে দেব না। কিন্তু প্লীজ্, এই একটিকে হ্যাঙ্গাম ভেবে নয়, আদরের ধন মনে ক'রে মানুষ করো।

অ্যাম্বাসাডার দ্রুতগতিতে চলেছে। দুই ধারে ভয়ানক বন। বনের নগ্ন সৌন্দর্যে রত্না যেন সম্মোহিতের মত ব'সে আছে। যোগেশ হঠাৎ বলল, রত্নাকে কাছে ঘেঁষে আসতে। রত্না যোগেশের কথায় বিরক্ত হলেও তার কথামত কাছ ঘেঁষে ব'সে তার কোলে হাত রাখল।

—বনের মধ্যে গাছ আর লতা আলাদা থাকে না, রত্না!

সোজা রাস্তা। সামনে পিছনে কোনো ট্র্যাফিক্ নেই দেখে যোগেশ রত্নাকে টেনে নিয়ে চুমু খেল। একটা হাত তার স্টিয়ারিং-এর উপর। রত্না খুশিতে হাসল। যোগেশ তার গা থেকে হাতটা নামিয়ে এনে স্টিয়ারিং-এর উপর রেখে সামনের মোড় ঘুরবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। মোড়ের মাথায় রত্না তার গায়ের উপর এসে পড়বার সময় সে বলল—আমি তোমাকে সব সময় সুখে রাখতে চাই রত্না।

তার মুখের কথা শেষ হ'তে না হতে জঙ্গলের ভিতর থেকে হাতে টাঙ্গি নিয়ে রাস্তায় এসে উঠল একটি যুবতী। ক্ষণিকের জন্য যোগেশের সঙ্গে তার চোখে চোখে মিল হ'ল, তার পরেই দু'জনের চোখের সামনে আবার গাছপালা জঙ্গল পাহাড়। গাড়ীর আয়নায় দেখবার চেষ্টা করল যোগেশ। যুবতী পিছনে পড়েছে, কিন্তু যুবতীর সঙ্গে পিছনের সমস্ত জগৎ সংসার তার কাছে দুলছিল যেন। সে অন্যমনস্ক হ'ল। এই মেয়েগুলো সকলেই একরকম দেখতে নাকি? একই রকম শরীর, একই রকম মুখ, একই রকম স্বাস্থ্য। রত্না কিন্তু যোগেশের অন্যমনস্ক ভাব

লক্ষ করেনি। হঠাৎ রোদটা বড় যোগেশের চোখে লাগতে শুরু করল। 'লকার্'-এর খোলা তাকের উপর থেকে তার গগল্‌স্ বার ক'রে পরল সে। রত্নারটাও বার ক'রে রত্নাকে দিয়ে বলল—সূর্য উঁচুতে উঠেছে, এবার রোদ বাড়বে, গগ্‌ল্‌স্‌টা প'রে নাও।

—কিন্তু খালি চোখে আমার জঙ্গলের এই রহস্যময় সৌন্দর্য দেখতে ভাল লাগছে।

—কিন্তু তোমার সুন্দর টানা টানা চোখ দুটি জঙ্গলের চেয়েও বেশী রহস্যময় ও সুন্দর, রত্না। ও দুটির কথা ভাবতে হবে আমাকে। ওরা রোদের ঝাঁজে কষ্ট পাবে তা আমি সইব কেমন করে? নাও, প'রে ফেল।

রত্না তার গগল্‌স্ প'রে আবার জঙ্গল দেখতে লাগল। একটু আগে টাঙ্গি নিয়ে চলতে থাকা সেই যুবতীটির কথা মনে পড়ল যোগেশের—কিন্তু তার কথা সে ভুলে ছিলই বা কখন? কেবল তা মনে না আনতে চেষ্টা করেছিল কিছুক্ষণের জন্য।

কাল রাত্রে পোলাও আর মুরগীর মাংস দিয়ে ভোজ খাওয়ার পরে সে ডাক-বাংলোয় ফিরে এসে রত্না ও সুমন্তর শোবার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে জঙ্গল ইন্সপেক্‌শনে আবার বেরিয়ে গিয়েছিল। জঙ্গল ইন্সপেক্‌শন তো যাই হোক করতেই হবে, সেইজন্যই তো এতদূর এত পেট্রল পুড়িয়ে আসা। সঙ্গে ছিল পুরানো চাপরাশী দাণ্ডাসী। আর সেই চাপরাশী ঠিক এই টাঙ্গিধারিণী যুবতীর মতই একটি যুবতীকে এনে জঙ্গলের মধ্যে যোগেশের বিশ্রামাগার এক কুঁড়ে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল—যখন সেখানে বিশ্রাম করছিল যোগেশ। সেই জঙ্গলের দিকে ইন্সপেক্‌শনে এলে প্রতিবারই দাণ্ডাসী এমনি ক'রে থাকে। তবে অন্যান্য বার বাংলোতেই ব্যবস্থা হয়, এবার রত্না ও সুমন্ত আসায় বাংলো থেকে কিছু দূরে এই কুঁড়ে ঘরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখতে হয়েছিল দাণ্ডাসীকে। দিনের বেলাই সুযোগ বুঝে যোগেশ বলে দিয়েছিল তাকে কুঁড়ে ঘরের কথা।

জঙ্গল পাতলা হয়ে আসছিল। চারিদিকে ক্রমশঃ দেখা দিচ্ছিল ভাগ ভাগ ক'রে বন্দে বন্দে কাটা জমি, ফসলের জন্য তৈরী। কিন্তু এসব অঞ্চলে বৃষ্টি হয় না, তাই ভাল ফসলের কথা ওঠে না।

আশ মিটিয়ে তাকে উপভোগ করার পর যোগেশ কুঁড়ে ঘর থেকে বেরুতে যাবে, যুবতীটি তার হাত ধ'রে টেনে বললে—বাবু, তুই কোনোবার তো আমায় কিছু দিস্ না, আমার ছেলেপিলের চলবে কী ক'রে? তোর ছেলেপিলের চলবে কী করে?

যোগেশ কিছু বুঝতে না পেরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তার কথা শুনে। ঘরের মধ্যে একটি তেলের কুপি জ্বলছিল কেবল। জঙ্গলের অন্ধকার সেই আলোকে উপহাস ক'রে কেবল নিজেকেই দেখানো ছাড়া আর কিছু দেখবার অনুমতি দিচ্ছিল না যেন। যোগেশ যুবতীটির দিকে চেয়ে দেখল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গী স্ত্রীলোকটি তার কাছে সোজা হয়ে কোনো সঙ্কোচ না ক'রে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। তার ছোট লাল শাড়ীটি একটু দূরে প'ড়ে আছে এক তাল অন্ধকারের মত। ভাল করে দেখবার জন্য টর্চটা তার মুখের দিকে ফিরিয়ে যোগেশ সুইচ টিপল। টর্চের আলোয়

মেয়েটি চোখ বুঁজে ফেলল। যোগেশ তার মুখটা ভালো ক'রে দেখে আলো নিবিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কোনবার? কিসের কথা বলছিস্ তুই? কার ছেলেপিলে?

—বাবু, তোরই ছেলেপিলের কথা বলছি। তুইতো যতবার এসেছিস্ ততবার আমি তোর কাছে এসেছি। হ্যানো দেবে ত্যানো দেবে বলে দাণ্ডাসী সববার আমায় টেনে নিয়ে আসে। আর কার ছেলেপিলের কথা বলব? আমার স্বামী না নেশার ঘোরে থাকে, কিছু টের পায় না। তা ও ছেলেপিলেগুলো তো তোর ছেলেপিলে, তারা ভিক্ষে মেগে খাবে তা কি ঠিক?

কুঁড়ে ঘরের কবাট ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সেই সময় দাণ্ডাসী ভিতরে ঢুকল। বাতাসে কুপিটা নিবে গেল। দাণ্ডাসী বাইরে দাঁড়িয়ে যোগেশের জন্য অপেক্ষা করছিল, তাদের কথা শুনছিল। স্ত্রীলোকটির কথাগুলো আর বুঝি তার বরদাস্ত হ'ল না। বাবু যদি রেগে যান তাহ'লে বনের ঝিঁঝির ডাক শালের গুঁড়ির উপরে কুড়ুলের চোটের মতন শোনাতে কতক্ষণ? দাণ্ডাসী লাভ লোকসান বোঝে।

—বজ্জাত মেয়েমানুষ! কীসব মিছে কথা জুড়েছিস্ রে? স্ত্রীলোকটির হাতের বাজু ধ'রে ঝাঁকানি দিয়ে সে বললে—কী মিছে কথা বলছিস্ তুই? শালী, কত লোকের কাছে শুয়েছিস্ কে জানে, তোর গেরস্ত তোকে কত লোকের কাছে পাঠায় তার ঠিক নেই, বলছিস্ কিনা বাবুর ছেলেপিলে? মিছে কথা ব'লে বাবুকে হয়রান করবি? চল্ তোর গেরস্তর কাছে।

স্ত্রীলোকটি দাণ্ডাসীর কথায় বুঝি বড়ই ভয় পেয়ে গেল। তার শাড়ীটা অন্ধকারে কখন সে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিল।

—কিন্তু আমার বাকী পয়সা...

—থাম্! আমি তোকে দেব তোর বাকী পয়সা। আমি তো তোকে বলেছিলাম সব পয়সা আমি দেব। বাবুর কাছে চাইতে তোকে কে বলেছে?

সে কথারও প্রতিবাদ না ক'রে যুবতী দাঁড়িয়ে রইল। যোগেশ তার হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে আস্তে বলল—সাবধানে রাখিস্, পাঁচ টাকা দিলাম।

দাণ্ডাসী তারপরে যুবতীটিকে অন্ধকারে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

আড়চোখে যোগেশ চাইল রত্নার দিকে: কিছু শুনতে পায়নি তো রত্না? ভাবতে ভাবতে সে মুখ খুলে কোনো কথা ব'লে ফেলেনি তো? হাওয়ায় রত্নার কপালের কয়গাছি চুল উড়ছিল ফুরফুর ক'রে। ঢুলছিল সে। চুলগুলি ঠিক ক'রে দিতে ইচ্ছে হ'ল যোগেশের। ধবধবে ফরসা সুন্দরী এই মেয়েটিকে সত্যি কতই না ভালবাসে সে!

ঘড়ি দেখল যোগেশ। দশটা বাজতে আরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকী। দশটা বাজলে সে রত্না আর সুমন্তকে ঘুম থেকে তুলবে, গাড়ী রাস্তার পাশে রেখে সবাই মিলে ব্রেকফাস্ট খাবে। রাস্তার ধার, জঙ্গলের কিনারা, চমৎকার লাগবে। সব বোধহয় রেডি করে রাখাই আছে মোটরের পিছনে। চা আনতেই যা তারা ভুলে গেছে, তবে কিছু অসুবিধা হবে না। তিনখানা পাথর সাজিয়ে তার উপর কেটলি

চাপিয়ে শুকনো কাঠ পাতা দিয়ে আগুন জ্বাললেই জল গরম হবে। বরং ব্রেকফাস্টের সঙ্গে অমনি ক'রে চা বানিয়ে খেলেই আরো মজা লাগবে। রত্নার অনেকদিন মনে থাকবে সে কথা।

* * * * * *

যোগেশের ধূলিধূসরিত অ্যাম্ব্যাসাডারখানা যখন বাড়ী এসে পৌঁছাল তখন প্রায় বিকাল চারটে। যোগেশ গেটের কাছে গাড়ীটা থামিয়ে হাত দুটো তুলে আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে দেখে গেটটা হাট ক'রে খোলা, বাগানের ভিতরে দুটো খুব হৃষ্টপুষ্ট হরিয়ানা গরু তার জবাফুলের গাছগুলো নেড়া ক'রে দিতে লেগেছে। গাড়ীর দরজা খুলে সে পাগলের মত বাগানের ভিতরে ছুটে গেল। ভীষণ চিৎকার করতে করতে ইঁট পাটকেল কুড়িয়ে সে গরু দুটোর উপরে ছুঁড়তে লাগল। আশ্চর্যের কথা তার প্রচণ্ড রাগ সত্ত্বেও ঢিলগুলো গরু দুটোর গায়ে না লেগে এদিকে ওদিকে পড়তে লাগল এবং গাই দুটি নিশ্চিন্তভাবে খেয়ে যেতে লাগল। যোগেশের চোখের সামনে তার বহু বৎসরের সাধনার ফল নষ্ট হয়ে যেতে থাকল। তার বহু বৎসরের যত্নে বহু অর্থের বিনিয়োগে গ'ড়ে ওঠা বহু বন্ধুপত্নীর প্রশংসাপ্রাপ্ত সাধের বাগানটি ধ্বংস হ'তে থাকল। গরু দুটোর একেবারে কাছে আসার পর তার অনেকটা ঢিল তাদের গায়ে লাগল, তখন তারা গম্ভীর চালে হেলতে দুলতে বেরিয়ে রাস্তায় চলে গেল। সুমন্তকে কোলে নিয়ে রত্না তখন গাড়ী থেকে বেরুচ্ছে। হৃষ্টপুষ্ট গরু দুটোকে রাস্তায় উঠতে দেখে সে আবার গাড়ীর ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। ভিতরে ব'সে ব'সে সে প্রায় কান্নার সুরে চিৎকার করতে লাগল—কোন হতভাগা এমনি ক'রে গেট খুলে রেখেছিল! কার হিংসেয় ঘুম হচ্ছিল না! পূজারী সে গেল কোথায়? কোথায় গেল সে চাপরাশী? দু'জনে হয়তো পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছে, বাগান উজাড় হয়ে যাক, তাদের কী? মাইনেটা পেলেই হ'ল। মানুষ চাকর বাকরের উপরে বিশ্বাস ক'রে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে যায় এই জন্য!

যোগেশ উদ্‌ভ্রান্তের মত রত্নার দিকে চেয়ে তারপর মুড়িয়ে যাওয়া কোনিফেরাস জাতীয় তার দুর্লভ গাছগুলির দিকে তাকাল। জবা ফুলের গাছগুলিও নেড়া হয়ে গেছে। জিনিয়া ডালিয়ার বেড-এ গরুর খুরের ছাপ, এখানে ওখানে গোবর।

* * * * * *

যোগেশ স্নান ক'রে বেড্-রুমে সে মাসের 'ফেমিনা'-খানা কোলের উপরে নিয়ে ব'সেছিল। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার, টেবিলের উপরে টেবল ল্যাম্পটা কেবল জ্বলছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে 'ফেমিনা'র পাতা ওলটাতে ওলটাতে যোগেশ ট্র্যানজিস্টার খুলে কটক স্টেশন ধরল। রত্না কিন্তু তখন 'কটক স্টেশনে গান নেই কেবল আঞ্চলিক সংবাদ' ব'লে বিছানায় শুয়ে সুমন্তকে স্তন্যপান করাতে করাতে প্রতিবাদ করল। আঞ্চলিক সংবাদ তখন বলছে—ওড়িশার পশ্চিমাঞ্চলের জঙ্গলে অভূতপূর্ব অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় এক লক্ষ টাকার বহু মূল্যবান শাল পিয়াশাল

সেগুন কাঠ পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। আগুন লাগার কারণ জানা যায় নি, তবে হাইওয়ের দিক থেকে আগুনটা লেগেছিল মনে হয়। কারণ সেইদিকের জঙ্গলই অনেকখানি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বৃষ্টি হ'য়ে প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়া আগুন নিভে না গেলে······

শান্তনু কুমার আচার্য (1934—)

বিচিত্র ধর্মী উপন্যাস রচনার অগ্রদূত শান্তনু কুমার। বর্তমানে ওড়িয়া পুস্তক পর্ষদের সম্পাদক। তাঁর উপন্যাস 'নরকিন্নর' ও 'শতাব্দীর নচিকেতা'-য় বর্তমান সমাজের সময়ের বিসঙ্গতি থেকে উদ্ভূত সমস্যার কথা বিবৃত হ'য়েছে অতি সূক্ষ্মভাবে। নগর জীবনে সর্বহারা ও ঐশ্বর্যবানদের জীবন সংগ্রামের কথা লিখেছেন তিনি তাঁর নানা রচনায়। ছোটগল্পেও তাঁর এই মানসিকতার প্রকাশ। ছোটদের জন্য তিনি লিখে থাকেন বিজ্ঞানধর্মী গল্প। তাঁর গল্পগ্রন্থ : 'দরবার' ; উপন্যাস : 'মো কথাঘোড়া কথা কহে'।

দুর্বার

নাঃ, ওটাকে মারতেই হবে। বড় অস্থির ক'রে তুলেছে। বড় জ্বালাতন করেছে। বড় পরীক্ষা করেছে ধৈর্যের। এবার মেরে ফেলতে হবে।

আমি টেবিলের কাছে ছুটে গেলাম। এক গোছা কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলাম—

To H. E. The Governor,...

এইখানে আমি একটু থমকে থেমে গেলাম। আমার আঙুলগুলো আমার পিঠে ঝোলানো তূণের ভিতর থেকে ব্রহ্মাস্ত্রটি হাতড়ে বার করতে করতে একটু বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। একটু ভাবনায় পড়লাম আমি। একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র! কে একটু মুচকে হাসল আমার পিছন দিকে। বিরক্ত হলাম। এর মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্রের ব্রাহ্ম মুহূর্তটিও পার হয়ে গেল। আমি আমার পূর্বোক্ত লাইনটা কেটে দিলাম। কিন্তু আমি তো প্রতিজ্ঞা ভুলতে পারিনা। আমি আবার মন্ত্রোচ্চারণ করে তূণে অস্ত্রের সন্ধান করলাম—এবং পেলাম।

তারপর একটি মুহূর্তের রূপ আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সেই মুহূর্ত শেষ হবার আগেই না জানি কী প্রলয় ঘটে যাবে। কী নিদারুণ ঘড়ঘড় শব্দ করে মেদিনী প্রকম্পিত ক'রে আমার মন্ত্রিত শর সৃষ্টি ঘটাবে এক খণ্ড প্রলয় এবং চক্ষুর নিমেষে কীরকম ক'রে সে গ্রাস করবে এই মেদিনীর এক খণ্ড—হয়তো আমার পায়ের তলা থেকেই। সেই লক্ষ্যস্থল ও সেই সঙ্গে আরও কার কত লক্ষ্যস্থলকে ভেদ ক'রে সব নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে চলে যাবে সে। হয়তো সে প্রলয়ের ফল ভোগ করার জন্য

আমি নিজেও না থাকতে পারি। একটি লক্ষ্য হাসিল করার জন্য এক লক্ষ লোককে ধ্বংস করা বীরোচিত কার্য নয় বা বুদ্ধিমানের কাজও নয়। একটি বিশল্য-করণীর জন্য গোটা গন্ধমাদনটাকে তুলে আনা সময়োচিত হ'তে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে নয়।

তারপর এল সেই অবশ্যম্ভাবী মুহূর্তটি—কাটাকুটি করা, আবার লেখা।

To the Chief Minister-এর স্থানে এলেন বিভাগীয় মন্ত্রী। তিনি গেলেন। এলেন সারি সারি ধাপে ধাপে বিভাগীয় উচ্চ পদস্থ হাকিমগণ। এমনি হাজার কাটাকুটি আবার লেখালেখির মধ্যে আমি কেবল ক্রমে নেমেই চললাম, সে নামা যেন অন্তহীন। আবার দেখতে গেলে নয়ও। কারণ নামতে নামতে যেখানে গিয়ে আটকালাম সেখানে আমি যাকে আবিষ্কার করলাম সে আর কেউ নয়, সে খোদ "আমি"। তার নীচে আর নামবার পথ নেই।

সেখানে পৌঁছে যখন আমি আমাকে আবিষ্কার করলাম, আশ্চর্য হলাম দেখে যে কেননা একটা রাগে আমি কাঁপছি। সে রাগকে 'নিষ্ক্রিয় রাগ' বা inert anger ছাড়া আর কোনো আখ্যা আমি দিতে পারলাম না। আমার সেই অবস্থাকে আমি যতই আবিষ্কার করতে লাগলাম ততই কেবল আমি রাগে আরো কাঁপতে লাগলাম। কারণ কাঁপা ছাড়া আমার কিছু করবার ছিল না। আমার সব কিছুই হয়ে গিয়েছিল নিষ্ক্রিয়। আমার ধনুক, আমার তূণ, আমার হাত, আমার রথ, আর সর্বোপরি আমার রথচালক (বিবেক)। অথচ সব কিছু ঠিক ছিল, কিন্তু আমি নিষ্ক্রিয়, নিঃসহায়, আর অবশ। আর এ অবশতা, এ শ্রান্তির বুঝি ক্লান্তি নেই।

আমি কতক্ষণ তেমনি জড়বৎ বসেছিলাম জানিনা। আমার রাগ অনেক ক'মে গিয়েছিল। আমার চোখ ঝলসে দিয়েছিল যে মেরে ফেলবার নেশা তাও তখন প্রায় ছুটে গেছে। সেই অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ও শান্ত মুহূর্তে আমি আমার চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। দেখলাম আমার চারিপাশে প'ড়ে আছে কেবল রাশি রাশি কাগজ—কাটাকুটি লেখা নিয়ে টুকরো টুকরো কাগজ। তূণের মধ্যে তীর খুঁজতে খুঁজতে তীরের ফলার খোঁচা লেগে লেগে আমার আঙ্গুলে রক্তপাত হওয়া ছাড়া আর কোনো দিকে কিছু এগোয় নি। আমি আশ্চর্য হলাম। নিজে নিজেই হাসলাম। নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম আর দূরের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলাম। আমার চোখ আস্তে আস্তে দূরে—আরো দূরে—দিগ্‌বলয়ের দিকে ছড়িয়ে যেতে লাগল ; কিন্তু আমার চোখের এই দিগ্‌বলয় গতির সুযোগ নিতে সে অর্থাৎ আমার শরব্য পিছু হটল না মোটে। চমকে উঠলাম, দেখলাম আমার শরব্য অন্তর্হিত হল একটা ছোট ঝোপের মধ্যে, একটা ছোট গর্তের মধ্যে। কেবল অন্তর্হিত হ'ল না সে, তার আগে মাথা তুলে একটু সে আমার দিকে চেয়ে দেখল অতি নিরীহভাবে, কিন্তু তার পরেই তার গভীর হিংসাত্মক দাঁতগুলি মেলে খুব আপাত নির্দোষ, কিন্তু একটু ভেংচানোর মত একটি হাসি হেসে, সে আত্মরক্ষার জন্য তার আশ্রয়স্থল সেই ছোট গর্তটির ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

সে দৃষ্টিগোচর থাকা পর্যন্ত আমি একরকম ধৈর্যরক্ষা করতে পেরেছিলাম। কারণ আমি জানতাম তার জীবন-নাটিকা তখন পর্যন্ত রয়েছে আমার হাতেই, কিন্তু সে অন্তর্ধান করার পর আমি আরো অসহায় বোধ করলাম। নিষ্ক্রিয় ক্রোধ আরো বেশী করে এসে আমায় ঘিরে ধরল। আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আমার ভিতরের প্রবৃত্তি—মেরে ফেলবার, প্রবৃত্তি এবং আমি জানতাম সেই মুহূর্তে মেরে ফেলা ছাড়া আর কিছু কর্তব্য ছিল না আমার। আমার রথচালক আবার আমায় উপদেশ দিল ঃ

মার—মেরে ফেল! এ ছাড়া আর কোনো কর্তব্য নেই তোমার এই মুহূর্তে!

আমি আবার চিৎকার করলাম—মার ওকে! ওকে নিপাত কর! ওকে শেষ ক'রে ফেলতে হবে! ধ্বংস ক'রে ফেলতে হবে! ও অশেষ ক্ষতি করেছে আমার। কেবল আমার কেন, আমার জাতির আমার দেশের অসংখ্য ফাইল কেটে নষ্ট করেছে সে! অসংখ্য চেয়ারের তলা ফাঁসিয়ে দিয়েছে সে। অসংখ্য টেবিলের পায়া কেটে খোঁড়া ক'রে দিয়েছে সে! অসংখ্য আলমারি ফুটো ক'রে কন্‌ফিডেনশ্যাল কাগজপত্র নষ্ট ক'রে ফেলেছে সে! খালি নষ্ট তো করে না সে, এখানকার জিনিষ ওখানে ওখানকার জিনিষ এখানে ক'রে দেয়, এখানকার কাগজ ওখানে ওখানকার কাগজ এখানে করে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে আর বুধোর পিণ্ডি উদোর ঘাড়ে চাপিয়ে সৃষ্টি বিপর্যয় করতে পারে সে! না না, ওকে মারতে হবে, ওকে মেরে ওর বংশ নিপাত করতে হবে।

আমার ভিতরে আবার আগুন জ্বলে উঠল দপ্‌ ক'রে। আবার এক তাড়া কাগজ টেনে নিয়ে আমি লিখতে লাগলাম— আবার সেই গোড়া থেকে—

To H. E. The Governor—

আমি আবার তূণ হাতড়াতে লাগলাম। একটি একটি ক'রে প্রত্যেকটি শরের মন্ত্র আপনি আমার জিভের ডগায় চ'লে আসছিল। আমার কানে সব কথা যাচ্ছিল একটি একটি ক'রে—তার বিরুদ্ধে হাজার অভিযোগ—

বড় ছেলের নতুন প্যান্টে ছেঁদা ক'রে দিয়েছে!

মেজ ছেলের রবারের বল ফুটো ক'রে তার হাওয়া বের ক'রে দিয়েছে সে!

ছোট মেয়ের 'টেডিবেয়ার'-এর পেট ফুটো ক'রে তার পেটের ভিতর থেকে খড়গুলো সব বের ক'রে ফেলেছে সে!

আমার স্ত্রীর নকল সিল্কের ট্যাসেল্‌ কেটে তার ছানাদের বিছানা করার জন্য গর্তে নিয়ে গেছে সে!

এসব যতই মনে পড়ছিল আমার ধৈর্যের বাঁধ ততই ভেঙ্গে পড়ছিল। এক এক পাতা করে কত পাতা লিখে গেলাম খচখচ করে তার হিসেব নেই। এক নিশ্বাসে আমি লিখে চলেছিলাম সেই দীর্ঘ দরখাস্তটি! শত শত ভাবগর্ভ উত্তেজনাময় গরম গরম শব্দ সংবলিত দরখাস্ত! আমি জানতাম এবার আর নিস্তার নেই। তার ব্রহ্মাস্ত্রই দরকার! তাকে সেই অস্ত্রেই নিপাত করতে হবে! তাতে প্রলয় হয় যদি তো হোক!

আর একটু, তাহলেই দরখাস্তটা লেখা শেষ হয়ে যেত, সই ক'রে পাঠিয়ে দিতাম সেই মহা ভয়ঙ্কর অস্ত্রটিকে। কিন্তু ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটি সূক্ষ্ম শব্দ আমার কর্ণগোচর হ'ল। শব্দটি যতই সূক্ষ্ম হোক আমার কানের পরদাটা তাতে অস্থির না হয়ে থাকতে পারল না।

চমকে গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম। দেখলাম আমার ব্রহ্মাস্ত্র টস্কাস্ত্রকে একটুও খাতির না ক'রে সে একটা লাফ মারল ঠিক আমার চেয়ারের নিচে থেকে! এতক্ষণ আমি যাকে উদ্দেশ ক'রে শর-মন্ত্রণ করছিলাম সে আমারই চেয়ারে বসে কুট কুট ক'রে আমার ডানলোপিলোর গদিটা কাটছিল!

আমায় দাঁড়িয়ে উঠতে দেখে সে এক মুহূর্তের জন্য একটু যেন হতভম্ভ হওয়ার ভাব দেখাল; কিন্তু সেই এক মুহূর্তেই সবকিছু বদলে গেল। তার পরেই আমি দেখলাম আমি কেবল ধনুঃশর নিয়ে তার পিছন পিছন তাড়া করেছি আর সে ব্যূহর পর ব্যূহ রচনা ক'রে নিজেকে রক্ষা করছে! কেবল যে আত্মরক্ষা করছে তা নয়, ক্রমাগত আক্রমণও চালিয়ে যাচ্ছে আমার উপরে, তার গেরিলা ঘাঁটিগুলির ভিতর থেকে।

প্রথমেই সে ফেলে দিল একটা দামী টী-পট্ আমার টেবিলের উপর থেকে। তারপর একলাফে গিয়ে সে ঢুকল আমার বুক্ শেলফের ভিতরে। ভীষণ রেগে গিয়ে আমি বইপত্রগুলো উলট-পালট করতে লাগলাম তাকে ধরব ব'লে। গোটা দু'চার আধা বাঁধাই পকেট বুক খস্‌খস্ ক'রে পিছলে মেঝেয় এসে পড়ল আর দেখতে দেখতে ফ্যানের হাওয়ায় তার পাতাগুলো খুলে গিয়ে ঘরময় উড়ে বেড়াতে লাগল। ব্যস্ত হ'য়ে আমি সেগুলো যেই কুড়োতে লেগেছি সেই সুযোগে অমনি সে আর এক লাফ মেরে দেওয়ালের কোণে টুলের উপরে রাখা মাটির তৈরী আমার প্রিয় বুদ্ধমূর্তিটাকে ফেলে দিল। আমার চোখের সামনে এমন সুন্দর বুদ্ধমূর্তিটাকে সে দু' টুকরো ক'রে দিল। তখন আমার রক্ত আমার মাথার কোনখানে গিয়ে চড়েছিল আমি জানি না, আমি অন্ধপ্রায় হয়ে তাকে তাড়া ক'রে বেড়াতে লাগলাম আর সে একটির পর একটি আমার ড্রইংরুমের সমস্ত ভঙ্গপ্রবণ জিনিষের দিকে তাক ক'রে লাফ মারতে লাগল। অবশেষে সে এক লাফ মেরে নিমেষের মধ্যে গিয়ে ঢুকল আমার ড্রইং রুমের একান্ত কোণে সযত্নে রক্ষিত তাজমহলটার পিছনে।

আমার চক্ষুস্থির! বিবেকের শত তাড়না সত্ত্বেও আমি আমার তীর ধনুক তুলতে পারলাম না তার উপর। আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলাম।

যখন চোখ খুললাম, দেখলাম—খানিকক্ষণ আগে যে আমার শরসন্ধানে ভীত হয়ে এবং আমার দিগ্‌বলয় দৃষ্টির সুবিধা নিয়ে ঝোপের ভিতর লুকিয়েছিল সে এখন বিদ্রূপভরা চোখে চেয়ে আছে আমার দিকে, আমার বহুমূল্য তাজমহলের পিছন থেকে।

আমার তীর-ধনুক আগে থেকেই নেমে পড়েছিল, এখন আমার মাথাটাও নুয়ে পড়ল। আমি তার আরাধনা করতে শুরু করলাম। তার গুণকীর্তন ক'রে তার স্তবগান করলাম এবং শাস্ত্র ও সংস্কারের উপর আমার ঘোর অবিশ্বাস সত্ত্বেও বিধি

মতে তার পূজা করলাম। কারণ এত কষ্ট ক'রে তার সঙ্গে এই যে খণ্ডযুদ্ধ করেছি তাতে লাভ কী হয়েছে? আমি যুদ্ধ শেষ করতে পারিনি, সেও তার অবস্থান কায়েম রেখেছে। আমি তার স্তুতি গাইলাম এইভাবে—

—ধন্য তুমি গণেশ বাহন! তোমার প্রভু বুদ্ধি আর জ্ঞানের বলে পৃথিবী জয় করেছেন আর তুমিও পৃথিবী জয় করেছ। ধন্য হে ধূর্ত। তুমিই বাস্তবিক জ্ঞানের বাহন।

এই স্তব-স্তুতি আরাধনা-উপাসনার মধ্যে বাইরে হঠাৎ কিসের বড় গোলমাল শুনে আমি জানালার কাছে ছুটে গেলাম। দেখলাম অনেকগুলি ছোকরা চিৎকার করতে করতে সার বেঁধে রাস্তার ধার দিয়ে চলেছে। সে কী তুমুল চিৎকার! তবু তার ভিতর থেকে একটা কথা আমার কান আকর্ষণ করল। কান খাড়া ক'রে শুনলাম—

—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—

তারপর একজন সেই ইনকিলাবের ভূমিকার ভিতর থেকে আর এক ধুয়া ধরল—প্রথমটা খুব অবান্তর আর খাপছাড়া লাগল শুনতে—হাসিই পেল আমার। ছেলেদের হাঁক-ডাক আমাকেও একটু উৎসাহ দিল। হাঁক পাড়ছিল তারা ঃ—

—ঘুষখোরদের—জুতো মারো!

—মিথ্যেবাদীদের—ইলেকট্রিক্ চেয়ারে বসাও!

—চুকলিখোরদের—আলপিন খোঁচাও!

—লাগানে. কানভাঙ্গানিদের—ঢিল মারো!

—ধাপ্পাবাজদের—সঙ্গিনের ডগায় কাতুকুতু দাও!

—কুঁড়েদের—বিছুটি দিয়ে সুড়সুড়ি দাও!

—দেশদ্রোহীদের—যা করবার কর!

ব্যাপার কী কিছু আন্দাজ করতে পারছিলাম না। প্রসেশন চলে গেল, তবু কিসের জন্য এই স্লোগানের স্রোত ঠাউরে উঠতে পারলাম না, কিন্তু সে শখ আমার হঠাৎ মিটে গেল প্রসেশনের মধ্যে আমার কলেজ পড়ুয়া ছেলেকে দেখতে পেয়ে। আমার বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল! একটা আদিম রক্ষণশীল প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আমার ভিতরে হঠাৎ।

ধীর-অ-অ! ধীর-অ-অ!—আমি হাঁক ছাড়লাম তার নাম ধ'রে।

বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। এ কী? ছেলেটা কি এই সব ক'রে বেড়াচ্ছে আজকাল! এ কীসের মিছিল? বড় ভয় হ'ল। ছেলেটার ভবিষ্যৎ ঝরঝরে মনে হল আমার চোখে। পাছে তার ভবিষ্যতের ঝকঝকে তকতকে রেকর্ডের উপর দাগ পড়ে! আমি আবার চিৎকার করলাম—

—এই ধীর-অ-অ, ধীর-অ-অ!

কিন্তু বৃথাই আমার হাঁক ডাক, ধীর-অ কিছু শুনতে পেল না। মিছিল চলে গেল। আমি বুঝলাম যুগ এগিয়ে গেছে আর এক পা। আমি আর আমার

ছেলে। কত আলাদা! আমরা হাত তুলতাম, কিন্তু মারতে পারতাম না—মারবার হাজার ইচ্ছা সত্ত্বেও! আহা বলতেও পারতাম না আমরা। কিন্তু আজ কিনা ধীর-অ, আমা'র ছেলে মারতে ছুটেছে এমনি পাগলের মত রাস্তা দিয়ে? কিন্তু কাকে? আর সত্যিই কি মারতে পারবে? হাত উঠবে তার?

গুম হয়ে ব'সে রইলাম। সন্ধ্যার সময় ছেলে ফিরল। তার চোখের জিঘাংসা তবু অতৃপ্ত। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই হাসতে হাসতে বীরদর্পে সে বললে,

—আজ আমরা সোজা গেলাম মন্ত্রীর কুঠিতে!

—মন্ত্রীর কুঠিতে?

—হ্যাঁ, সোজা মন্ত্রীর কুঠিতে। আর মন্ত্রী যদি না শোনেন তাহলে তার উপরেও যাবার জন্য তৈরী আছি আমরা—আমাদের যুবক সংঘ।

—কিন্তু কেন? আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। বললাম—এত শিগগিরই একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র কেন বাপু? আর কার জন্যেই বা তা? আমি কেমন থতমত খেয়ে যাচ্ছিলাম।

—কার জন্যে? ছেলে কটমট ক'রে আমার দিকে চাইল—যেন সে আমারই ভিতরে খুঁজছে আসল দোষীকে। তারপর সে সংক্ষেপে বললে- কেন, ঐ কেরাণীর জন্যে, যে ছেলেদের কাছ থেকে অ্যাডমিশনের সময়ে দশ টাকা করে ঘুষ নেয়, আমাদের দরখাস্তগুলো সব আগু পিছু ক'রে গোলমাল করে দেয়—আমাদের ড্রামা আর স্পোর্টস্ ফাণ্ডের টাকা নিজের পেটে পুরে আমাদের চোখের সামনেই ঠোঁট চাটতে চাটতে আমাদের ভেংচায়······

—এই সামান্য কথা নিয়ে তোমরা মন্ত্রীর কাছে চলে গেলে? কিন্তু তোমরা কি তোমাদের শরব্য সাধন করতে পারলে? এত বড় বাণ বৃথা নষ্ট হল না তো? —আমি সকালের ভেঙ্গে যাওয়া বুদ্ধমূর্তির মাথাটা ধড়ের সঙ্গে জোড়বার বৃথা চেষ্টা করছিলাম।

ছেলের দৃষ্টি বুদ্ধমূর্তির দিকে ছিল না। সে কী সব প্রলাপ ব'কে গেল খানিকটা। আমি ভাবলাম আমার সেই মুণ্ডহীন বুদ্ধিমূর্তিটা শেষে তাকে বাগ মানিয়ে ফেলল বুঝি। কিন্তু আমার ধারণা ভুল। সে ছিল অন্য একযুগের কথা, আমাদের যুগের কথা। আমাদের সে যুগ এখন বিশ বাঁও জলের তলায়।

হঠাৎ আমার হাতে মূর্তিটা দেখতে পেয়ে ধীর-অ এত আশ্চর্য হয়ে গেল যে তার প্রলাপ বাক্য হঠাৎ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। তার প্রিয় বুদ্ধমূর্তিটা এই অবস্থায় দেখে সে একটা মুহূর্তের জন্য একেবারে বাক্যহারা হয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম এ যুগের শক্তি বোধহয় এইটুকুই—আমাদের যতটা ছিল।

কিন্তু হঠাৎ তার চোখ জ্বলে উঠল।

—এটার এ অবস্থা করল কে বাবা? রাগতভাবে সে চাইল আমার দিকে।

—ইঁদুর। আমি সংক্ষেপে বললাম।

—ইঁদুর ? সে কটমট ক'রে আমার দিকে তাকাল।

—হাঁ, একটা মেঠো ইঁদুর—আমি তার মুখের দিকে না চেয়ে উত্তর দিলাম এবং মনে মনে আমার সকালের নিষ্ক্রিয় উত্তেজনার সঙ্গে তার সেই ক্রুদ্ধ মুখের তুলনা করে দেখতে দেখতে হাসছিলাম।

আমি ভেবেছিলাম সে বুঝি চুপ ক'রে যাবে, কিন্তু না। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত লাফ দিয়ে উঠে সে ছুটে গেল ড্রইংরুমের দিকে !

—আচ্ছা, আমি দেখছি ও পাজীকে !

এর ফলাফল কল্পনা ক'রে আমার চোখ কপালে উঠল। কেবল জিনিষপত্র ভাঙ্গাই সার হবে জেনে আমি আর তার মা দুইজনে হাঁ হাঁ করে তাকে বাধা দিতে তার পিছন পিছন ছুটলাম। কিন্তু সে সব বৃথা।

প্রথমে সে দৌড়ে গিয়ে বইয়ের আলমারির সব বইপত্র ঘেঁটে তছনছ ক'রে ফেলল। খানকয়েক বাঁধাই বই মেঝেয় প'ড়ে গিয়ে মলাটের কোণ বেঁকে গেল।

সেই বইয়ের ভিতর থেকে হঠাৎ এক লাফে বেরিয়ে পড়ল সেই ইঁদুরটা। তার পরেই গিয়ে ঢুকল একটা টেবল-ল্যাম্পের পিছন দিকে। আমরা হাঁ হাঁ করতে করতে পাগল ছেলেটা মুহূর্তের মধ্যে ইঁদুরটাকে সেখান থেকে তাড়া দিয়ে বের ক'রে দিল, আর সে অমনি গিয়ে আশ্রয় নিল আমার পেনস্ট্যাণ্ডের পিছনে, কিন্তু টেবল-ল্যাম্পটাকে উল্‌টিয়ে ফেলে না দিয়ে সে গেল না। নিমেষের মধ্যে ল্যাম্পটা মাটিতে প'ড়ে তুবড়ে গেল আর তার বাল্‌বটা শব্দ করে ফেটে চুরমার হয়ে গেল। ছেলে কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে আবার ইঁদুরটাকে তাড়া দিল আর সেটা এবার গিয়ে ঢুকল স্ট্যাণ্ডের উপরে রাখা গান্ধীর ফোটোটার পিছনে। সেখানেও সে আশ্রয় পেলনা। ফোটোটাও প'ড়ে গিয়ে তার কাঁচ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সেখান থেকে লাফিয়ে সে আবার ঢুকল ঠিক সেই জায়গায় যেখান থেকে সকালবেলায় সে আমার দিকে উঁকি মারছিল। মার্বেলের তাজমহলটা নড় নড় করতে লাগল !

আমি রাগে অস্থির হয়ে চিৎকার করলাম—

—এই—এই—তুই এ কী করছিস্ ধীর-অ ? একটা ইঁদুরের জন্য তুই আমার সর্বনাশ ক'রে দিবি ?

কিন্তু আমার কথা কিছুই তার কানে ঢুকল না—যেন সে পাগল হয়ে গেছে, একটা ইঁদুরের জন্য জীবন পণ করেছে !

মার্বেলের তাজমহল মেঝেয় প'ড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ইঁদুরটা আর কোথাও জায়গা না পেয়ে আমার দিকেই ছুটে এল, কিন্তু মাঝপথে সে হঠাৎ দিক্ পরিবর্তন ক'রে চক্ষের নিমেষে গিয়ে আশ্রয় নিল ধীর'র মায়ের পায়ের নীচে, তাঁর লোটানো শাড়ীর মধ্যে।

ধীর'র দ্বিতীয় আঘাতে ইঁদুরটা চিত হয়ে ছিটকে পড়ল। কিন্তু প্রথম আঘাতটা

লেগেছিল ধীর'র মায়ের পায়ে। কারও পায়ের নীচে কি কারও আঁচলের তলায় বুঝি আর এ যুগের ইঁদুরের আশ্রয় নেই !

ধীর-অ হাঁপাতে হাঁপাতে ব'সে পড়ল। কিছু দূরে তার শত্রু (এবং আমারও শত্রু) রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে প'ড়ে ছিল। ঘরের চার দিকে ভাঙ্গা কাঁচ, মার্বেল পাথর আর বইয়ের পাতা ছড়ানো। ধীর-অ কিন্তু একদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল সেই মরা ইঁদুরটার দিকে।

বীণাপাণি মহান্তি

কটকের এক মহিলা কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপিকা বীণাপাণি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে গল্প লিখছেন। তাঁর গল্পে মুখ্য হ'য়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত সমাজ, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত নারী সমাজ। ছোটগল্পের জন্য তিনি রাজ্য অকাদেমী পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ: 'পান্থশালা', 'রক্তকরবী' ও 'নবতরঙ্গ'।

তটিনীর তৃষ্ণা

মনে হয় একদিন অসামান্য সুন্দরী ছিলেন তিনি। তাঁর গালে ছিল গোলাপের ত্বক, আর চঞ্চল চোখের কোণে আকাশের নীল।

নাম তাঁর রুচি। বহুদিন আগের তিনি যেন কোন সত্তাহীন সুরভি।

রুচি! যাঁর বৃহত্তর কিংবা ক্ষুদ্রতর নামের সঙ্গে চিন্ময়ের কোনো সম্পর্ক নেই।

সূর্য অস্ত যায় যায়। হয়তো রুচি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর অপেক্ষায় আধ ঘন্টা ধ'রে, ভাবেন চিন্ময়। ট্রেণের আধ ঘন্টা দেরি হয়ে গেছে।

স্টেশন এই এসে গেল। রুচি দাঁড়িয়ে আছেন। পনের বছর আগেকার সেই চেহারায় এসেছে অনেক পরিবর্তন, তবু স্পষ্ট চেনা যায় তাঁকে। কপালের চূর্ণ কুন্তলের নীচে তাঁর চঞ্চল চোখ দুটি যেন চিন্ময়ের সন্ধানে আরো চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আঃ—, আজ যদি পনের বৎসর পূর্বের অতীত হ'ত। না, না, তিনি ভাববেননা। নিজেকে দুর্বল করবেন না তিনি।

কাছে এলেন রুচি। ঈষৎ হেসে বললেন—অনেক কষ্ট সয়ে অনেকদিন পরে এলে চিন্ময়; কিন্তু ট্রেন আজ বড় দেরি করে দিল। সারা জীবন কখনো তুমি ঠিক সময়ে আসতে পারলে না...।

চিন্ময় চুপ ক'রে রইলেন। রুচির কথার ইঙ্গিত তিনি বুঝেছিলেন। পনের বছর আগেকার স্মৃতি তাঁর মনের সমস্ত কমল বনকে ছারখার ক'রে দিয়েছিল। ক্ষণিকের জন্য তিনি কথা বলবার শক্তি হারিয়েছিলেন।

গাড়ীতে উঠে স্টার্ট দিলেন রুচি। কিছু একটা বলতে হয় এমনিভাবে চিন্ময় বললেন—বরং তুমি বস রুচি, আমি ড্রাইভ্ করি।

—তোমার কি লজ্জা করছে, চিন্ময়? এখানে সবাই জানে আমি গাড়ী চালাই, মদ খাই, ক্লাবে যাই, আর অনেক বন্ধুকে এমনি গাড়ীতে ক'রে নিয়ে আসাও যেন আমার এক চিরাচরিত ধর্ম। আর তুমি ক্লান্ত এবং আমার অতিথি। তুমি ব'স।

চিন্ময় যেন অন্যমনস্ক হলেন একটু। রুচি তাঁকে পরিহাস করছে না তো?

গাড়ী ছাড়তে ছাড়তে রুচি বললেন—তুমি চিরদিন বড় দুর্বল, চিন্ময়। আমার এই অবাধ ভ্রমণের রকমটাকে তুমি কোনদিন পছন্দ করনি, আজও করছ না। আজ তুমি আমার অতিথি। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, তুমি থাকা পর্যন্ত মদ স্পর্শ করব না।—ঠোঁটে ঠোঁট চেপে যেন তাঁর কণ্ঠস্বরের সজলতাকে ঢাকা দিয়ে রাখলেন তিনি।

—আমার সম্বন্ধে তোমার একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে রুচি। তুমি বোধ হয় প্রদোষের কথাটা বিশ্বাস করেছ।

রুচি বললেন—আমার নিজের নিজের হিসেবের উপর আমি বেশী নির্ভর করি, চিন্ময়। আমার এই অহংভাবটাকে তুমি সহ্য করতে পারলেনা? তুমি কেন আমি নিজেও এক এক সময়ে দুর্বলবোধ করি এই নিয়ে। সে যাক গে, প্রদোষের কথাকে আমি দাম দিইনি কোনদিন। আর আজ?

হাসছিলেন রুচি। অতি ক্ষীণ আলোয় প্রদোষের প্রতি উদ্দিষ্ট তাঁর অবজ্ঞার হাসির রেখাটুকু যেন চিন্ময়কে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিচ্ছিল।

এই সেই রুচি। খ্যাতিমান্ ধনী পিতার কন্যা। বিলাসব্যসনের প্রাচুর্যের মধ্যে জীবনকে অহরহ এড়িয়ে চলাই যেন ছিল তাঁর নেশা। অথচ কী অমায়িক ব্যবহার ছিল তাঁর। তাঁর ব্যক্তিত্ব আর বিরাট নারীত্বের মধ্যে চিন্ময় যেন আপন সত্তা হারিয়ে ফেলতেন।

শহরের রাস্তা ছেড়ে গাড়ী যেন অন্য এক রাস্তা ধরে চলেছে। চিন্ময় চেঁচিয়ে উঠলেন—একি রুচি, আমরা যে পথ ছেড়ে বিপথে চলেছি।

—ভয় পাবার কিছু নেই। সমস্ত রাত আমাদের এমনি বিপথে চলতে হবে। আমি আর আজকাল এখানে থাকিনা। কিছুদিন হ'ল যেন কোনো কিছু ভাল লাগছে না, তাই শহর ছেড়ে দু শ' মাইল দূরে আমি আছি। অবশ্য সে জায়গা-টাকেও শহর বলা যেতে পারে, তবু আমার অপরিচিত শহর। আমার কিন্তু ভয় হয় চিন্ময় সেখানে আমি বেশী দিন থাকতে পারব না। কে জানে কোন দিন সে অস্থায়ী নীড় ছেড়ে আমি আবার চলে যাব।

—জীবনটাকে এমনি ক'রে ফাঁকি দিয়ে উড়িয়ে দিলে, রুচি?

—ফাঁকি দিলাম আর কোথায়? জীবনটা তো আমার উপরে বোঝা হয়ে বসেছে। বরং জীবনই যেন আমায় ফাঁকি দিল।

চিন্ময় নিরুত্তর। পনের বছর ধ'রে রুচির সঙ্গে নিউ ইয়ারের শুভেচ্ছা কার্ড আর জন্মদিনের অভিনন্দন ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই। বহুপরিচিত এই নারীর সঙ্গে

তাঁর দীর্ঘকালের বিচ্ছেদের মধ্যে অনেক ঘটনা যে ঘটতে পারেনা এমন কেন ভাবছেন তিনি ?

ষাট মাইল বেগে গাড়ী চলেছে। দুই দিকে ধান ক্ষেতের শ্যামল শোভা। আকাশে আকাশে টুকরো টুকরো সাদা মেঘ, আর মাঝে মাঝে হাল্কা শীতল হাওয়ার স্পর্শ। চিন্ময়ের মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গের পরী তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে কোথায়।

হঠাৎ স্টার্ট বন্ধ ক'রে রুচি বললেন—তোমার নিশ্চয় খিদে পেয়ে গেছে, চিন্ময়। টিফিন ক্যারিয়ারটা খুলে তুমি কিছু খেয়ে নাও। ব'লে দরজা খুলে তিনি বেরুলেন।

—তুমি নিজে কিছু খাবে না, রুচি ?

—না, আমার মোটে খিদে নেই। তাছাড়া আজকাল কেন কে জানে খাবার ইচ্ছাও হয় না। এক এক সময় ভয় হয় আমি অনাহারে মারা যাব না তো ? বলতে বলতে রুচি যেন আবেগ ভরে চিন্ময়ের হাতখানি চেপে ধরলেন।

অন্ধকার! চারিদিকে ঘন অন্ধকার; তবু রুচিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন চিন্ময়। কত কাছে, কত আপনজনের মত রুচি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর কাছে। অথচ পনের বছর আগে একটা কথা বলতে গিয়ে বার বার ফিরে ফিরে এসেছিলেন তিনি, কিন্তু রুচির প্রতি যে দুর্বার আকর্ষণ তিনি অনুভব করতেন তা তিনি ভুলবেন কী ক'রে ? রুচির বিবাহের পর চিন্ময় চেয়েছিলেন মৃত্যু; কিন্তু তা হলনা।

আজ যেন পৌষের পলিত পত্রে বসন্তের মলয় অকালে আগুন লাগিয়েছে, বাঁচবার রোমাঞ্চ মনে আজ জাগছে আর একবার।

—আরে, আরে—চিন্ময়—আই অ্যাডমিট ইউ আর এ বোলড ওয়ান, আই ডু। ও সিলি...দেখ চিন্ময়, অন্ধকার গিয়ে আলো হলে তুমি আবার...

হেসে উঠলেন রুচি। আর চমকে সরে গেলেন চিন্ময়। সে হাসির মধ্যে যেন অজস্র কারুণ্যের জলতরঙ্গ সৃষ্টি হল।

গাড়ীতে উঠতে উঠতে রুচি বললেন—আমার কথায় তুমি আঘাত পেলে আবার—চুপ করে রইলে যে।

চিন্ময় হেসে সিগারেট ধরালেন। কথার মোড় ঘুরিয়ে বললেন—প্রদোষকে এমনি একা ফেলে এখানে থাকাটা আমি ভাল মনে করিনা, রুচি। সে দার্জিলিং-এ আর তুমি এই অজ পাড়াগাঁয়ে...আমি এর মানে বুঝি না।

—তুমি বুঝতে পারবে না চিন্ময়। ধনীদের যেমন গর্ব আর উদ্ধতভাব থাকে তেমনি গরিবলোকেদের একটা নিঃসহায় ভাব থাকে। এ দুটো জিনিষ মানুষকে সহজ করে না। একত্রে বাস করে বেঁচে থাকতে হ'লে কিছুটা স্বাভাবিকতা দরকার। তা হল না। আমার ঔদ্ধত্যের মাত্রা তাঁর যতই অসহ্য বোধ হতে লাগল তাঁর নিঃসহায় ভাব ততই আমার শ্বাস রোধ করে আনল। প্রদোষের অনেক ছোট ছোট মানসিক বিকার আছে। তুমি তো জান চিন্ময়, আমি কোনো পুরুষের অসহায়ভাব সহ্য করতে পারি না। আমি বড় অহঙ্কারী, আর আমি চেয়েছিলাম প্রদোষ হোক আমার চেয়েও বেশী অহঙ্কারী।...কিন্তু দিন দিন তিনি ভীরুই হয়ে গেলেন, সেইজন্য

তিনি দূরে সরে যাচ্ছেন। ব্যবসায়ের নাম ক'রে তিনি মাসের পর মাস এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান। আমি সেজন্য চিন্তিত নই। আমি চিন্তিত যে, জীবনটা আমার উপরে যেন একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াল।

—তোমার মেয়ে কোথায় তাহলে ?

—সে আরো আশ্চর্য ব্যাপার। প্রদোষ তাকে কাছ ছাড়া করবেন না! মেয়ে নাকি আমার কাছে থাকলে খারাপ হয়ে যাবে। তাকে অন্যভাবে শিক্ষা দীক্ষা দিচ্ছেন তিনি। হিন্দু ধর্মের নানা রীতি শৃঙ্খলা যোগ সে অভ্যাস করছে। আমিও করেছিলাম, চিন্ময়। ঠাকুমার কাছে ব্রত উপবাস করতে পুরাণ পাঠ করতে আমার ভারী ভালো লাগত। জান চিন্ময়, কী সরল ছিলাম আমি ? মিথ্যে কথা বললে যমপুরীতে শিমুল গাছের গায়ে পেরেক ঠুকে ঠুকে মারা হয় এ কথা প'ড়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারতাম না। উঃ, সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনা করতে করতে আমি যেন ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। এ সব মনে পড়লে সেই সেদিনের মেয়ে রুচির উপর আমার দয়া হয়। আর আমার মেয়ে শুক্লা···বিংশ শতাব্দীর অজস্র জীবাণু আর দ্বন্দ্ব থেকে যার উৎপত্তি···

চিন্ময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। কোন সুদূর অতীতের রুচির কথা মনে পড়ছিল তাঁর। বাস্তবিক রুচি ছিলেন আশ্চর্য নম্র কিন্তু আত্মপ্রত্যয়সম্পন্না তরুণী। তাঁর চোখ মুখে কী ছিল কে জানে. কতবার তাঁকে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছেন তিনি। প্রদোষকে বিয়ে করবার সিদ্ধান্তটা রুচি এমন হঠাৎ করে করে বসবেন সে কথা কেউ জানত না। বিয়ের পর অনেকবার প্রদোষের সঙ্গে দেখা করেছেন চিন্ময়। রুচির সঙ্গে সাক্ষাৎটা কিন্তু তিনি সর্বদা এড়িয়ে গেছেন। কতবার প্রদোষ নিমন্ত্রণ করেছেন, আর কতবার অভিমান ক'রে চিঠি লিখেছেন রুচি, কিন্তু চিন্ময় সে সব ল্যাবরেটরির মধ্যে পুড়িয়ে ফেলেছেন। দিনের পর দিন কতদিন ধ'রে নিজেকে রুদ্ধ দুয়ারের পিছনে আবদ্ধ রেখে তিনি রুচিকে সুখী করবার কামনা করেছেন, কিন্তু তাঁর এত আত্মত্যাগ নিষ্ঠা সব কি ব্যর্থ হয়ে গেল ? প্রদোষের সঙ্গে দেখা হলে এবার তিনি বলবেন সুখ বা শান্তি সে তার স্ত্রীকে না দিতে পারে তো নাই পারল, স্ত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যটা অন্ততঃ স্বামীর পক্ষে দেখা তো দরকার।

কিছুক্ষণ অখণ্ড নীরবতা। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ। মনে অজস্র স্মৃতির কল্লোল।

নীরবতা ভঙ্গ করে রুচি প্রশ্ন করলেন—তুমি প্রশান্ত চৌধুরীকে চেন ? বিলিয়ার্ড খেলায় খুব নাম করেছে, চেন তাকে ?

চিন্ময়ের মনে পড়ল। প্রদোষ যেন রুচির সঙ্গে প্রশান্তর বন্ধুত্বটাকে সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর সেই সময়কার কথাবার্তা থেকে চিন্ময় যেন একটা হীন ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। রুচি তাহলে কি—?

রুচি হাসতে হাসতে বললেন—আমার এই অপবাদের ঢ্যাঁরা নিশ্চয় তোমার কানে গিয়ে বেজেছে। তবে এটা সত্যি কথা যে প্রশান্ত চৌধুরীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল প্রচুর। লোকমুখে নানা কথা রাষ্ট্র হল। আমি হলাম কলঙ্কিনী, হলাম

অসতী। আমি কান দিলাম না তাতে। যার বন্ধু নেই পৃথিবীতে তার স্থিতি নেই। বন্ধুত্ব করতে গেলে আমি লিঙ্গ বিচার করি না, চিন্ময়! আমি তাকে স্নেহ করতাম। তাই আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম না আসতে। কিন্তু সে স্কাউণ্ড্রেল কী করল জান? আমার গলা জড়িয়ে ধরে সে বলল—প্রশান্ত খেলোয়াড় হলেও এত নীচ নয়, রুচি দেবী! আমি তোমায় বিয়ে করতে রাজি আছি···চল আমরা দু'জনে পালিয়ে যাই। আমি তার দিকে চেয়ে চমকে উঠলাম। সে আমার চাইতে ছয় বছরের ছোট। আমার কানের পাশের চুলগুলো পেকে এসেছে। আমার এমন রাগ হ'ল যে আমি পা থেকে চটি খুলে ঘা কতক লাগিয়ে দিলাম, চিন্ময়! ভবিষ্যতে যেন সে কোথাও এর পুনরাবৃত্তি না করে। সেদিন থেকে আমি আর তাকে দেখিনি। কোনো পুরুষের অযথা অত্যাচার আমার ভালো লাগে না।···নেহাত স্কাউণ্ড্রেল একটা!

চিন্ময় একাগ্র হয়ে শুনছিলেন রুচির জীবনে প্রশান্ত চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কী বলতে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন, কারণ রুচি গাড়ী থামিয়ে বললেন—বাইরে এস, চিন্ময়। গায়ে একটু খোলা হাওয়া লাগুক।

চিন্ময় উঠে এল। চতুর্দিকে তমসার ঘন কালিমা। সামনে ক্ষীণ রেখায় নদীটি বয়ে যাচ্ছে কেবল। বড় নিস্তব্ধ, বড় নিঃসঙ্গ লাগছে মনটা।

—জানো চিন্ময়, এক এক সময়ে এমনি মাঝ রাতে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আকাশের তারাগুলির দিকে চেয়ে থাকতে ভারী ইচ্ছে হয়। জন্মাবধি বাঁচার নিম্নতম চাহিদাটুকু খুঁজে খুঁজে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; অথচ পৃথিবীর সমস্ত প্রাচুর্য আমার পায়ের নিচে লোটাচ্ছে। আর যেন ভালো লাগে না চিন্ময়। পনের বছর আগের রুচি আর আজকের রুচির মধ্যে এত বেশী প্রভেদ হয়ে গেছে যা আমার কল্পনার বাইরে। আমি তোমায় কী বলে বোঝাব নিজেই জানি না।

—আমায় বোঝাবার চেষ্টা করো না।

—তোমার হয়তো মনে আছে চিন্ময়, আমার লাইব্রেরিতে পৃথিবীর সব বিশিষ্ট লেখকের বই ছিল। রাশি রাশি বই। রাশি রাশি উপদেশ, অভিজ্ঞতার কাহিনী। সে সমস্ত বই আমার অতি আপনজন ছিল। গ্রন্থকীটের মত তার ভিতরে আমি ব'সে থাকতাম বছরের পর বছর। কিন্তু রাতে একদিন হঠাৎ আগুন লেগে গেল। ব্যাকুল হয়ে আমি যখন প্রদোষকে প্রতিকারের ব্যবস্থার কথা বললাম, তিনি কী বললেন জানো?—যদি অদৃষ্টে ধ্বংসই অনিবার্য হয় তুমি তা রোধ করতে পারবে না। আমি ফিরে এলাম। আমার নিজের প্রচুর টাকা আছে····· কিন্তু লাইব্রেরির শখ আমার যেন মিটে গেল, আর একবার নতুন ক'রে গড়বার স্পৃহা আর আমার রইল না। হ'র নো সেই বইগুলির বন্ধুত্বকে কুড়িয়ে তুলে আনতে আমার আর ইচ্ছে হল না।—হঠাৎ একবার আর্টিস্ট সুনীলের সঙ্গে দেখা হল। আর্ট ছেড়ে সে এখন দার্শনিক হয়েছে, কিন্তু আমায় দেখে তার ছবি আঁকবার শখ হল, চিন্ময়। কিন্তু কী করলো জানো? সে যে ছবি আঁকল তাতে আমি জলভরা পুকুরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে

একটি পদ্মপাতার দিকে চেয়ে হাসছি। আমার মুখের হাসি টুকরো টুকরো হীরের মত পদ্মপাতার উপরে পড়ে জলে গিয়ে পড়ছে। তার নিচে সুনীল লিখেছে—

"Life you may evade, but Death you
shall not ; you shall not deny the Stranger."

সেই ছবি নববর্ষের শুভেচ্ছা নিয়ে যেদিন আমার কাছে এসে পৌঁছাল সেদিন আমার মনে হল আমার সমস্ত রক্ত আর জীবনীশক্তি যেন কে শুষে নিয়েছে! আমি হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। আমার মনে হল, পৃথিবীর কোনো লোকের কাছেই যেন আমার এতটুকু দাম নেই।—চিন্ময়, আমার বড় অবশ লাগছে। প্রতি মুহূর্তে আমি যেন এক এক ইঞ্চি করে মরে যাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে পৃথিবীর অজস্র প্রাচুর্যের ভিতরে আমার যেন বাঁচবার নিম্নতম প্রয়োজনের অভাব রয়েছে। তুমি বল চিন্ময়, আমি কি আকাশ-কুসুমের পিছনে ছুটেছি? আমি কি অরণ্যে রোদন করছি?

চিন্ময় উত্তর দিলেন না। তিনি বৈজ্ঞানিক। খাদ্যশস্যের উপর নির্ভর না ক'রে মানুষ কী ক'রে সামান্য ট্যাবলেট মাত্র খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারবে সেই গবেষণায় তিনি দিনরাত ব্যাপৃত। সেই ট্যাবলেট ছাড়া মানুষের জীবনে অন্য কিছু প্রয়োজনের কথা তিনি জানেন না। রুচির প্রশ্নে তিনি যেন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

তাঁর গায়ে ঝাঁকানি দিয়ে রুচি আবার বললেন—আমি জানি চিন্ময়, একজন নারীর মুখে এসব কথা অন্যায় আর অশোভন।…তুমি বুঝবে না, তোমার বন্ধু, তোমার সমাজ, তোমার পৌরুষ এ কথার দাম দেবে না। আমি যদি অকালে মরে যাই, তুমি সেটাকে বলবে আমার একটা শখ। তুমি তো বুঝবে না তোমার সমাজ আর পৃথিবীর অজস্র প্রাচুর্যের ভিতরে সামান্য একটি নারী—বাঁচবার নিম্নতম চাহিদার অভাবে…অসময়ে…

চিন্ময় চেঁচিয়ে উঠলেন—তুমি চুপ কর রুচি। তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

—আমি পাগল নই। নিস্তব্ধ রাত্রিতে কতকগুলি সত্যি কথা শুনছ, তাই আমায় মানুষ না ভেবে পাগল ভাববে তা আমি জানি চিন্ময়। চিরদিন সত্যকে এড়িয়ে চলা তোমার একটা অভ্যাস। সত্যকে তুমি ভয় কর। আমি বলব তুমি ভীরু, দুর্বল।

—আঃ রুচি, তুমি আজও আমায় বুঝলে না।

—তোমাকে বুঝিনি? বুঝেছি বলেই তো এমন নির্ভয়ে বলছি। আমি কি জানিনা তুমি রুচির জন্য আজীবন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছ? কিন্তু সে পনের বছর আগেকার রুচি, আজকের রুচি নয়। তোমার জীবনে ত্যাগের নমুনা পৃথিবীতে বিরল। তুমি মহান প্রেমিক সত্যি, কিন্তু পুরুষ হ'লে না…।

এবার রুচি সত্যি কাঁদলেন—সশব্দে, আর দুই হাতে মুখ ঢেকে।

চিন্ময় তাঁর হাতখানি ধরলেন। কিন্তু রুচি দূরে সরে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাও, চিন্ময়! কাঁদবার জন্য আজ আমার অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। আমি একা একাই কাঁদব। এ দুঃখ—কষ্ট আমার নিজের,

একান্তই নিজের। আমি এতে কাউকে ভাগীদার করতে চাইনা।—তুমি সরে দাঁড়াও। আমার চোখের জলে অজস্র কলঙ্ক আছে। তার কালো দাগ লেগে আমার প্রতি তোমার প্রেমকে নষ্ট হ'তে দিও না।

বাইরে অন্ধকারের যেন শেষ নেই। রুচির ক্রন্দনের শব্দ নদীর কল্লোলের সঙ্গে মিলে তৃতীয় এক শব্দের সৃষ্টি হচ্ছিল। যে শব্দের অর্থ বোঝা চিন্ময়ের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

নির্বাক হয়ে গিয়েছিল চিন্ময়। নারী কী, তা যেন সারাজীবন তিনি বুঝতে পারলেন না। প্রদোষ বলতেন চিন্ময় নারী জাতিকে ভয় করে। নারীর বিভিন্ন রূপে সত্যি কখনো কখনো তিনি সম্বিৎ হারা হতেন।

চিন্ময়ের সম্বিৎ ফিরে এল। রুচি কান্না বন্ধ ক'রে গাড়ীতে স্টার্ট দিয়েছেন। তিনি কাছে গিয়ে বললেন—তুমি একটু বিশ্রাম কর রুচি, আমি ড্রাইভ করি।

—না না, তুমি বস। তুমি আমার অতিথি, চিন্ময়! তোমায় আরামে রাখা আমার কর্তব্য, কিন্তু তোমায় আজ অনেক কষ্ট দিয়েছি, এটুকু তুমি সহ্য ক'রে নিও। বস, দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।

চিন্ময় অগত্যা বসলেন। রুচির চোখের কাছে শুকনো চোখের জলের দাগ, বড় শ্রীহীন লাগছে রুচিকে। অথচ কী লোভনীয় ছিল তাঁর চেহারা, বারবার চেয়ে দেখেও তৃপ্তি হ'ত না।

ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করতে করতে বহুবার চিন্ময়ের চোখের সামনে জেগে ওঠে রুচির সেই মনোমুগ্ধকর ছবি। গবেষণা বন্ধ থাকে। ফরমূলা শেষ হয় না। বইয়ের পৃষ্ঠা ওলটানো হয় না। পনের বছর ধরে কেবল মামুলি সম্পর্ক ছাড়া তিনি আর কোনো সম্পর্ক রাখেন নি. পাছে তারফলে রুচি হন অসুখী। নিজের চাইতে বেশী ভালবাসতেন তিনি রুচিকে। তাই নিজেকে পুড়িয়ে তাঁকে আলো দিতে অনবরত চেষ্টা ক'রে এসেছেন তিনি। কিন্তু—

চিন্ময়ের চোখের পাতা বুজে আসছে। ঘড়িতে বোধহয় চারটে বাজে। এতক্ষণ ধ'রে ড্রাইভ করেও ক্লান্তি নেই রুচির। বড় চিন্তামগ্ন যেন তিনি।

না, থাক্। তাঁকে বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না চিন্ময়। কিন্তু রুচি যে তাঁকে ডেকেছিলেন কিছু বলবেন বলেই, এ পর্যন্ত বলেন নি। জিজ্ঞাসা করবেন নাকি? না, থাক্।

বড় অস্বস্তি লাগছে মনে। চারিদিক ফাঁকা, নির্জন,—একা। মন খা খা ক'রে উঠছে। রুচির বিয়ের দিন যে নিঃসঙ্গ বেদনা অনুভব করেছিলেন তিনি – আজ যেন মনে হল সে বেদনা তাঁর মনন কেন্দ্রকে, স্মৃতি ও বুদ্ধিকে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দেবে।

রুচি কিন্তু নীরব। অবিশ্রান্ত ঝড়ের পরে সবুজ বনানী ক্লান্ত বুঝি বা।

চিন্ময় চোখ বুজলেন।

কতক্ষণ কেটে গেছে চিন্ময় জানেন না। গাড়ী আসায় তিনি উঠে পড়লেন।

কিন্তু এ কী? এ যে স্টেশন, যেখানে তিনি সন্ধ্যাবেলা এসে নেমেছিলেন ট্রেন থেকে। রাস্তা ভুল করে এবে ভুল পথে চলে এসেছেন রুচি।

রুচি কিন্তু মৃদু হেসে বললেন—পথ ভুল করেছি ভাবছ তুমি, না? তা নয়। নদীর ধার থেকে আমি আবার স্টেশনের দিকে গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। তুমি ফিরে যাও. আমার সঙ্গে বাড়ী নিয়ে গিয়ে তোমার অমর্যাদা করতে চাই না।

—এ তুমি কী বলছ, রুচি? এতদিন পরে আমি এলাম···অথচ তুমি···

—সেই জন্যই তো বলছি, চিন্ময়। এতদিন পরে শেষে তোমায় কলঙ্কের দাগ লাগিয়ে দিতে চাই না। যে রুচির সমাজে স্থান নেই সে তোমাকে স্থান দেবে কোথা থেকে? বাঁচার নিম্নতম প্রয়োজনের অভাবে দীর্ঘকাল ধ'রে যে তৃষিত সে তোমার সম্মান রক্ষা করতে পারবে না। তুমি ফিরে যাও, চিন্ময়! ফিরে যাও!

—রুচি, শোন—আমার কথা শোন একবার!

—আজ আর অস্বীকার করে লাভ নেই। আমি তোমায় ভালবাসি, তাই তোমায় বিদায় দিচ্ছি। রুচির এই রুচিহীনতার জন্য তাকে তুমি ক্ষমা কর, চিন্ময়! কিন্তু ফিরে যাও, আমায় কষ্ট থেকে আর যন্ত্রণা থেকে ত্রান কর। তোমাকে নষ্ট করার বেদনা থেকে আমায় মুক্তি দাও।

সে কণ্ঠস্বরে কী নির্দেশ ছিল কে জানে, চিন্ময় গাড়ী থেকে নেমে আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে ঢুকল। পিছন পিছন গেল রুচি। ভোর হয় হয়।

ট্রেনের কামরার রেলিং ধ'রে চিন্ময় চেয়েছিলেন রুচির দিকে। বড় উদাস দেখাচ্ছিল তাঁকে। সিগনাল পড়েছে।

চিন্ময় ঝুঁকে প'ড়ে বললেন—তোমায় বুঝতে পারলাম না রুচি। তুমি আমায় ক্ষমা করো।—কিন্তু কী বলবে ব'লে অত ক'রে আমায় ডেকেছিলে বললে না তো?

রুচি যেন চমকে উঠে চাইলেন। আবেগ ভরা গলায় বললেন—তুমি পারবে চিন্ময়? পারবে একটা কাজ করতে? আমার জন্য বলছি না, বলছি অন্যদের জন্য।

—বল রুচি, ট্রেন ছেড়ে দেবে।

শুষ্ক হাসি হাসলেন রুচি।—তুমি বৈজ্ঞানিক, মানুষের শরীরকে বিনা খাদ্যে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কী উদ্ভাবন করছ তুমি আমি জানি না। কিন্তু মানুষের মনকে বাঁচিয়ে রাখতে কী করছ? পারবে? পারবে একটা জিনিষ বের করতে তুমি? মনকে বাঁচিয়ে রাখার ন্যূনতম চাহিদা আবিষ্কার করতে পারবে? আধুনিক মানুষের মানসিক রিক্ততাকে তুমি দূর করতে পারবে চিন্ময়? আজকের নিঃসঙ্গ বুদ্ধিনির্ভর মানুষের জন্য নতুন আবিষ্কার প্রয়োজন। নইলে সে মরে যাবে চিন্ময়। আর পৃথিবী হবে কয়েকটি পশুর বাসস্থান।

ট্রেনের বিকট হুইস্‌লের শব্দে চিন্ময়ের হৃদপিণ্ডের ভিতরটা যেন থরথর ক'রে কেঁপে উঠছিল। আর—কতকগুলো ভাঙ্গা কাঁচের শব্দ তাঁর কর্ণ বধির করে তুলছিল।

মনে হচ্ছিল তাঁর গবেষণাগারের সমস্ত কাঁচের যন্ত্রপাতি আর রাসায়নিক পাত্র প'ড়ে গিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

ট্রেনের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রুচি যেন ছুটে চলেছেন ঊর্ধ্বশ্বাসে।